প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ : ১৩৬৭

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্তা
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
প্রভাস অধিকারী
স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদের চিত্র ও লেখিকার নাম এবং মলাটের পিছনে
মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা কবিতা ও ছবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত এবং লেখিকাকে উপহার হিসাবে প্রদত্ত

শমে শঙ্কে পতনে উত্থানে পূর্ণ মানব, অশেষ শাস্ত্র পারঙ্গম সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অমেয় কালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য পিতৃরূপে যিনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যাঁর কারণে আমার মানুষী সত্তা সম্ভব হয়েছে, তাঁরই চির অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে—

একখানি পত্র

ওঁ

শিলাইদহ
নদীয়া

প্রীতি সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাকে যখন কেহ পথের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন মনে মনে হাসি এবং মনে মনে বলি—হায় রে আমার কপাল! স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পাইলে নিজে বাঁচিয়া যাই অন্যকে পথ দেখাইব কিসের!

কিন্তু শিশুকাল হইতে সকল রকমে ইহাই দেখিলাম পথটাকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াই তিনি মজা করিতেছেন। জীবনটা শুধু কেবল পথে চলা নহে, খুঁজিয়া রাস্তা বাহির করা।

শতসহস্র পথের মধ্যে কেবল একটা পথ আছে যাহা আমার—নানা প্রকার পরখ করিতে করিতে সেইটে বাহির করাই আমার সমস্ত শক্তির পরিণাম। আজ পর্য্যন্ত কেবল এই কাজই করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দুঃখও পাইয়াছি আনন্দও পাইয়াছি—এখনও নিঃসংশয় হই নাই। কিন্তু ভয় কাটিয়া গিয়াছে; একথা আর মনে হয় না যে একেবারে পথ হারাইয়া ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইব। ইহা বেশ বুঝিয়াছি এই পথ খোঁজার মধ্যেই জীবনের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষাটা আছে—যদি খুঁজিতে না হইত তবে আর যাহা পাই নিজেকে পাইতাম না। গুরুকে পাইয়াই বা লাভ কি, শাস্ত্রকে পাইয়াই বা লাভ কি—নিজেকে না পাইলে নয়—তাই নিজেকে এত করিয়া ঘুরাইতে হয়। কর্ম্মের পথও যেমন সত্য কর্ম্মত্যাগের পথও তেমনি সত্য—প্রত্যেকের পক্ষে ইহার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যটি ঠিক যে কোনখানে তাহা বাহির হইতে কোনো-মতেই শেখা যায় না—তাহা বিচিত্র পরীক্ষা হইতে উৎপন্ন এমন একটি নৈপুণ্য যাহা কাহাকেও হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না। পোদ্দার যেমন ক্রমাগত টাকা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে স্পর্শমাত্রে মেকি টাকা অনুভব করিতে পারে

কিন্তু সেই অনুভূতি শিখাইতে পারে না এও সেইরূপ। না শিখাইতে পারার একটা প্রধান কারণ প্রত্যেকের বোধশক্তির একটি বিশেষত্ব আছে—আমি ঠিক যেখানে পৌঁছিলে বুঝি আর একজন ঠিক সেখানটিতে পৌঁছিলে বোঝে না—মাত্রার তারতম্য আছে সুতরাং প্রত্যেকের focus ঠিক একটি বিন্দুতে নয়। এই বিন্দুটিকে ধ্রুব করিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছি—তাই কখনো কাজ করিতেছি কখনো কাজ ছাড়িতেছি কখনো একটুখানি এগোইতেছি কখনো একটুখানি পিছাইতেছি—এমনি করিতে করিতে ঠিক জায়গাটিতে গিয়া পৌঁছিব। পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে একেবারে নিছক দুঃখ এও ত আমার মনে হয় না। হঠাৎ এক একবার একটা দিক হইতে দৃষ্টি যে একটু খোলসা হইয়া যায় তাহাতে যেটুকু পাওয়া যায় তাহার চেয়ে আভাস পাওয়া যায় অনেক বেশি—তখন বোঝা যায় এ একটা খেলা হইতেছে, লুকোচুরি খেলা, ইহা ধরা না ধরার মিশ্রিত খেলা—ইহাতে অত্যন্ত বেশি হতাশ হইবার দরকার নাই—কেন না এটুকু জানা গেছে যে যিনি খেলাইতেছেন তিনি কাছেই আছেন তাঁহাকে না ধরিয়া খেলা শেষ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন, ব্যস আর ভয় নাই। তিনি যেমনি ভান করুন, তিনি আছেন এইটেই আমার পক্ষে প্রচুর—আমার সমস্ত ভাবনা ইহার মধ্যে ছায়ার মত বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হয় তাহাই হউক্ এইটে খুব জোর করিয়া বলিয়া তার পরে কোমর বাঁধিয়া খেলিতে লাগা যাক্। সে খেলার মধ্যে সবই আছে—ভাবও আছে, রূপও আছে, আনন্দও আছে তপস্যাও আছে, এড়ানোও আছে, ধরা দেওয়াও আছে।

আমার বোট কুষ্টিয়ায় আসিয়া পৌঁছি[illegible] কলিকাতার মুখে ছুটিয়াছি। আবার এখানে ফিরি[illegible] আশা [illegible]। ইতি ২৬শে কার্ত্তিক ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশুকাল থেকে আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ [illegible] লেখা এই চিঠিখানি মাঝেমাঝেই দেখেছি। চিঠিখানি [illegible] পরিচিত—আজ থেকে ৬৮ বছর আগে লেখা এই চিঠি। তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি। চিঠির

উপরের "প্রীতি সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন" অংশটি কাটা এবং শেষের দিকে লেখা "আমার বোট কুষ্টিয়া আসিয়া পৌঁছিল এবার কলিকাতার মুখে ছুটিয়াছি। আবার এখানে ফিরিব এমন আশা আছে। ইতি ২৬ শে কার্ত্তিক ১৩১৫ ভবদীয়"—এই লেখাটুকুও কাটা আছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অংশটুকু সমস্ত বাদ দিয়ে "একখানি পত্র" নামে কোথাও প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে তো ভাবেনই নি, যাঁদের লিখতেন তাঁরাও ভাবতেন কিনা সন্দেহ। তবু গভীর কোনো তত্ত্ববাণী থাকলে তাকে প্রবন্ধ রূপে প্রকাশ করবার এরকম প্রয়াস হত। সে সময়কার অনেক ঘরোয়া চিঠি হারিয়ে গেছে।

কোন্ চিঠির উত্তরে এ চিঠি লেখা তা জানি না, তবে সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি চিঠি পেয়েছি তার একটি উধৃত করলাম। হতেও পারে এই চিঠিখানিতেই সুরেন্দ্রনাথের প্রশ্নটি ছিল। এই সময়ের কাছাকাছি আরো একখানি চিঠি উধৃত করছি যাতে ব্যাকুল যুবক সুরেন্দ্রনাথের মনটির উন্মুখতা বোঝা যাবে।

শিলাইদহ থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি যে তরুণ যুবককে লেখা তাঁর মন তখন বিশ্ব-জিজ্ঞাসায় পূর্ণ। সে সময়ে, অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের নাড়া খেয়ে সনাতন ধর্মের খাঁজ কাটা পথ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাঁরা চিরন্তন মানুষের রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের তখন দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থা, তখন সেই রাজপথ থেকে প্রত্যেকের নিজের পথটি খোঁজার পালা। সে পথনির্দেশ কিন্তু কেবল যুক্তিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুসরণে সমাজসংস্কার বা রাজনীতির পথেই সমাপ্ত হত না। তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটি অন্তর্জীবনের ধারা প্রবহমান থাকত। চতুরঙ্গের অনবদ্য অথচ আজকের বাস্তবতার যুগে অসম্ভব এই কাহিনীটির দুটি চরিত্রের মধ্যে সে যুগের এই বিশেষ দুটি ভাব রূপ নিয়েছে। শচীশের জ্যাঠামহাশয় জগমোহন মিল, বেন্থাম, থুরোর সমাহার। রাজনীতি সমাজনীতি ন্যায়ধর্ম সবার কেন্দ্রে সেদিন যে নূতন বাণী ঘোষিত হচ্ছিল তা হচ্ছে সাম্য ভাবনা—Equality, Fraternity, Liberty।

জগমোহন কর্মীমানুষ সেই ধারণার দ্বারা তাঁর দৈনন্দিন কর্ম নিয়ন্ত্রিত। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ-সাধনের উদ্যোগে তাঁর অন্তরপ্রকৃতি এক চরিতার্থতার আনন্দে উদ্ভাসিত। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ তাঁর অনুগামী শিষ্য হলেও তাঁর ভিতরে আর একটি ব্যাকুলতা নিত্যস্পন্দমান। শুধু বহির্মুখী

কর্মে তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর নেই। জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে পীড়িত করে তুলেছে, তাই গুরুর সন্ধানে রসের উৎসের তীরে তীরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষের কতগুলি চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর।

ব্যাকুলতার তো কোনো স্পষ্ট ভাষা নেই, তাই শচীশের আচার-আচরণ সৃষ্টিছাড়া। তার বর্ণনা শুধু একটি কবিতার লাইনে স্পষ্ট হয়— "পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম—কস্তুরী মৃগ সম—"

আমরা শুনেছি, শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে সেখানে যে কয়েকটি ভাব-প্রবণ কবিপ্রকৃতির মানুষ, রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যেমন—অজিত চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত ও সতীশ রায়—তার মধ্যে সতীশ রায় ছিলেন ভাবুক। আমি শুনেছি শচীশের চরিত্রের প্রেরণা সেই আত্মবিহ্বল সতীশের চরিত্র থেকেই কবির মনে আসে।

যে চিঠিখানির সূত্রে এত কথা মনে এল—ঐ চিঠিখানি যাঁর প্রশ্নের উত্তরে লেখা সেই তরুণটিরও অবস্থা ঐ একই রকম। তাঁর নিজের চিঠিগুলোও এই ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। অবশ্য তাঁর সব চিঠি এখানে উধৃত করা যাবে না, সেগুলো দীর্ঘ, হৃদয়রসে জরজর, কিন্তু উত্তরগুলিতেই প্রশ্নকার উপস্থিত থাকবেন। তিনিও সেই কস্তুরী মৃগের আকুলতা নিয়ে উদ্বেল হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছেন, বলছেন—"আমায় পথের সন্ধান দিন।" এই পথের সন্ধান কি একজন আর একজনকে দিতে পারে? কিংবা একেবারে নিঃসংশয়ে আমার পথ বলে কি কেউ কোনো দিন স্থির নিশ্চয় হয়? যাদের হয় তারা একটা খোঁদল কাটা পথে পড়ে যায়—না থাকে তাদের খুঁজবার স্বাধীনতা, না থাকে তাদের খুঁজবার আনন্দ। তারা হয়ত কোনো ধর্মগুরুর হাত ধরে কিংবা কোনো রাজনীতির প্রবক্তার হাত ধরে হয়ত বা মোহ মুদ্গরে বণিত তরণীতে কিংবা কার্ল মার্কসের শকটে উঠে পড়ে অন্তিম যাত্রা শেষ করে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইহা বেশ বুঝিয়াছি এই পথ খোঁজার মধ্যেই জীবনের সব চেয়ে বড় শিক্ষাটা আছে। গানেও এই কথাই বলেছেন—'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' কিংবা 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে—পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।'

আমরা সবাই চলেছি, এই চলাটা ঠিক কোনো একটি লক্ষ্যে পৌঁছিয়েই সার্থক হয়ে ওঠে তা নয়—চলতে চলতে হয়ে ওঠাই তার সার্থকতা। প্রত্যেক মানুষের হয়ে ওঠার একটু বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বটুকু মূল্যবান।

"আমি ঠিক যেখানে পৌঁছিলে বুঝি আর একজন ঠিক সেখানটিতে পৌঁছিলে বোঝে না। মাত্রার তারতম্য আছে সুতরাং প্রত্যেকের focus ঠিক একটি বিন্দুতে নয়।"

আজকের দিনে স্টীমরোলার চালিয়ে প্রত্যেককে একীভূত পিণ্ড তৈরী করার উৎসাহে এই সত্যটিকে আমরা ভুলে যাই। রবীন্দ্রনাথের গভীর মানব-মূল্যবোধের প্রমাণ এই যে প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মার বিশেষ রূপটি, বিশেষ বিকাশটি, তিনি স্বীকার করেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

উল্লিখিত চিঠির প্রাপক সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিরন্তর জিজ্ঞাসার তাগিদে ক্রমে সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম হলেও প্রশ্নের হাত থেকে নিস্তার কোনো দিনও পান নি। এই চিঠি পাওয়ার তেত্রিশ বছর পরে আর একবার একটি পত্রে তাঁর বহুব্যাপ্ত জিজ্ঞাসার আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কবিতায় একটি পত্র লেখেন। কবিতাটির নাম "কবি নারদ"। সেঁজুতি কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত 'পত্রোত্তর' কবিতাটি তারই উত্তর। এর মর্মার্থের সঙ্গে উল্লিখিত চিঠির বক্তব্য প্রায় একই। 'পত্রোত্তর' কবিতাটি লেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই পতিসর থেকে লেখা অস্পষ্ট অক্ষর, জীর্ণ পীত কাগজের এই পত্রখানি পড়ে আসছি, কিন্তু ক্রমে এর অর্থ আমার কাছে নূতন নূতন ব্যঞ্জনা এনেছে। দুটি রচনার মধ্যে মিলও যেমন পার্থক্যও তেমন। পতিসরের রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাঁর কাছে তখন কোনো এক প্রতীক-পুরুষই এই বিশ্বখেলা খেলাচ্ছেন, সমগ্রের আভাস দিচ্ছেন কিন্তু পুরোপুরি দেখাচ্ছেন না। জন্ম মৃত্যুর রহস্য, শেষ পরিণাম কি, 'দিন অবসানে" "অস্তরবির দেশে" এখানকার জীবনের কোনো সংযোগ আছে কিনা এসব কোনো কথাই স্পষ্ট নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে যেন একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ অমরত্বের আস্বাদ পাচ্ছি 'অলোকধামের' খবর আসছে, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য ভাবে নয়, লুকোচুরির মতই—ক্ষণে ক্ষণে বোঝা না বোঝার দ্বন্দ্বে তা দোদুল্যমান। ১৩১৫ সালের কবি খুব জোরের সঙ্গে বলছেন—"তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন। ব্যস্ আর ভয় নাই।" এই সবিশ্বাস উচ্চারণের ঝোঁক পুরে আর নেই। "অলোকধামের আভাস সেথায় আছে" ক্ষণিকের জন্য সেই আভাস পাওয়াই চূড়ান্ত সার্থকতা, তার বেশি কোনো ধরা-বাঁধা ঈশ্বরের কল্পনা এ কবিতায় অনুপস্থিত। এই কবিতার লেখক যদিও কোনো প্রচলিত বর্ণনার ঈশ্বরের কথা ভাবছেন না কিন্তু নিখিল বিশ্বের প্রবহমান প্রাণের সঙ্গে তিনি সাযুজ্য অনুভব করে আনন্দিত। তাই মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ কি

হবে তার চেয়ে তাঁর ভাবনা আরো মুক্ত আরো ব্যাপ্ত—এই ঘরের কোণের বাতি যদি নিবেই যায়, এই ভঙ্গুর মাটির প্রদীপ যদি চূর্ণ হয় তখন পরম আশ্বাস এই যে আমরা সূর্য-তারার সঙ্গী হতে পারব, "যাব অলক্ষ্যে সূর্য তারার সাথী—"

পত্রাবলী নিয়ে যখন বসেছিলাম তখন ভেবেছিলাম আমার কাছে লেখা যে ক'খানা চিঠি আছে তাই নিয়েই আমার পুরানো দিনগুলি নাড়াচাড়া করব। কিন্তু চিঠিগুলি হাতে নিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে তারও আগে পৌঁছন চাই। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সংযোগের উল্লেখ অবশ্যই কাম্য। সে এ কারণে নয় যে আমি একজন অসাধারণ বিদ্বান মানুষের কন্যা বলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। বরং কোনো পরিচয়হীন ভাবেই আমি যদি আমার হৃদয়অর্ঘ্য নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম তাহলে আমার তীর্থযাত্রা হয়ত আমার কাছে আরো রোমাঞ্চকর, আরো ঐশ্বর্যবান হত।

আমার যতদূর ধারণা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় আমার সম্পর্কিত জ্যাঠামহাশয় সুশীল গুপ্তের মাধ্যমে। সুশীল গুপ্ত আদি সমাজের ব্রাহ্ম। সুগায়ক। সুশীল গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ

সুহৃদবরেষু,

আপনাদের পত্র কিছুকাল হইল পাইয়াছি। কিন্তু জ্বরে পড়িয়াছিলাম বলিয়া এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই।...আপনার পত্রের মধ্যে আপনাদের বন্ধুর (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের) পরিচয়ের আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইলাম। তাঁহার নিঃসৃত বাণীগুলিকে সুরে বসাইতে পারি এমন শক্তি আমার আছে বলিয়া মনে করি না। আমার নিজের রচনায় মনের মত সুর কখনো কখনো সহজে বসিয়া যায়, আবার অনেক সময় পারি না। অনেক সময় সুর বসাই কিন্তু তাহা ঠিক উপযুক্ত হয় না।

গীতাঞ্জলি, যে নূতন গানগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সুরের সঙ্গে যোগহীন অনূঢ় অবস্থায় রহিয়া গেল—যাহাই হোক আপনার বন্ধুর গান ও প্রবন্ধ দেখিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য রহিয়াছে জানিবেন। যদি কখনো এখানে আসিতে পারেন আলোচনা হইতে পারিবে। ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩১৭

সুশীলকুমার গুপ্তকে এর পরের চিঠিতে লিখছেন :

………"সুরেন্দ্রবাবুর লেখাটি পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল, প্রবাসী অথবা ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইব। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে আরো কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষায় আছি। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭—আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"নিবেদন" পাঠিয়ে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন :

নবীনেরা প্রায়শই মহিমামণ্ডিত পুরাতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যগ্র। অথচ কেমন একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচে প্রতিপদেই যেন জড়িত, এই দুইটি আকর্ষণ বিকর্ষণের টানে পড়িয়া চিত্ত স্বভাবতই কোনো সময়ে স্তম্ভিত কোনো সময়ে অভিমুখী হয়। তবে আমার বিশ্বাস এবং দেখিতেছিও তাই যে যাকে ভালবাসি তিনি তাঁর প্রেমে আমার সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়া আরো কোলের কাছে টানিয়া লইবেন। "নিবেদন" খানির ভিতর প্রবেশ করিয়া কথঞ্চিত সুখী হইলেন কিনা জানিতে উৎসুক আছি—কারণ তাহার উপরে আমার কৃতার্থতা ও পুস্তকের সার্থকতা।………

বোলপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার কি করিলেন ? ইতি—৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

প্রণত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বই 'নিবেদন' কবিতাগুচ্ছ অনেকটা গীতাঞ্জলির রসে রসিত। ঐ কবিতাগুলি পড়লে লেখক যে একটি ভাবের আবেগে মথিত হয়ে রয়েছেন তা বোঝা যায়, রচনাশৈলী যেমনই হোক। তখনকার দিনের এই সব ভাবুক লেখকরা অনেকেই আর্ট ফর্মের দিকে একেবারে নজর দিতেন না। তাদের মন থাকত হৃদয়রসে জর্জর, অন্তর নিবিষ্ট—কিন্তু ভাবনার সত্য যতই প্রখর হোক—উপলব্ধি যতই গভীর হোক—সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নিপুণতাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। আবার ফর্ম যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন কী বিপদ ঘটে তাও আমরা এখন দেখছি।

যাহোক, সুরেন্দ্রনাথের 'নিবেদন' কাব্যগ্রন্থখানি পেয়ে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনি আমার সম্বন্ধে মনে কোনো আক্ষেপ রাখিবেন না। আমি নীচে নামিয়া বসিয়াই আছি—আমার নাগাল পাইতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে

হইবে না। আমি আপনাকে কোনো দিনও অনাদর করি নাই। কেনই বা করিব।

তবু আপনাদের অল্প বয়স বলিয়া একটি কথা ভুলিয়া যান যে আমার বয়স অল্প নহে। পূর্ব্বের মত জীবনের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য নাই। যেটুকু সম্বল আছে তাহা ধীরে ধীরে খরচ করিতে হয়—ধুমধাম করা অসম্ভব। এইজন্যই আমার ব্যবহারে যদি দীনতা দেখিতে পান তাহাকে কৃপণতা বলিয়া কল্পনা করিবেন না। আপনার প্রীতি উপহারখানি[১] পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এখানে অত্যন্ত গোলমাল সেই জন্য এখনও ভিতরে প্রবেশ করি নাই—আজ রাত্রে শিলাইদহে রওনা হইব। সেখানে নির্জ্জনে সম্ভোগের অবকাশ পাওয়া যাইবে।

সমস্ত ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গিয়া আপনার শিখাটুকু অম্লান আলোক জ্বালিয়া বঙ্গভারতীর আরতির থালাটিকে উজ্জ্বল করিয়া সাজাইয়া তুলিবে, ইহারই জন্য আশান্বিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

ইতি—২৭শে বৈশাখ ১৩১৮
ভবদীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

'নিবেদন' এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভাবগুলি রূপ ধরিয়া উঠে নাই। এই কথাই বারবার মনে লাগিতেছিল। অনেক ভাব আছে যাহা গভীর। যাহা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না কিন্তু হৃদয়কে যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় সেই সকল ভাবের দুর্গমতা লইয়া আমি কোনো নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু কবিতায় এবং সকল সৃষ্টিতে দেখিতে হইবে রূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা। এই জন্যই রূপের মধ্যে আনন্দের পরিচয়। কবিতায় ভাবের পরিচয়ের চেয়ে এই আনন্দের পরিচয় মূল্যবান। আপনার গদ্য প্রবন্ধটিতেও ভাবের যদৃচ্ছা প্রাচুর্য্য আছে যদিও সুবিন্যস্ত ও সুসংশ্লিষ্ট রূপের সুষমা না দেখিয়া আমার মন কেবলি মাথা নাড়িয়াছে। একান্ত মনে আশা করিয়া আছি আপনার ভাব সৃষ্টি কার্য্যে ক্রমশ সংহত হইবার যুগ—রূপ প্রকাশের যুগ আসিবে—যে পর্য্যন্ত না আসে সে পর্য্যন্ত আপনার কবিত্ব জগতে তেজ থাকিতে পারে, তাপ থাকিতে পারে, উদ্যম থাকিতে পারে কিন্তু তাহা ধনধান্যে জীবনে

১. উপরোক্ত প্রীতি উপহার 'নিবেদন' গ্রন্থটি।

সৌন্দর্য্যে বিচিত্র হইয়া যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। লেখকের দরদ আমি বুঝি। সেইজন্য আপনার কাব্য সম্বন্ধে আমার এই অভিমতটুকু আমি লিখিতে দুঃখ বোধ করিতেছি আর কেহ হইলে লিখিতাম না। কিন্তু আপনার কাছে আমার মত গোপন করা উচিৎ মনে করি না। কারণ আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার প্রকৃতির সংকীর্ণতাবশত বিচারে ভুল হইতে পারে। আপনার প্রতিভা হয়তো নিজের উপযোগী নূতন পথ খননের অধ্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। সুতরাং এখনো বিচারের সময় উপস্থিত হয়তো হয় নাই। অতএব আমার এই পত্রকে অধিক মূল্য দিবেন না। হোক আপনার কবিপ্রতিভার শাস্তানুকূলঃ পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ। ইতি—ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুরেন্দ্রনাথের পত্র ঃ

P. W. D Mess
P. O. Ghoramara
Rajshahi

রাসপূর্ণিমা

শ্রীচরণেষু

আপনার সহিত আমার পরিচয়ের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে আপনার মধ্যে প্রবেশের পথ আমার একান্ত সুগম…… কেমন যেন মনে হইতেছে যে আপনি আমার ঘনিষ্ঠ। বেদনা বেদনাকে আকর্ষণ করে, পথিকের রোদনের নিভৃত অশ্রুকে কেমন অজানিতভাবেই টানিয়া আনে—আপনি কবি, আপনি সমাজ জীবনের অপূর্ব অভিব্যক্তি। আপনার প্রতিভা এবং সামর্থ্য এখনও বিস্ময়কর……আপনাকে পাইবার ইচ্ছা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে……কথা কওয়ার লোক বড় বিরল, আপনি অনুকূল শক্তিসম্পন্ন এবং বোধহয় অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় বর্ধিত কাজেই কাহারও সহিত কথা কহিবার আবশ্যকতা বোধহয় আপনার পক্ষে কম এবং তার চেয়েও নির্জনতার মধ্যে আপনাকে সঞ্চয় করায় হয়ত আপনার বেশি উপকার হয়। আপনারা পথের অনেক দূরে গিয়াছেন পথ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও আপনাদের খুব কম। কিন্তু আমরা তরুণ আমাদের শক্তিও অল্প অবস্থাও প্রতিকূল। আমাদের পদে পদেই ভয় এবং আশঙ্কা, কাজেই চলিতে চলিতে যদি এমন আভাস পাওয়া যায় যে কাহারও পথের

সহিত আমার পথের মিল আছে তবে যেন অনেকটা রুদ্ধ জিজ্ঞাসা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া যায়······আপনার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভে আমার প্রবল ইচ্ছা······মানুষ যতটা পাওয়ার যোগ্য, চায় তার অনেক বেশি······আমার বুকভরা কেবল বেদনা, কথা, জিজ্ঞাসা আর আশা।

প্রণত সেবক

সুরেন

এই সময় থেকে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত পত্রালাপ চলত। উপরে উধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে একটি লাইন "লেখকের দরদ আমি বুঝি" কথাটি বড় সত্য। দীর্ঘদিন পরে কোনো একটি পত্রিকার পাতা উলটাতে উলটাতে তিনি আমায় বলেছিলেন, এই কাগজে অমুকের লেখার সমালোচনা বেরিয়েছে—সমালোচনা তো নয় যেন বিষনিষিক্ত শর। এক জনের রচনা যদি উচ্চমানের নাও হয় সেটা তো তার গর্হিত অপরাধ নয় যে এই রকম ভাষায় গাল পাড়তে হবে!

সুরেন্দ্রনাথ খুব দীর্ঘ চিঠি লিখতেন—তাঁর মনে এত কথা ছিল যে বলে বলেও ফুরাত না, সেই জন্যই তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনা সীমার বন্ধন লঙ্ঘন করত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যের তুলনা নেই। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি চিঠির উত্তর যথাসময়ে পেতেন। তিনি জিজ্ঞাসু মনে কবির কাছে বারবার নানা প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ক্রমে তিনি কবির স্নেহ আর শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। তবে অনুমান করা কঠিন নয় যে সে সময়কার অনেক চিঠিই হারিয়ে গেছে। বার বার দেশ বদল বাড়ি বদল ও আমার মায়ের অগোছালো স্বভাবের জন্যে অনেক প্রয়োজনীয় মহামূল্য জিনিসের সঙ্গে এই চিঠিগুলিও নিরুদ্দেশ।

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন, কলিকাতা

আমি এখন উড়িবার মুখে। কিছুদিন হইতে মনটা পালাই পালাই করিতেছিল কিন্তু খাঁচার দ্বার খুলিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অবশেষে নিজেই রুদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়াছি। কাজকর্ম্ম লাভ লোকসান উচিৎ অনুচিৎ কোনো কিছুরই দোহাই মানিব না। এবার বাহির হইব এই পণ করিয়াছি। আমার পক্ষে কর্ম্মের যে প্রয়োজন ছিল সে বোধকরি শেষ

হইয়াছে। এখন আর মন পিছনে তাকাইতে বা কোনো কাজের কথায় কান দিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে আপনারা আমাকে আর পিছু ডাকিবেন না। নিমন্ত্রণ যদি করেন তবে পত্র পাঠাইবেন কোন ঠিকানায় ? আমি যে বড় রাস্তায়। নদী যেমন চলিতে চলিতে নিজের বেগে আপনার পথ কাটিয়া লয়—কোনো খাল কাটা ইঞ্জিনীয়ারকে সিকি পয়সা বেতন দেয় না আপনারও শক্তি তেমনই নিজের গতিপথ নিজের গতির দ্বারাই জয় করিয়া লইবে। আপনার বলিবার কথাই আপনার বলিবার বাহনকে দুরস্ত করিয়া লইবে—শুধু তাই নয় শ্রোতাকেও কানে ধরিয়া টানিয়া আনিবে।

আমার এখন বিদায়ের সময় আসিয়াছে—আপনার অভ্যুদয় কামনা করি "স তপোঽতপ্যতে" এই বাক্যকে স্মরণ করিয়া তপস্যাকে আশ্রয় করিবেন—রূপ পরিগ্রহের সাধনা ও বেদনার দ্বারা আপনার ভাবের সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। ঈশ্বর যাহা আপনাকে দিয়াছেন তপস্যার দ্বারা তাহাকে আপনার করিয়া লইতে না পারিলে দান করিবার অধিকার লাভ করিবেন না। নিজের ধনই আমরা দিতে পারি, ঈশ্বরের ধন দিতে গেলে কেহ তাহা লইতে পারে না।

ইতি ২৯ শে আশ্বিন ১৩১৮
আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরেন্দ্রনাথের পত্র (সংক্ষিপ্ত) ঃ

চট্টগ্রাম
পাঁচই নভেম্বর
১৯১১

শ্রীচরণেষু

গিরিবাজ পায়রার মত একটুখানি উড়িয়াই কেবল ঘুরপাক খাইতেছি ······সেজন্য অশান্তিরও সীমা নাই। আপনি বলিয়াছিলেন হৃদয়ের বল-বাহুল্য এই ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, ভাবুকতার উন্মাদনায় আমাকে মাতাল করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমাকে আপনি বন্ধনকেই নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে এই বন্ধনের দুই তটের মধ্য দিয়া মুক্তি-ধারার আনন্দলীলা খেলে যাচ্ছে। আমিও আমাকে যথাসাধ্য সংযত করে এই বন্ধনকেই মেনে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। যে শুধু ডিগবাজীরই খেলা,

যতই লাফাতে চেষ্টা করি সেই ঘুরে এসে ডিগবাজী খেতে হবে, চারিদিকে এমনই শক্ত প্রাচীর গাঁথা রয়েছে যে ছুটিয়ে কোনো দিকে বেরিয়ে যাব তার আর উপায় নেই······দৌড়ই দৌড়ের গন্তব্য স্থান। আপনার চিঠি ঠিক বুঝেছি কিনা জানি না কিন্তু যতটুকু বুঝলাম তাতে বড়ই আর্ত হয়ে পড়েছি। ······খাঁচার দরজা কি কোনো দিন ভাঙা যেতে পারে? দরজা ভাঙাই যদি শেষ প্রার্থনীয় হয় তবে খাঁচার মধ্যে যতক্ষণ আছি ততদিন কি কেবল দরজার অন্বেষণে ঠোকর দিয়াই কাটিবে? চুপচাপ করে যথাসাধ্য শিষ দিয়ে গান গেয়ে যাবো। মালিক যদি খুশী হয় নিজেই দরজা খুলে দেবে? ······কিন্তু খাঁচার মধ্যেই যদি আনন্দকে ডেকে আনতে পারি তবে খাঁচা খোলায় লাভ কি?·········আপনি যে কোথায় যাবেন তাও তো বুঝি না কতদিনের যত্নে দেশ বিদেশের খড়কুটো আনিয়া ধীরে ধীরে যে বাসা বাঁধিয়াছে সে কি আকাশের শূন্যতার মধ্যে গিয়ে আনন্দ পাবে।······পিছনের লোককে এখন ডাকতে মানা করেছেন বেশ, কিন্তু শেষে দেখবেন পিছনের লোকের সাড়া না পেলে উৎকণ্ঠায় কেমন হয়ে পড়েন, তবে সে রকম পিছনের লোক যে কোনও দিন আমি হতে পারব এমন সৌভাগ্য আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।

প্রণত সেবক সুরেন।

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

মাঘোৎসব উপলক্ষ্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। আপনার ভিতরকার সঙ্কটটি কি ঠিক জানি না—তবে কিনা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় কতকটা বুঝা যায় তাহাতে আমার মনে হয় আপন হৃদয়াবেগের টানে পাক খাইতেছেন। আমাদের দেশের প্রায় সকলকেই এই বিপত্তিটায় ভুগিতে হয়। জীবন সাধনার কোনো না কোনো অবস্থায় হৃদয়াবেগকে আমরা অতি মাত্রায় প্রাধান্য দিই তাহাতে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। আমি অনেকদিন হৃদয়াবেগের ঘূর্ণাপথে আপনার মধ্যে আপনি পাক খাইয়া মরিয়াছি। তখন দুঃখের অন্ত ছিল না, যখন শক্তির ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে মঙ্গলের পথে তাহাকে বাহির করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিলাম বাঁচিয়া গেলাম। বেশ দেখিয়াছি হৃদয়াবেগপ্রধান সাধনায় চিত্তের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গনের দ্বারা বৃথা পীড়িত

করিতে থাকি। হৃদয়কে সেই আত্মবিলীন ভাবসম্ভোগের মধ্যে পীড়িত না করিয়া যখন তাহাকে উদার কর্মক্ষেত্রে মুক্তি দিয়া বিশ্বের সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দিই তখনই সে দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া ওঠে। হৃদয়ের রসবাহুল্যে শক্তিকে যখন চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলি তখন সেই মাদকতায় এক এক সময় অস্বাভাবিক উত্তেজনার সুখ দেয় বটে কিন্তু তাহার অবসাদ অতি দুঃখদায়ক। যেমন করিয়াই হোক হৃদয়ের মধ্যেই হৃদয়ের পরিতৃপ্তি নাই—সে আপনাকে আপনি খাইয়া পুষ্ট হইতে পারে না।

যাই হোক হয়ত বাহুল্য বলিলাম—হয়ত এই সমস্ত কথা আপনার প্রয়োজনের কথা নয়। আমার আন্দাজে বোধ হইয়াছে আপনি অবরুদ্ধ হৃদয়ের বিপুলভারে জীবনের ঠিক ওজনটি হারাইবার দিকে চলিয়াছেন। যদি কথাটা সত্য না হয় তবে আমার এই চিঠিখানি মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবেন।

ইতি—৫ই মাঘ ১৩১৭

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই চিঠিখানি পড়লে প্রতীয়মান হয় শচীশের কল্পনা এইসব ভাবুক মানুষদেরই প্রতিচ্ছবি]

পোঃ ঘোড়ামারা

রাজশাহী পি ডব্লু ডী মেস

শ্রীচরণেষু,

ভূমৌ নিপত্য প্রণম্য নিবেদনং ঃ

.........বুদ্ধিতে কত কথা পাই কিন্তু বিশ্বাসে পাই না। প্রাণে ধরিতে পারি না। যখন প্রাণ বড়ই বিকল হয় তখন যেন আবার চিত্তকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সাপুড়ে সাপ খেলাইতে আসে। কোলাহলে বাড়ি ভরিয়া যায় তার বাঁশিও যেন শুনিতে পাই না। আমার সমস্ত জীবনটা যেন কি এক বীভৎস মত্ততায় অনড় হইয়া থাকে—সেই পুরানো ব্যাকুলতা যেন মূঢ়তার মধ্যে তার পথ খুঁজিয়া পায় না.........

আপনার মধ্যে অনেক দিনই তাঁর কথা শুনিয়াছি তাই অনেকদিন হইতেই আপনার সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনের জন্য আমার উৎকণ্ঠা ছিল—আপনার জীবন যেন তিনি হরিয়া রাখিয়াছেন তাই মনে হয় আপনার সহিত আলাপে

আমার অস্থির চিত্ত হয়ত শান্ত হইতে পারে.........গান সম্বন্ধে আপনি যখন কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না তখন আমি আর কি বলিব ?..........

প্রণত সেবক সুরেন

২১শে অগ্রহায়ণ নবান্ন ১৩১৭

সুরেন্দ্রনাথের লেখা অনেকগুলি চিঠি আমার কাছে আছে কিন্তু ঠিক কোন চিঠির উত্তরে কোন চিঠি তা মেলান সহজ হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমার তারিখ অনেক সময়ই বিশ্বাসজনক নয়, তার উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা করতে চেষ্টা কোরো না। তবু আমি সুরেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করছি তাঁর ভাব ও অনুভূতির রূপরসের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের চিঠি লিখতেন তাঁরাও তাঁর চিঠির মধ্যে উপস্থিত থাকতেন— যাঁর যেমন অঞ্জলি তা তেমন করে পূর্ণ করার বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল।

প্রথম চিঠিতে পথের কথা হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত চিঠিখানিতে যাত্রার কথা আছে। পূর্বের চিঠিতে নদীপথে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের শ্যামল ভূমিতে কবি চলেছেন আর এই যাত্রা সম্ভবত ইয়োরোপের দিকে। নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বে। যখন 'বড় রাস্তার' কথা উল্লেখ করছেন তখন তাঁর কল্পনাতেও নেই কতবড় পথে তাঁর আহ্বান আসছে। নোবেল প্রাইজ সেই পথের সিংহ দরজা মাত্র। এই প্রাইজের ফলে জগতে তাঁর পরিচয় হল এবং নিজের দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের জগতে প্রবেশ করলেন। সুরেন্দ্রনাথকে তিনি একটি বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন—ঈশ্বর যা দিয়েছেন তপস্যার দ্বারা তাকে আপন না করলে দান করবার অধিকার জন্মায় না। মানুষকে এই দান করবার শক্তি অর্জন করতে হয়।

এই কথাই বলাকার কবিতায় আছে—

'পাখীরে দিয়েছ সুর পাখী গায় গান
তার বেশি করে না সে দান
আমারে দিয়েছ স্বর আমি তারো বেশি করি দান
আমি গাই গান।"

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

কোনোদিন উপাধির অপদেবতা আমার স্কন্ধে ভর করিবে এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনে আসে নাই। অবশেষে বনগমনের বয়সে সেটাও ঘটিল। আমার নামটার সঙ্গে একটা আওয়াজের যন্ত্র বাধিয়া দিয়া বিধাতা এ কি কৌতুক করিলেন? ঝুমঝুমি সাপের পুচ্ছদেশে ভর করিয়া তাহার নকীব তাহার আগমন ঘোষণা করিতে থাকে—আমার মত নিরীহ জীবের পক্ষে ত সেরূপ বিধান অনাবশ্যক। আমার কাব্যলক্ষ্মীর মাথায় এতদিন যে ঘোমটা ছিল সে ভালই ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিয়া যখন তাহার মাথায় পাগড়ি পরাইয়া দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে না।

আপনার দার্শনিক প্রবন্ধটি যখন আমাকে আদরপূর্বক পাঠাইতেছেন তখন সেটা আমি পড়িব কিন্তু এ সকল বিষয়ে আপনি আমাকে অধিকারী ঠিক করিলেন কোন হিসাবে?

আমি যে কত আনাড়ি তাহার পরীক্ষা কি এমনি করিয়াই করিতে হয়? চিরকাল আমি ত সাহিত্যের খেলাঘরেই দিন কাটাইয়াছি পাঠশালা ঘরে ত পদার্পণ করি নাই—অতএব শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রে আমার মত লোকের মান ততদিন বাঁচিবে যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে। মৌমাছির বটানি শাস্ত্রে যতখানি ব্যুৎপত্তি দর্শনশাস্ত্রেও আমার ততখানি দৌড়। যে সব বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি শিক্ষা করিতে পারি সে সব বিষয়ে আপনারা শিষ্যের মত আমার কাছে উপস্থিত হইলে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।

ইতি ১৬ই কার্তিক ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬ই কার্তিক ১৩২০ তারিখে লেখা এই পত্রটিতে সম্ভবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা ও পড়াশুনো অগ্রসর হচ্ছে। তত্ত্বচিন্তায় তিনি রস পাচ্ছেন কিন্তু কবি বিধিবদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় ভীত। এই সময়েই সম্ভবত কবি সুরেন্দ্রনাথকে

শান্তিনিকেতনে একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন বক্তৃতা করবার জন্য। দর্শনশাস্ত্রে নূতন প্রবেশের আনন্দে বিভোর বক্তা আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা ক'রলেন। যখন খেয়াল হল যে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চেয়ে দেখেন শ্রোতা একলা রবীন্দ্রনাথ আর সকলে উঠে গেছেন।

এরকম ঘটনা শান্তিনিকেতনে আরো ঘটেছে। কবি দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের আহ্বান করে আনতেন বটে কিন্তু পাণ্ডিত্যের বাতাসে অনেকের শ্বাসরুদ্ধ হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন··· "শ্রীযুক্ত ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামক সিংহল দেশীয় একজন ভিক্ষু, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই যাইতাম কিন্তু দিন যতই যায় শ্রোতার সংখ্যা ততই হ্রাস পায়······শেষ পর্যন্ত দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিঁকিয়া আছেন একজন বিধুশেখর অপরজন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমি ত এখন কলিকাতায় নাই, শীঘ্র কলিকাতায় যাইবার কোনো সম্ভাবনা দেখি না। সাধনা সম্বন্ধে কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য পাওয়া যাইতে পারে এরূপ আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের মধ্যে যে সামাজিকতার ক্ষুধা আছে সম্প্রদায় কেবল তাহাই পূরণ করিতে পারে। কিন্তু আত্মার ক্ষুধা যে অমৃতে মেটে সে অমৃত তো অনেক-গুলি লোক দল বাঁধিলেই জোটে না। হাটে অনেক জিনিস মেলে সুতরাং হাটের প্রয়োজন আছে কিন্তু মাতার দক্ষিণ হস্ত হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা হাটে কিনিতে পাওয়া যায় না। একথা নিশ্চিত স্থির করিয়া রাখা চাই। আমি যে গুরু নই সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি অপাত্রে ভরসা স্থাপন করিতে গেলে ভরসাও মাটি হয় পাত্রও পীড়িত হইতে থাকে। যদি কাহারো সত্য কিছু দিবার থাকে সে তাহা গোপন করিতে পারে না। সূর্যের কি সাধ্য আছে সে আপনার আলোকে ফাঁকি দেয়? যদি জ্যোতিষ্ক হইতাম আলোর জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে হইত না। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

আমার সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আপনাদের আনন্দই আমার পুরস্কার। আমার গৌরবে আপনারা গৌরব অনুভব করিতেছেন ভগবান আমাকে এই যে অধিকার দিয়াছেন ইহাই আমার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অধিকার। নোবেল প্রাইজের একটা নির্দিষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু প্রীতির ত মূল্য নাই। আপনাদের নিকট হইতে সেই অমূল্য উপহার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আজ ইহার বেশি বলিবার আমার সময় নাই।

ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২০
আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২০ সালের ১লা অগ্রহায়ণ ও ৫ই অগ্রহায়ণের লেখা দুটি চিঠি পাশাপাশি উদ্ধৃত করা গেল। ১লা তারিখের লেখা চিঠিটি মনে হয় কার্বন কপি কিংবা ব্লকে ছাপা। একসঙ্গে অনেকের কাছে গিয়েছে। পাঁচ তারিখের চিঠি নিজের হাতে লেখা। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা তারিখই দিতেন। এই চিঠি দুটিই নোবেল প্রাইজ সংক্রান্ত।

প্রথম চিঠিখানি মনে হয় হৃদ্যতাশূন্য ফর্মাল। আমরা সকলেই জানি নোবেল পুরস্কার লাভে দেশের মানুষের আনন্দ উচ্ছলতা রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে উত্তেজিত করেছিল। তিনি একটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন, নোবেল পুরস্কার কি কবিতার মূল্য বাড়ায়? অর্থাৎ লেখক পুরস্কার পেলে যে কবিতা সাহিত্যগুণশূন্য ছিল তাতে সাহিত্যগুণ বর্তায়?

নোবেল পুরস্কার এশিয়ার মধ্যে প্রথম পেলেন রবীন্দ্রনাথ। কাজেই দেশে সাড়া পড়ে গেল। স্পেশাল ট্রেনে করে কলকাতা থেকে সবাই অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন। সেদিন আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ-উক্তি সকলের জানা। কেউ কেউ বলতেন, রবীন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করেই সভাস্থলে গিয়েছিলেন যে আজ দু-একটি স্পষ্ট কথা বলব। কিন্তু আমার যতদূর শোনা আছে, ব্যাপার তা নয়। অনেক পরে মংপু থাকা কালে সে কথা দু-একবার আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন পরেও সেদিনের কথা মনে পড়লে সলজ্জ হেসে বলতেন—আমাকে সবাই বকতে লাগলে, বল্লে, তোমার কী দরকার ছিল অত কড়া কথা বলার? তোমায় যখন সমাদর করতে এসেছে তখন মনে যা আছে মনে চেপে রেখেই দুটো মিষ্টি কথা বললে কি ক্ষতি হত? কিন্তু কি করি বল, দেখি সারি সারি সামনেই শোভা পাচ্ছে সেই মুখগুলি যেগুলি এতদিন আমার নিন্দায় মুখর ছিল, আমার প্রত্যেকটি লেখা যারা ছিন্নভিন্ন করেছে। তাই ভাবলুম হঠাৎ এদের হল কি? তাই কিছুতেই চাপতে পারলুম না। সেদিনকার ঘটনা নিয়ে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়েছি কি রকম শুকনো মুখে সবাই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু মনে মনে কবির যুক্তি তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল যে, যে-কবিতা আগে খারাপ ছিল তা পুরস্কার পাবার পর ভালো হয়ে যেতে পারে না।

উপরোক্ত চিঠিখানি কার্বন কপি। সম্ভবত এই একই চিঠি যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের সকলের কাছেই গিয়ে থাকবে কিন্তু ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে সুরেন্দ্রনাথকে যে আর একখানি হৃদ্য পত্র লেখেন সেটি যেমন আন্তরিক তেমনি সুন্দর মূল্যবোধে উজ্জ্বল। জানি না এই রকম চিঠি পাবার সৌভাগ্য আর ক জনের হয়ে থাকবে। তবে ১লা তারিখের পর ৫ই আবার এই চিঠি লেখা যে তাঁর বিশেষ স্নেহের পরিচয় তা মানতে হয়।

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

মৃত্যুর আঘাত পাইয়াছেন। এই গভীর বেদনা হইতে পবিত্র সান্ত্বনা ধারা উৎসারিত হইয়া আপনার জীবনকে অভিষিক্ত করুক এই কামনা করি।

দুর্ভিক্ষকাতর দেশকে ফেলিয়া জাপানে যাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিল না। দুঃখের ভাগ লইতে হইবে।

আপনি তত্ত্বজ্ঞানের নেশায় ভোর আছেন। এ নেশা ভাঙাইতে চাই না। কারণ নেশা জিনিসটা রক্তের ভিতরে গিয়া কাজ করে—সুতরাং ইহার ক্রিয়াটা কেবলমাত্র বুদ্ধি হইতে নহে—জীবন হইতে। অতএব আপনি যতই মাতিবেন আপনার তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। বোধ করি এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী শিব নেশায় ভোর হইয়া তবে তত্ত্বজ্ঞানকে হজম করিতে পারেন নহিলে তাঁহার কৈলাসপুরীটুকুও টিঁকিত না—শ্মশান হইয়া যাইত। অন্নপূর্ণা বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের হাতে তাঁহাকে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া দিয়া থাকেন। দিনে দিনে আপনার নেশা বাড়িতে থাকুক এবং ক্রমে অচল যোগাসন ছাড়িয়া আপনি নৃত্যে মাতিয়া উঠুন—জটার জটিলতা হইতে রসমন্দাকিনী উচ্ছলিত হইয়া মাটি ভাসাইয়া দিক।

ইতি—২০শে শ্রাবণ ১৩২২

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনি যে আনন্দ এবং তপস্যা এই দুইকে সার ধরিয়াছেন ভালই করিয়াছেন—কারণ এই দুইয়ের যোগেই সৃষ্টি। বস্তুত এই দুইয়ের মধ্যে আসলে বিরোধ নাই। তপস্যায় আনন্দের আত্মোপলব্ধি—এই দুঃখের যোগ ব্যতীত শুধু আনন্দ ফাঁকা।

পৃথিবীতে অনেকস্থলে দেখা যায় শক্তির সীমাবশতআনন্দ ও তপস্যার বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যই একদল লোক সোপান গড়িতেছে গম্যস্থানের কোনো খোঁজ রাখিতেছে না, আর একদল আকাশে পাখা মেলিয়া উড়িতেছে, তাহারা হাঁটা পথের কোনো ধার ধারে না। এইজন্য বিজ্ঞান পদার্থটা একটা abstraction হইয়া উঠিয়াছে ; তাহা প্রমাণ করে, নির্ম্মাণ করে না ; তাহা বুদ্ধির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হইয়া থাকে। প্রাণের ক্ষেত্রে রসের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইতে পায় না। বিজ্ঞান বা দর্শন যতক্ষণ technical থাকে ততক্ষণ তাহা রেশমের গুটির ভিতরকার কীটের মত পরিভাষার সূত্রজালে কারাবদ্ধ, তাহার মধ্যে

প্রবেশ কঠিন। এই সূত্রজাল কারখানা ঘরে কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু ইহা প্রাণের বাহিরে পড়িয়া থাকে। গুটি যখন পরিভাষার জাল কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহিরে আসে তখনি দর্শন বিজ্ঞান রসেরঙে বিচিত্র হইয়া সচল ও প্রাণবান সাহিত্য হইয়া উঠে। যাঁহারা এই সূত্রজালবদ্ধ গুটির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতির অবস্থা পর্য্যন্ত বরাবর নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া যান তাঁহারাই সত্যের সমগ্রতা লাভ করিয়া ধন্য হন।

অতএব আজ আপনি যদি দার্শনিক তর্কসূত্রজালের মধ্যে মনকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তপস্যা করেন এবং কাল যদি মুক্তির আনন্দলোকে বর্ণচ্ছটা বিচিত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া বিচরণ করেন তবে আপনার তপস্যা সার্থক হইল। স তপোঽ তপ্যতে—কিন্তু সেইখানেই শেষ নয় স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—সৃজনেই শেষ যে আনন্দ তপস্যাকে প্রবর্তিত করে সেই আনন্দই সৃজনের মধ্যে রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। অব্যক্ত আনন্দ তপস্যার কঠোরতার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়।

অতএব আপনি এমন মনে করিবেন না। সম্মোহনের দ্বারা তপস্বীর তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবের বিশেষ পরোয়ানা লইয়া আমি মর্ত্ত্যে আসিয়াছি—কিন্তু যাহারা তপস্যাকেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করে তাহাদের প্রতি আমার দয়ামায়া নাই জানিবেন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি আশা করেছিলেন যে জ্ঞানপিপাসু মানুষটি জ্ঞানের পথে রসের অমৃতলোকের সন্ধান পাবেন, শুষ্ক তত্ত্বচিন্তা বা যুক্তিজালের বন্ধনে বাঁধা পড়বেন না। কিন্তু তাঁর সে আশা কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে? ২০শে শ্রাবণ ও ৩রা ভাদ্র ১৩২২ এই তারিখের দুখানা চিঠিতে যেন তাই মনে হয়। অথচ সুরেন্দ্রনাথের লেখা যে চিঠিগুলি আমরা উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে রসানুভূতির কোনো দৈন্য নেই। ২০ শে শ্রাবণের চিঠিখানি সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর লেখা।

তত্ত্বজ্ঞান ও রসানুভূতির সম্বন্ধ কি এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন। হিং টিং ছট-এ তার্কিক পণ্ডিতের প্রতি বিরূপতা আছে। আবার বহু পরবর্তী-

কালে লেখা কবিতা 'মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস তত্ত্বশিরোমণির পিছে। হায়রে মিছে হায়রে মিছে।' কবিতাতেও এই একই কথা। বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য হিন্দু-জগতের এই দুটি মহামূল্যবান ধারণার উপর কবি বার বার আঘাত করেছেন। 'কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি কেহ বা পুরাণ। কেহ ব্যাকরণ দেখে কেহ অভিধান। কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনো রূপ, বেড়ে ওঠে অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ'—বিশ্বজগতের অন্তর্লীন সত্য একমাত্র জ্ঞানের পথে পাওয়া যায় না—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। এই তাঁর মত।

এই চিঠিতে রসের মন্দাকিনীর কথা লিখেছেন—সিদ্ধি এবং নেশার কথাও আছে কিন্তু এ কোন ধরনের রসলক্ষণের কথা কবি বলছেন, সে প্রশ্ন আমাদের মনে হতেই পারে। চতুরঙ্গের শচীশ গুরুর কাছে যে রসের দীক্ষা নিয়ে মেতে উঠেছিল অবশ্যই সেটা তার ত্রুটির দিক। নৈবেদ্যর প্রসিদ্ধ কবিতা 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে / মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতে গানে ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদ ধারা নাহি চাহি নাথ।' এখানে নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবদের উন্মত্ত সংকীর্তনের কথা বলা হচ্ছে। এই ফেনিল রসোন্মত্ততা কবি চান না। তবে রসমন্দাকিনী কি রকম? হাঁটা পথ ও ডানামেলার পথ দুইয়ের সম্মেলনের কথা বলছেন পরের চিঠিতে (৩রা ভাদ্র ১৩২২), স্পষ্টতই তাঁর মনে হচ্ছে যে যুক্তিতর্কের এক চুলচেরা পথে সুরেন্দ্রনাথ সত্যকে খুঁজছেন, সে পথে সত্যকে পাওয়া যায় না কিন্তু কেন এ কথা কবির মনে হচ্ছে? সুরেন্দ্রনাথের খণ্ড খণ্ড যে পত্রগুলি উধৃত করেছি তা তো রসশূন্য তর্কজালে জড়িত পাণ্ডিত্যের কচকচি নয়। তবে কি তিনি সুরেন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের ব্যাকুলতার মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যতের বিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন? এটা সত্য যে ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ এক নিগূঢ় কর্মশালায় চিরতরে প্রবেশ করলেন, সাহিত্যের মুক্তাঙ্গনে বেরিয়ে এলেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর আকুতি ছিল প্রচণ্ড। তাঁর ভিতরে এক কাব্যরসিক নিরন্তর সৃষ্টিজাল বুনে চলত এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁর মন ছটফট করত, তার নিদর্শন শেষ জীবনে লেখা কতগুলি কবিতার বই। যেগুলি লিখে তিনি নিজে আনন্দ পেয়েছেন, যদিও সেগুলি কবিতা হয় নি।

৩রা ভাদ্রের চিঠিখানিতে যা লিখেছেন সেই কথাই বহু পরবর্তীকালে ঋতুরঙ্গের ভূমিকায় বলেছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বাহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাহার

অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইয়া থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের এই নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। কোনো তত্ত্বশিরোমণি, কোনো কূটতার্কিক কোনো নিছক বৈজ্ঞানিক এই সম্পূর্ণতাকে দেখে না বলেই মুক্তির আস্বাদ পায় না।" বৈরাগ্য সাধনেও যে খণ্ডিত সেও এই মুক্তি কি জানে না। ঋতুরঙ্গের প্রথম কবিতাতেও এই কথাই আছে :

"মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস তত্ত্বশিরোমণির পিছে / হায় রে মিছে হায় রে মিছে / মুক্ত যিনি দেখ্ না তাঁরে/ আয় চলে তাঁব আপন দ্বারে,/তাঁর বাণী/ কি শুকনো পাতায় হলদে রঙে লিখেন তিনি ?/ মরা ডালের ঝরা ফুলের সাধন কি তার মুক্তি কূলেব / মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে উক্তি বাশির বিকি কিনি ?"/

প্রথম পত্রখানির পর থেকে প্রায় দশ বারো বছর পর্যন্ত পথের সন্ধানে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত পেতেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পথ নির্দেশ করতে পারলেন না—তিনি নিজেই বলেছেন একজন আর একজনকে পথের নির্দেশ দিতে পারে না। নিজেব পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। ক্রমে তাঁদেব অনুভূতির জগত ও অন্তঃপ্রকৃতি পৃথক হয়ে গেল।

সারা জীবনই সুরেন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা ও জীবনদর্শনের মধ্যে, তাঁর প্রতিদিনের আলোচনার মধ্যে, ববীন্দ্রনাথ যে কতখানি আসন জুড়ে থাকতেন সে কথা আমবা জানি। তবে শেষের দিকে যখনকার কথা আমার মনে পড়ে তখন রবীন্দ্রনাথের লেখা যত পড়া হত, যত আলোচনা হত, তত তাঁর চিন্তার তত্ত্ব অংশে যুক্তির স্খলন সুবেন্দ্রনাথেব লক্ষ্য হত। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সুরেন্দ্রনাথ ক্রমেই শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিতে দেখছেন উপলব্ধির জগতকে। ছিন্নভিন্ন হচ্ছে সাহিত্যের রসোল্লাস। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। পাণ্ডিত্য থাকলে পাণ্ডিত্যের দৃষ্টি থাকবেই কিন্তু অন্তরে তিনি রসপিপাসু পাঠকই ছিলেন এবং একথাও মানতে হবে সুরেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথের নিবিষ্ট পাঠক ও ভক্ত ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর ববীন্দ্রনাথও তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন বারংবার এবং বিলাতে প্রতিষ্ঠিত করতেও সাহায্য করেছেন। সুভাষচন্দ্র যে পরিচয়পত্র চেয়ে পাননি এবং তাতে দুঃখ পেয়েছিলেন, সে রকম পরিচয়পত্র রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে অনায়াসে দিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণমেতৎ,

আপনার লেখাটি সম্পাদকের হাতে দিয়েছি। কিন্তু যেহেতু আমাকে এই প্রবন্ধটির বিষয় করেচেন সেইজন্য মুদ্রাযন্ত্রে এই রচনার ভবযন্ত্রণা আমি কামনা করিনে—আমি আশীর্ব্বাদ করি এর কৈবল্য লাভ হোক। যাই হোক সে যখন বিধাতাপুরুষের হাতে গেছে তখন তিনি তার ললাটলিপি ঠিক করে দেবেন, আমি কোনো কথা কব না। "শিক্ষার বাহন" লেখাটি পৌষের সবুজ পত্রে দেখতে পাবেন। ৭ই পৌষের উৎসব আসন্ন, সেই নিয়ে কিছু ব্যস্ত এবং ক্লান্ত হয়ে আছি—সমাধা হয়ে গেলে একবার নদীতে বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা আছে। চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রং-এ আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়ে ঘর আছে তার ফোটো বা অন্য কোনোরকমের প্রতিকৃতি, আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির বাঁশের বা বেতের শিল্প কাজ কি রকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।

আপনার স্ত্রীকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবেন। তিনি এই সংগ্রহ কার্য্যে যেন আমার আনুকূল্য করেন।

ইতি—১লা পৌষ ১৩২২
আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার শৈশব থেকে যতদূর পর্যন্ত আমার স্মৃতি যায়—আমাদের বাড়িতে যেন রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সশরীরে অধিষ্ঠান করতেন। আমরা যখন চট্টগ্রামে থাকতাম, অর্থাৎ আমার জন্ম থেকে নয় দশ বছর কাল অবধি, তখনই, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই, আমি তাঁর কথা প্রচুর শুনতাম। তিনি যেন আমার পিতামাতার কথোপকথনে, হাসে-লাস্যে অনুরাগে-বিরহে সর্বদা উপস্থিত

থাকতেন। প্রতি শনিবার আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় একটা সাহিত্যসভা বসত। অনেক অধ্যাপক আসতেন। তাঁদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথাই আমার মনে আছে, কারণ তাঁরাই ঐ সময় মুখর প্রশ্নকারক ছিলেন এবং ব্যাখ্যা করতেন আমার পিতা। আমার মা চিকের আড়ালে থেকে বৈঠকখানা ঘরে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা মনোনিবেশে শুনতেন কিন্তু সেখানে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। আলোচনাতেও তিনি যোগ দিতে পারতেন না ; কিন্তু তাঁর নিজের একটি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, যিনি রান্নাঘরে তাঁর আঁচলের তলায় কুলুঙ্গীতে বা তরকারীর ঝুড়ির মধ্যে ঢাকা থাকতেন—ঠাকুমার পায়ের শব্দ পেলে বইখানা ঝুড়ির উপর থেকে আলুর নিচে চালান করে দিতেন। ফলে, মলাট যেত ময়লা হয়ে কিন্তু কবিতার পদগুলি মনে মনে গুঞ্জরিত হত। কবিতার গুঞ্জরণ মার মনের মধ্যে অনবরত আসা-যাওয়া করত, যদিও মাকে ঠিক বিদগ্ধ পাঠক বলা চলে না। তিনি ছিলেন একেবারে অন্ধভক্তের দলে। বৈঠকখানা ঘরের কোনো বিরূপ সমালোচনা শুনলে মার চোখ দিয়ে নাকি জল পড়ত। এসব আমার মনে থাকবার কথা নয়। তবে পরে যখন শুনেছি তখন সেই কবিতাটি মনে হয়েছে যেন আমার মাকে দেখেই লেখা ঃ

> "ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মীবধূ যেথায় আছে কাজে,
> ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে।
> বালিশ তলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তারে
> পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে—
> কাজল-আঁকা সিঁদুর মাখা চুলের গন্ধে ভরা
> শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে চাস্ কি যেতে ত্বরা ?
> বুকের পরে নিঃশ্বসিয়া স্তব্ধ রহে গান
> লোভে কম্পমান।"... ....

এই সময়ে মার কথা হয়ত রবীন্দ্রনাথ শুনে থাকবেন, তাই উপরে উদ্ধৃত চিঠিখানিতে তাঁকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন।

শুনেছি এই চিঠিখানি শনিবারের সেই সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল এবং প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। সেদিন নাকি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ভারি আশ্চর্য তো হয়েছিলেনই, কিছুটা হতভম্বও হয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ বাঁশের বেড়া দিয়ে কী করবেন ? যে রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের তথা এশিয়ার মধ্যগগনে দীপ্তিমান, যাঁর কবিতা, দর্শন, সাহিত্যকীর্তি বিশ্ববিশ্রুত, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে স্পর্ধিত ইয়োরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এশিয়ার

বিজয় ঘোষণা করেছেন, তিনি পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের আঁকা আলপনা বা বাঁশের নক্সা দিয়ে কী করবেন ? ও সব জিনিষ বিদ্বান মানুষদের তখন চোখেই পড়ত না।

আমাদের চট্টগ্রামের ভাড়া বাড়ি ছিল দোতালা। কাঠের সিঁড়ি, দোতলার ঘরে কাঠের মেঝে, আর একতলার বাইরের বারান্দাটি তিন দিকে একরকম বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তাতে খুব সহজে যে লতা জন্মায় সেই মর্নিং গ্লোরি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠত। এখন বুঝতে পারি ইঁটের বাড়ির সঙ্গে একসঙ্গে লাগান ঐ বাঁশের ঘরটির একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় না তখনকার দিনের ইংরেজি পড়া মানুষরা তা দেখতে পেতেন। আমাদের গ্রামীণ শিল্প, অর্থাৎ শিল্পচেতনার উৎসমুখ যেন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দাম বাতাসে উড়ে আসা খড়কুটোয় ঢেকে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। আমার মা ভালো আলপনা দিতেন। আজকালকার তুলি, রঙের পেনসিলে এঁকে আলপনা নয়—চালবাটা একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে 'ফ্রি হ্যাণ্ড' নক্সা এঁকে এঁকে বিরাট বৌছত্র উঠান জুড়ে ফুটে উঠত। আমি শুনেছি, তিনি কিছু আলপনার নক্সা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু বাঁশের বেড়ার নক্সা পাঠান হয়েছিল কিনা মনে পড়ে না, চিঠিপত্রেও কিছু দেখছি না। যদিও আজ মনে পড়ে আমাদের বাড়ির আশেপাশেই বাঁশের নক্সা ছিল। ঠিক পাশের বাড়িটা ছিল একটা মাটির দোতালা, আম কাঁঠালের গাছে ছায়ায় ঢাকা। তারই সংলগ্ন দুটি বাঁশের ঘর, চেরা বাঁশে বোনা বাঁশের লেসের মত, মাঝে মাঝে বাঁশের টুক্‌রোর ফুল লাগান ছিল। একদিন মধ্যরাত্রে আগুন লেগে ঐ ঘর পুড়ে যায়। এখন বুঝতে পারি ঐ ঘরটি আজকের আমাদের চোখে কত সুন্দর লাগত। অর্থাৎ সুন্দর লাগবার শিক্ষাটা রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন।

১লা পৌষ ১৩২২-এর পত্রে সুরেন্দ্রনাথের কোন লেখার কথা উল্লেখ আছে তা আমরা জানি না—অনুমান করতে পারি সেটা বোধহয় 'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে। কারণ এইটে ফাল্গুনীর কাল। এর পরের চিঠিতেও লোকশিল্পের উল্লেখ আছে। এখানেও সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে লোকশিল্পকে বুঝবার মন আমাদের নূতন করে তৈরী করে নিতে হবে। কারণ সেই আদিম সৌন্দর্যচেতনা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। পরের চিঠিতে লিখেছেন : "ভালো হোক মন্দ হোক নির্বিচারে সংগ্রহ করবেন," একথার অর্থই এই যে ভালো-মন্দের তফাৎ আপনারা করতে পারবেন না।

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন,

ফাল্গুনী অভিনয়ের হাঙ্গামে বড় ব্যস্ত আছি। ২৯শে এবং ৩০শে জানুয়ারী এই দুই দিন অভিনয় হবে। আপনারা আসতে পারলে খুব খুশী হই। ২৯শে তারিখের টিকিটগুলি সমস্তই বিক্রি হয়ে গেছে, অতএব আসেন তো ৩০শে আসবেন।

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি অতি সরল। সে হচ্চে এই যে—জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্চে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন। এই জন্যে জগতে চারিদিকে যৌবনটাকেই দেখচি, জরাটা চলে চলে যাচ্চে। তাকে এই দেখচি, তার পরক্ষণেই দেখচি নে। যেই শীতে সমস্ত ঝরে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই, বসন্ত এসে সমস্ত পূর্ণ করে বসেচে। তার থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকেই পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়। এই জন্যে সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়—হারিয়ে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যদি না চলে তাহলে পুরাতন আর নূতন হয় না-- আমাদের নূতনটাকে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি। ফাল্গুনীতে গীতি নাট্যাংশটুকু হচ্চে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা। আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যু-গুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সেই বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীত-বসন্তে, মানব প্রকৃতিতে সেই লীলা জরা-যৌবনে, জন্ম মৃত্যুতে। এই কথাটাকেই গীতে এবং নাট্যে ফাল্গুনীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে গার্হস্থ্য শিল্পের যে সব নমুনা সংগ্রহ করবেন তা খুব বেশি বাছাই করবেন না। জিনিষগুলো খাঁটি পুরাতন হওয়া চাই। সুশ্রী না হ'লে কোনো ক্ষতি নেই। কলানৈপুণ্যের উৎকর্ষ বিচার করবেন না, ভালো হোক মন্দ হোক নির্বিচারে সংগ্রহ করবেন। মন্দের ভিতরেও একটা মানে আছে—সেটা আমাদের বুঝে দেখতে হবে।

ইতি ৫ই মাঘ

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগেই বলেছি এই সময়টা ফাল্গুনীর কাল। অর্থাৎ প্রায় একযুগ ধরে ফাল্গুনী নাট্যকাব্য দেশের মনে জোয়ারের ঢেউয়ের মত ওঠা পড়া করেছে।

আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে পাকাচুল খুঁজতে খুঁজতে একদিন আমার পিতা মাকে ফাল্গুনীর তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন—রাজা কানের কাছে একটি পাকা চুল পেলেন তাতেই এত বড তত্ত্বগর্ভ ফাল্গুনী নাটক প্রকাশ পেল! তখনকার দিনের ভাবুক মনের কাছে ফাল্গুনী এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসসঞ্চার করেছিল। সে সময়ে যাঁরা তত্ত্বচিন্তা বা ধর্মচিন্তা করতেন তাঁরা দর্শনের কুটতর্ক বা শাস্ত্রীয় ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভাবতেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল আত্মা কি, পরলোক কী রকম, জন্মান্তর আছে কি না, কি করে মোক্ষ লাভ হবে, কী ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যাবে, মৃত্যুর পরের অস্তিত্বই বা কেমন? স্রষ্টা আর তাঁর সৃষ্টি কি এক না পৃথক? চিন্তার এই জগতে মানুষ ঘুরপাক খেত—জমে উঠত তর্কের পাহাড়। চিন্তার এই মরুভূমিকে রসনিষিক্ত করে দিল ফাল্গুনী কাব্য। জগতের মধ্যেই জগতের অতীতকে অনুভবে পাওয়া গেল নৃত্যগীতচ্ছন্দে। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষ এবং জীবন মৃত্যুর লীলাকে এক আনন্দস্বরূপে মগ্ন করে একই মালায় গেঁথে রবীন্দ্রনাথ যখন পাঠক ও দর্শকদের এক আশ্চর্য অনুভূতির পরিচয় দিলেন তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরক্তদের বিস্ময় ফুরাতে চাইল না। "তোমায় নূতন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ/ও মোর ভালোবাসার ধন—" এই সুরে মাতাল প্রাণতত্ত্ব তাঁদের মনকে এমন করেই ভরে দিল যে মৃত্যুর শূন্যতার অন্ধকার গহ্বরের ভয়ের চেয়ে প্রেমের বিশ্বাসই সুরে সুরে মুখরিত হল—"দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন।"

মনে হয় এই বইতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের "নাস্তিকতার" দিকে পদার্পণ। অর্থাৎ ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, প্রভৃতির কোনো সাহায্য না নিয়েই ইহলোকের অনুভূতিগুলির মধ্যেই অ-লোককে ডাক দিয়ে নিয়ে এলেন।

এই সময়ে আমার পিতা ফাল্গুনীর একটি সমালোচনা লেখেন। ইংরাজী allegorical নাটককে বাংলাতে আমরা 'রূপক' বলি, সুরেন্দ্রনাথ আরি একটি কথা বলেছিলেন—"ছলিক"। ফাল্গুনীর সমালোচনার আরম্ভে তিনি বলছেন "পূর্বে আমাদের দেশে ছলিক বলে এক রকম গীতাভিনয় হত সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনো গূঢ় অভিপ্রায় অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তাতে স্থান পেত না। কাব্যের মধ্য দিয়ে অভিনেতার

কোনো ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠতে পারে, এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।" ফাল্গুনী কাব্যকেও সুরেন্দ্রনাথ এক নূতন ধরনের ছলিক বলেছেন। নাট্যামোদীদের জন্য ছলিকের বর্ণনাটির উল্লেখ করলাম। যাত্রা পালাগান ইত্যাদির কথা আমরা শুনি কিন্তু ছলিক অভিনয়ের কথা কখনো শুনি না। ফাল্গুনীর সঙ্গে ছলিকের পার্থক্য এই যে এতে কোনো ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই। "সমস্ত জগতের লীলা প্রবাহের ভিতর দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগ-যুগান্তর ধরে নিত্য নব ভাবে ফুটে উঠছে সেটিই হচ্ছে এই ছলিকের ভিতরকার কথা।" সেই লীলা কী?

সে জন্ম-মৃত্যুর লীলা। যা প্রত্যেক দার্শনিককে, কবিকে, ভাবুককে বা সামান্য সাধারণ মানুষকেও বারবার বিস্ময়ে অভিভূত করে। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন, "এই জন্মমৃত্যুর সমস্যা কবি ব্রাউনিংএর সামনেও এসেছিল। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইহজন্মের জরা বার্ধক্য মৃত্যু প্রভৃতি অপূর্ণতা দ্বারা আমরা এইটুকু অনুমান করতে পারি যে পরলোকে আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন অপেক্ষা করে রয়েছে। সেইখানেই আমাদের জীবনতন্ত্রীর ভাঙা সুর একত্র হয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবনসঙ্গীতের সৃষ্টি করবে।....নচিকেতাও যমকে এই প্রশ্ন করেছিলেন আর তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন যে জন্মমৃত্যু কল্পনা মাত্র, একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষ্য বস্তু। রবীন্দ্রনাথ এই দুই মতের কোনোটির কথা বলেন না। তিনি বলচেন মৃত্যুকে নিয়েই অমৃত। তাই উভয়ে একত্রে অনন্তের পরিণাম লীলা সম্পন্ন করছে।"

শিলাইদহ
নদীয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন,

ফাল্গুনীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেচেন সেটি আমার তো ভালো লেগেচে। আমি ফাল্গুনীর রচয়িতা বলেই যে এমনটি ঘটল তা বোধ হয় না—কারণ এতদিন ধরে লিখে আসচি যে আমি যে, লেখক এ কথাটা ভোলবার সময় হয়েচে।

প্রবাসীতে যাতে লেখাটি বেরয় সেজন্য আমি এবার বিশেষভাবে তাগিদ করব। সম্পাদকের উপর মোড়লি করতে আমি কখনো সাহস করিনে—বিশেষত যে লেখা আমার নিজের সম্বন্ধে তা নিয়ে। কিন্তু এবার আমি বিনা সঙ্কোচে একটু জোরের সঙ্গেই হাঁক ডাক করে দেখব। ফাল্গুনীটা কোনো এক

ফাল্গুনে আমের মঞ্জরীর মত অকস্মাৎ দক্ষিণ পবনে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তারপরে সেটা মধুকরের গুঞ্জন গান না শুনেই কেবল মাত্র কীটের দংশনেই বিমর্ষ হয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে, তাতে কোনো ফল ধরবে না, এটা আমার পক্ষে ক্লেশকর। জিনিষটা যে রসাল জাতীয় আপনি সেটা বেশ করে প্রমাণ করেছেন। আপনি ওটাকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করে ওর স্বাদগন্ধ এবং বর্ণ নানা দিক থেকে যাচাই করে দেখেচেন, এই ইতিহাসটুকু কোনো এক মাসিক পত্রের সদ্যঃপাতি পত্রে পুষ্পরেণুর মত কিছুক্ষণের জন্যও সংলগ্ন হয়ে থাক না। যদিচ এক মধুপের গুঞ্জনেই বসন্তের আসর জমে না কিন্তু আমার পোড়া কপাল ফাল্গুনও জ্যৈষ্ঠের মত রুদ্রমূর্তি ধরে ওঠে ; অতএব কোনো একটা দুঃসাহসিক দক্ষিণ হাওয়ার একটু দাক্ষিণ্যও যদি পাই তবে সেইটুকুই সঞ্চয় করে নিয়ে এবারের বসন্ত লীলা চুকিয়ে যেতে চাই।

সবুজ পত্রে আমার সম্বন্ধে আলোচনায় আমি সঙ্কোচ বোধ করি, ভারতীও কতকটা তদ্রূপ। প্রবাসী আমার প্রতি প্রতিকূল নন অতএব আমার কাব্য সমালোচনা ওঁরই সভাপ্রান্তে আসন যদি পায় তবে সেটা অশোভন হয় না —অতএব প্রবাসীর দরবারে আমি আমার দরখাস্ত পেশ করব।

ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক পরে বলাকা ফাল্গুনী ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ও নাটিকা প্রভৃতির সঙ্গে বের্গসঁর মতবাদের সাদৃশ্য আমাকে আমার পিতা বুঝিয়ে ছিলেন। গতিধর্মী সেই সৃজনীশক্তি (elan vital) সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে চির অফুরান বেগে উৎসারিত। তিনি আমাকে এও বলেছিলেন, আগেকার দিনে জন্মান্তরের আশ্বাসে মানুষের মৃত্যুভয়ের সান্ত্বনা হত, এযুগে তা বিতর্কিত, প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু এক ক্ষয়হীন প্রাণশক্তির মধ্যে জীবনের অমরতার আস্বাদ প্রতি মুহূর্তে গ্রহণ করে যে অভয় পাওয়া যায় তা অতুলনীয়।

ফাল্গুনীর উপরে লেখা প্রবন্ধটিতে সুরেন্দ্রনাথ বলছেন : "সমস্ত নাটক-খানিই যেন একটি ফাল্গুনের বসন্তোৎসব। যেন হঠাৎ কবির মধ্য থেকে পরভৃতিকা গান গেয়ে উঠছে।

"বিশ্বনাথের খেয়াল ও কবির খেয়ালে মিলে একটি অপূর্ব খেলার সৃষ্টি করেছে আর অভিনেতৃবর্গের পায়ের নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে একটি নবজীবনের

নবীন আশার বাণী উঠছে :

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা—”

প্রীতিসম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,

আপনার বই যখন হাতে আসে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। পড়বার সময় পাইনি। তারপর এখন শরীর মন এমন ক্লান্ত যে কোনো বিষয়ে অবধান করতে ইচ্ছা হয় না। ডাক্তার চিঠিপত্র পড়া ও জবাব দেওয়া নিষেধ করেচে। সেইজন্য কর্মের অনারম্ভর দ্বারা যে নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায় আজকাল তারই চর্চায় প্রবৃত্ত আছি। নৈলে উত্তর বাতাস যখন বইছিল তখনই উত্তর পেতেন, আকাশে দক্ষিণ পবনের দাক্ষিণ্য সঞ্চারের জন্য অপেক্ষা করতে হত না।

ইতি ১৩ই মাঘ ১৩২৪
আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উল্লিখিত বইটি সম্ভবত 'তত্ত্বকথা' নামে একটি প্রবন্ধের বই। 'নিবেদন' ও 'তত্ত্বকথা' এই দুটি সুরেন্দ্রনাথের প্রথম লেখা। দেখা যাচ্ছে ১৩২৪ সালেই ডাক্তারেরা চিঠিপত্র লেখা বারণ করেছে, তারপর আরো পঁচিশ বছর ধরে কয়েক সহস্র পত্র লিখেছেন। হাওয়ায় আন্দোলিত বৃহৎ বনস্পতির মত প্রত্যেক মানুষের স্পর্শে অজস্র অবিরাম পত্রধারা ঝরে পড়েছে।

কল্যাণীয়েষু,

বক্তৃতা উপলক্ষে দক্ষিণভারতে এক চোট ভ্রমণ সেরে সম্প্রতি কাশীতে গিয়েছিলুম। সেখানেও বক্তৃতার পালা ছিল। এক্ষণে অসুস্থ হয়ে ক্লান্ত দেহে শয্যাগত হয়ে আছি। ডাক্তারের আদেশ মত সকল কর্ম ত্যাগ করে কিছুকাল শুয়ে থাকতে হবে। কিছু সুস্থ হয়ে উঠে আপনার অনুরোধ পালন করব। আমি Mind-এর সম্পাদককে জানিনে। জাপানের কাগজের জন্য খুব বেশী শক্ত কিছু লিখবেন না—সরল এবং সরস করে আপনার মন্তব্য এবং বক্তব্য জানাবেন।

ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩২৬
পরিশ্রান্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই চিঠি থেকে নিঃসন্দেহ হচ্ছি যে পূর্বে যে বইটির উল্লেখ আছে সেটি 'তত্ত্বকথা'—তত্ত্বকথা দুরূহ বই। পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথের লেখা

অপেক্ষাকৃত সহজ হত। তিনি নিজেই আমাদের অনেক সময় বলেছেন, বিদ্যা খাদ্যের মত জীর্ণ হয়ে যখন রক্তে সঞ্চারিত হয় তখনই তা সার্থক। অধিকাংশ মানুষই বিদ্যার ভারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি আরো বলতেন, "বিদ্যার বোঝায় ন্যুব্জ হয়ে বেড়াচ্ছি আমরা আর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যা তাঁর রক্তে মিশে গিয়ে দুদিকে ডানা গজিয়ে দিয়েছে, তিনি মহাকাশে উড়ছেন।"

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আমি পলাতক। আমি বর্ষার কাছ থেকে যেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছি সে প্রান্তরে, বর্ষা এখানে আকাশকে লুপ্ত করে মানুষের মনের জন্য স্থান ছেড়ে দেয় না—অনেকটা অধীন কর্মচারীর পরে উপরওয়ালা ইংরেজের মত ব্যবহার, নিজেই চৌকি জুড়ে বসে, আর কাউকে বসবার জায়গা দেয় না। কিন্তু বোলপুরের মাঠে আমাদের প্রতি তার এমন অসম্মান নেই। অতএব সেইখানকার দরবারই আমাদের পক্ষে যোগ্য স্থান।

সিংহকে আপনার কথা বলেছি। ফললাভের আশা আছে। আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে ভুলবেন না: তিনি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

আজই আমার যাত্রার দিন। অতএব কলকাতায় সাক্ষাৎ হবে এই আশা করে বিদায় নিলেম। আপনার সঙ্গে আমার আলোচ্য বিষয় একটি আছে।

ইতি—৩রা আষাঢ় ১৩২৭

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনাজপুরের রাজাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কেম্ব্রিজ যাবার কথা হচ্ছিল, হয়ত সেই কারণে লর্ড সিংহের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা হয়ে থাকবে। আলোচ্য বিষয়টি কি তা আমার জানা নেই। দিনাজপুরের রাজার সঙ্গে আমার পিতার যোগাযোগের কথা কোনো দিন শুনিনি। একমাত্র কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ছাড়া আর কোনো রাজা মহারাজার সঙ্গে সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল বলে জানি না।

আমার মাতামহ হেমেন্দ্রনাথ রায় বিভিন্ন এস্টেটে দেওয়ানী করায় তাঁর সঙ্গে দিনাজপুরের রাজার সংযোগ হতে পারে। আমার মাতুল হিমাংশু রায় ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র। কাজেই আমার মাতৃকুলও রবীন্দ্রনাথের অচেনা ছিল না।

আমার পিতার কাছে শুনেছি তিনি কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থ্যাকারস্পিঙ্ক-এর দোকানে বই দেখতে ও কিনতে বেরুতেন। বই দেখে দেখে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যেত, স্নানাহার হত না। এই গল্প শুনে আমি মানস-চক্ষে রবীন্দ্রনাথের ঋজু দ্রুত চলনশীল মূর্তি দেখতাম। আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না।

এর পরের চিঠিগুলিতে বোঝা যাবে যুবক সুরেন্দ্রনাথ যে পথের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন তার চেয়ে অন্যতর ও বাস্তব জীবনের পথেও তাঁকে সহায়তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সবটুকু সময় নিজের বিবিধ ও বিচিত্র কর্মে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও অন্যের সাহায্যে চিন্তা ও শ্রম দান করতে কোনো দিন এতটুকু দ্বিধা করতেন না—এবং এই 'অন্য' বলতে পরিচিত অপরিচিতের এক বিরাট পরিধি ছিল।

তখনকার দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সব যুবকই কোনো না কোনো আব্দার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হতেন, আর সুরেন্দ্রনাথ তো ছিলেন একজন অসাধারণ যুবক।

পরবর্তীকালের বহু নামী মানুষকে বিদেশে পরিচিত করতে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী উপকৃত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁর বিদেশের সমস্ত পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে হয়েছে। পুত্র, পুত্রবধূ ও সেক্রেটারী রূপে সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র ১৯২৬ সালে সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। সেবার তাঁদের বহু মনীষীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। ফ্রয়েড, বের্গসঁ, রমাঁরোলাঁ, রাসেল প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখযোগ্য নামই সে তালিকায় ছিল। যে সমস্ত মনোজ্ঞ আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা তাঁর পুত্র বা সেক্রেটারী কেউই লিপিবদ্ধ করেন নি বলে হারিয়ে গেলো। বলতে গেলে অমূল্য সম্পদই খোয়া গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর পরে রাণী মহলানবীশ কিছু কিছু লিখেছেন, তাতে সেই বিরাট চলচ্চিত্রের রূপ বিধৃত হয় নি।

সুনীতিকুমারও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব এশিয়াতে গিয়েছিলেন, তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর রচনা পড়েছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই যুগে যেসব অসাধ্য সাধন করছিলেন তার বিশেষ খবর পাই না।

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার তুলনা নেই। দেশ বিদেশে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে, মহামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী পরিচয়ে দ্বার

মুক্ত হয়ে গেছে ইউরোপে তাঁদের কাছে, যাঁরা সচরাচর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না—কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি।

প্রশান্তচন্দ্র বিশ্বভারতী গঠনের কাজে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেছেন একটা সময়ে। তিনি লেখক নন, লিখতে পারেন নি, একদিক দিয়ে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অপরিশোধ্য ঋণের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেন নি।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠিপত্র দেখে যাই মনে হোক তিনি কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারেন নি। তাঁদের চরিত্রে বৈপরীত্য ছিল। সেই বৈপরীত্য এত সূক্ষ্ম ও নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত যে তা লেখনীর ভর সইবে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদেশে পরিচিত হতে সাহায্য করেছেন, যদিও অন্যদের যা করেছেন সে তুলনায় সামান্য। তিনি অবশ্য সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচুর লেখা লিখে গেছেন। তাঁর শেষ বই 'Rabindranath, the poet and the philosopher' প্রচারের অভাবে তেমন পরিচিত না হলেও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তাছাড়া রবীন্দ্র পরিষদ স্থাপনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনার একটা পথ তিনি নির্দেশ করে গেছেন।

De Duinen
Huiazen N. H.

কল্যাণীয়েষু

আমি সম্প্রতি হল্যাণ্ডে আহূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে শিক্ষিত সমাজে অধিকাংশ লোকে ইংরেজি জানে সেই জন্যে এখানে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করার বাধা নেই। এমেরিকায় পাড়ি দেবার সময় আমার আসন্ন হয়েচে। অতএব তোমার সঙ্গে, পশ্চিম সমুদ্র পারে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। ইংল্যাণ্ডে তুমি বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা কর। কিন্তু সেখানে তোমার বক্তৃতার পালে অনুকূল হাওয়া লাগবে না। ভারতবাসীকে ইংরেজ সহজে স্বীকার করতে চায় না। তাছাড়া প্রত্যেক জাতের মানসিক স্বাদ গ্রহণ শক্তির বিশেষত্ব আছে—খাদ্য পদার্থ শুধু সারবান হলে চলবে না স্বাদবান হওয়া চাই। কিন্তু এই স্বাদ জিনিষটা সকল রসনায় তো সমান নয়—ইংরেজের রসনাতত্ত্ব আগে তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে তবে ওদের রসদান করতে পারবে। তুমি বোধহয় 'Quest' কাগজের নাম শুনেছ। ঐ কাগজ সম্পর্কে একটি

Quest Society আছে। এই সোসাইটিতে হয়ত তোমার বক্তৃতা শুরু করা কঠিন হবে না। একবার কোথাও প্রবেশাধিকার পেলে যদি তুমি শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারো তাহলে ক্রমশ একটা একটা করে দরজা খুলতে থাকবে। Quest কাগজে প্রবন্ধ লিখতে পার Hibbert Journal-এও প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা কোরো—এ সব দেশে প্রথম পরিচয়ই কঠিন—যদি একবার পরিচয় দিতে পার তাহলে কোথাও আর বাধবে না। আমি তোমাকে Quest পত্রের সম্পাদক Mead সাহেবের নামে পত্র দিচ্চি। এঁর যোগে ইংল্যাণ্ডে তোমার পরিচয়ের পন্থা বিস্তৃত হতেও পারে। মোটের উপর একথা নিশ্চয় জেনো ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতার সুযোগ ঘটা কঠিন। Hibbert Journal-এর সম্পাদক Mr. L. P. Jack যদি তোমার রচনায় সন্তুষ্ট হন তাহলে তাঁর যোগে Oxford Manchester College-এ তোমার আমন্ত্রণ ঘটা সম্ভবপর হতে পারবে।

আমি অনবকাশের নিবিড়তা ভেদ করে তোমাকে এই পত্র লিখলেম।

ইতি ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Mead সাহেবের ঠিকানা ঠিক মনে পড়চে না। তপন জানে। কোনো এক খণ্ড Quest পত্র থেকে তার ঠিকানা বের করতে পারবে।

১৯২০-২১-২২ বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ইউরোপে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। যদিও ইংরেজের কাছে তেমন সাড়া পাননি। এটা নাইট হুড ত্যাগের ফল। রাজভক্ত ইংরেজ, রাজাকে প্রত্যাখ্যান তারা ক্ষমা করতে পারেনি। এছাড়া দ্বৈপায়ন ইংরেজরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সহজে কিছু গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাহলে তাদের ভারতে রাজত্ব করার যুক্তিগুলি ক্ষীণ হয়।

Mind-এর সম্পাদকের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ভালোমতই হয়েছিল। তার প্রমাণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিনামূল্যে Mind পত্রিকা তাঁর কাছে আসত। আমাদের বাড়ির লাইব্রেরীর উচ্চতম তাক-এ সমাসীন বাঁধান Mind-এর দুর্বোধ্য ও ভয় দেখান সারি আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইংরেজদের সাংস্কৃতিক জগতের দ্বার খোলানো শক্ত হলেও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার দ্বারা সহজেই নিজের স্থান করে

নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় আজকালকার ইংলিশ মিডিয়ামের ঝোঁকে কেমন করে দেশীয় ভাষাগুলি উৎপাটিত হয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরা মনে করেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে না পড়লে আর ইংরেজি শেখা বা বলা যাবে না। ছোট থেকে ইংরেজিতে কথা না বললে ইংরেজি বলা যায় না—সেজন্য অনেক স্কুল থেকে বাপ মাকে বলে দেওয়া হয়—ইংরেজিতে কথা বলতে বাড়িতেও। অর্থাৎ মাতৃভাষা না ভুললে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়া যাবে না। হিবার্ট লেকচার দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এ সমস্ত বক্তৃতা লিখেই দিতে হত। রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট লেকচার সেই অসামান্য গ্রন্থ Religion of Man। কিন্তু এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথকে অনবরতই ইংরেজি ভাষায় extempore বক্তৃতা দিতে হয়েছে। ক্রমে তাঁর বক্তৃতার দুরূহতা সরলীকৃত হয়েছিল। হাস্যরসের সিঞ্চনে ঝকমকে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের ভাষণে করিনথিয়ান সেনেট হল গম গম করত। সে সময়ে মাইক ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল এক অক্টেভ উঁচুতে বাঁধা তবু তিনিও ঐ বিরাট সেনেট হলের শেষ পর্যন্ত শোনাতে পারতেন। বর্তমানে মাইকের ফলে সে ক্ষমতা আজ আর কারুর নেই।

যাই হোক King's English-এর কথা হচ্ছিল। তখনকার দিনের বাঙালীরা যাঁরা ইয়োরোপে আমেরিকায় বক্তৃতা করে ইংরেজিভাষী লোকদের চমৎকৃত করেছিলেন, তাঁরা কি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিলেন? বিবেকানন্দ কোথায় পড়াশুনো করেছিলেন জানি না কিন্তু তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে বা রামকৃষ্ণপরমহংসের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতেন, একথা মনে হয় না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িকেও ঠিক সাহেবী বাড়ি বলা চলে না। শুনেছি মহর্ষিকে বাড়ির কোনো জামাই ইংরেজিতে চিঠি লিখলে (তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল যে পুরুষ মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন)। তিনি সে চিঠি ফেরৎ দিয়েছিলেন। বাঙালীর মধ্যে এক তিনিই এ কাজ করতে পারতেন। জামাইকে অসন্তুষ্ট করা সহজ নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিবার বরং ইংরেজিনবীশ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী ছোট থেকে বিলেতে বাস করার দরুণ খুব ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন ওদের কাছে ইংরেজি বিদ্যায় নিজেকে খুব হীন মনে করতুম। কেন যে worm ওয়ার্ম হবে আর warm ওর্ম হবে দুই অবিশ্বাস্য উচ্চারণ নাকি ঐ বালকবালিকা দুটিই রবীন্দ্রনাথকে শিখিয়ে-

ছিলেন। নিজের ইংরেজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুবই সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাই প্রথম দিকের সমস্ত অনুবাদগুলিই অন্যের করা। গোরা অনুবাদ করেছিলেন পিয়ার্সন ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সেই বইয়ের ইংরেজি কালধর্মে পুরানো হয়েছে। কিন্তু যে বই বিশ্বজনের সমাদর পেল সেই গীতাঞ্জলি তাঁর নিজেরই অনুবাদ। সেই অনবদ্য ভাষা ইংরেজের ইংরেজি হোক বা না হোক, তাঁর কাব্যের ছিল উপযুক্ত বাহন। আজকাল অনেকে গীতাঞ্জলির ইংরেজির পরিবাদ করেন বটে কিন্তু সেই সময়কার পরিশীলিত ইংরেজ মনে তার কি প্রভাব পড়েছিল তার বহু দৃষ্টান্ত থেকে দু একটি তুলে দিচ্ছি ঃ

"I know of no man in my time who has done anything in the English language to equal Mr. Tagore's lyrics (W. B. Yeats).

"This person should receive not one but many Nobel Prizes" (Manchester Guardian, 6th December, 1913).

অনেকে আবার একথাও বলেন যে বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশে রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত তার কারণ তার ভাষার দুর্বলতা। কথাটা আমার মনে হয় না সত্য। ভাষা নয়, তাঁর ভাবই তাঁকে ভুলবার কারণ। তাঁরা যে ভাবে ভাবিত, যে রসে উজ্জীবিত—সে ভাব এ যুগের নয়, সে রস এখন শুষ্ক।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের যে সুকুমার সূক্ষ্ম বর্ণচ্ছটা, আজকের উদ্দামতার যুগে সে কি করে স্থান পাবে? পাশ্চাত্য দেশের দ্রুতগমনশীল, চিন্তাহীন, উগ্র জীবনযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কোনো যোগ নেই। ভাবের যোগ সূত্র ছিন্ন হয়েছে, তাঁকে ভোলবার (যদি ভুলে থাকে) সেই কারণ।

কল্যাণীয়েষু,

বিধাতা আমাকে কাজের বার করে সৃষ্টি করেছেন তারপরে তিনি আমাকে কাজের ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিয়েচেন। চিরদিন বিধাতার এই রকম রঙ্গ।

মানুষকে বিধাতা নিরস্ত্র করে জন্ম দিয়েচেন আবার তাকেই নখী দন্তী শৃঙ্গীদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েচেন। যাই হোক যারা কেজো লোক তারা মনের সুখে আপিসে আদালতে দশটা-পাঁচটায় কাজ করচে তারপরে ট্রামে করে বাড়ি এসে আহারান্তে বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্চে— আমি জন্ম-অকেজো অথচ আমার কাজের বিরাম নেই। বিধাতার এই

কৌতুকের মধ্যে পড়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। আমার বয়সও প্রায় ষাট হয়ে এল—এখন পিতামহ কবে যে তাঁর উপহাসের পালা শেষ করবেন আমি তাই ভাবচি। অথচ এদিকে ঠিক আমার চোখের সামনেই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের প্রান্তেই তালবন, সমস্তদিন সেখানে ক্রীড়ারত আলো ছায়ার অপর্যাপ্ত কুঁড়েমি আমাকে ব্যাকুল করে তুলচে—বলচে ইস্কুল পালাও। ইস্কুল পালাও। খেটে খেটে সময় নষ্ট কোরো না। আমার প্রতি বিধাতার এই ব্যবহার স্মরণ করে বুঝতে পারবেন কেন পারতপক্ষে আমি চিঠিপত্র লিখিনে। কেন না আমার পক্ষে এখন পারৎপক্ষ এবং অপারৎপক্ষ প্রায় সমান হয়ে এসেচে।

যাক নালিশ এখন বন্ধ করি।

আপনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ম্যাকমিলনকে দিয়ে প্রকাশ করচেন শুনে খুব খুসি হলুম। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যদি কিছু বক্তৃতা দিতে পারেন সেও খুব ভালো হবে। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে বক্তৃতা দিলে সেখানকার লোকের হৃদ্য হবে। সেখানে যারা বিশেষজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা একজাতের লোক এবং যাঁরা সত্য জানতে উৎসুক অথচ তার তপস্যা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি তাঁরা একজাতের। এই উভয় দলকে একই উপায়ে খুসি করা সম্ভব নয়। সেই অনুসারে ক্ষেত্র বুঝে কাজ করবেন। কিছুদিন সেখানে থাকলেই এবং সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিশলেই আপনি সব অবগত হবেন। যা হোক আপনার পন্থা শিব এবং আপনার যাত্রা সফল হোক এই কামনা করি।

ইতি—২ মাঘ ১৩২৬
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Hotel Regina
Gloucester Road,
April 8, 1921

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই—তার প্রমাণ এই যে সেই দিনই আমি Rhy's এবং Rothenstein-কে তোমার কথা বলেচি এবং তাঁরা দুজনেই তোমার সঙ্গে তোমার লেখা সম্বন্ধে

আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়েছেন। যদি এখানে উপস্থিত থাকতে তাহলে অচিরেই তোমার কাজ আরম্ভ হতে পারত।

এখানকার India Society থেকে তোমার লেখা বই গ্রাহ্য হতে পারে যদি সেখানকার ওস্তাদদের পছন্দ হয়। রোটেনষ্টাইন উক্ত সভার মুরুব্বি, ঐখান থেকেই আমার গীতাঞ্জলি এখন প্রচারিত হয়। আমাদের সুইডেন যাত্রা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গেল। ইতি—শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে ঠিক কোন বই লেখার উল্লেখ আছে তা বলতে পারব না তবে এরই কাছাকাছি সময়ে সুরেন্দ্রনাথের বিশ্ববিশ্রুত বই History of Indian Philosophy লেখা হয়। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা করতেন। লাটসাহেব এসেছিলেন কলেজ পরিদর্শনে সঙ্গে আছেন বাঙালী কমিশনার কে সি দে। তখনকার আই সি এস-রা দুর্দান্ত কর্মচারী হলেও অনেকেই শাস্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন অনেকে সাহিত্যিক ছিলেন। উচ্চপদের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ইনি তরুণ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। সেদিন অধ্যাপনারত সুরেন্দ্রনাথকে লাটসাহেব অনেক উচ্চ থেকে ঈষৎ কৃপা মিশ্রিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি শুধু মাষ্টারী করছেন না লেখা-পড়াও করছেন। সুরেন্দ্রনাথের অভিমান আহত হল—সম্ভবত মনে কোনো কল্পনা যাতায়াত করছিল। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখব ভাবছি। “ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ?” লাট সাহেব এই তরুণ অধ্যাপকের উক্তিতে অট্টহাস্য করলেন। তখন K. C. De এগিয়ে এসে বললেন প্রফেসর দাশগুপ্ত যা বলেন তা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলতেন কে সি দের ঐ কথাটি তাঁর জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। তিনি স্থির করলেন যে করে হোক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখতে হবে। একজন মফস্বল কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে সে সংকল্প সহজ ছিল না। কোথায় বই, কোথায় পুঁথি-সংগ্রহ কেই বা সাহায্য করে, চট্টগ্রামের লাইব্রেরী কতটুকুই বা! যা হোক শেষ পর্যন্ত তিনি সফলকাম হলেন, Cambridge University Press থেকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ১৯২২ সালে প্রকাশিত হল।

১৯২১ থেকে ১৯২২ তিনি কেম্ব্রিজে পড়েন ও পড়ান। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথও ইয়োরোপে ছিলেন। হোটেল রেজিনাতে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎও

করেছিলেন। উপরের চিঠি থেকে বোঝা যায় বিদেশে পরিচিতির জন্য রবীন্দ্রনাথের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কত মানুষকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করতে তিনি সহায়তা করেছিলেন তা তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা না বললে কোনো দিনও জানা যাবে না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিকট মণ্ডলীর কেউ ছিলেন না। বস্তুত যে আবহাওয়া, পরিবেশে তিনি মানুষ তা সম্পূর্ণ অন্য। তাঁদের চরিত্রগত পার্থক্য তো বিপুল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে প্রতিভার যে লক্ষণগুলি দেখেছিলেন তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সানন্দে। আর কাছের মানুষদের জন্য যে তিনি সর্বদা কি রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তা আমরা কিছু কিছু জানি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ যখন হোটেল রেজিনাতে থাকতেন তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সেই সময়ে বিশ্বভারতীর কল্পনা তাঁর মনে যাওয়া আসা করছিল, দুজন বুদ্ধিমান বিদ্যোৎসাহী তরুণকে পেয়ে তিনি সে কথা সবিস্তারে বলতেন। নির্মল সিদ্ধান্ত আমাকে বলেছেন 'আমরা কবির সে সব কথা কবির খেয়াল বা কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতাম। আমরা এসেছি ইয়োরোপে বিদ্যা শিক্ষা করতে আমাদের ভারতীয় বিদ্যাতেও ইয়োরোপের কাছে আমরা পাঠ নিই। কিন্তু ইয়োরোপের পণ্ডিতরা সেই বোলপুরের গণ্ডগ্রামে গরুর গাড়ি চড়ে মাটির ঘরে বসে আমাদের কাছ থেকে পাঠ নিতে আসবেন এ কথা ভাবাই শক্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু কেবল ইয়োরোপীয় দর্শন পাঠ করতে আসেন নি। তিনি ভারতীয় দর্শন প্রচার করতে চান সেজন্যও তাঁর ইয়োরোপের সংযোগ প্রয়োজন ছিল।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

তোমার বইখানি পেয়েই পড়তে শুরু করে দিয়েচি। এর সমালোচনা করবার অধিকার আমার নেই, কিন্তু একথা বলবার অধিকার আছে যে খুব ভালো লাগচে। তোমাদের মত লোক য়ুরোপের মাঝখানে বসে কাজ করচ এতে আমি যে কত আনন্দ বোধ করচি সে আমি বলতে পারিনে। পশ্চিমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত বড় হবে না, পশ্চিমের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েও

ভারতের কল্যাণ হবে না—পশ্চিমের সঙ্গে সেতু বন্ধন করে তবে সে পূর্ণতা লাভ করবে। তোমার মত মানুষ সেই সেতু। তোমরাই পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার সামঞ্জস্য সাধন করতে পারবে আমি মনে করি, তুমি যদি অবকাশ পাও এবং য়ুরোপ মহাদেশের ভিতরে গিয়ে কিছুকাল কাজ কর তাহলে অনেক বেশি লাভ হবে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তার একটা কারণ য়ুরোপ মহাদেশের লোকের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের কোনো বিকৃতি নেই। আর একটা কারণ ভারতবর্ষের বিষয়ে তারা দ্বৈপায়ন ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি জানে। কিছুকাল ধরে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে তোমার বাস করা নিতান্ত দরকার। তোমার মধ্য দিয়ে য়ুরোপে ভারতবর্ষ প্রকাশিত হোক এই আমি কামনা করি।

ইতি ২৮ চৈত্র ১৩২৮

অনুরক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের জন্য উৎসুক হয়ে রইলুম।

আমার পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের সামান্য বর্ণনা লেখা হল। এই পরিচয় আরো দীর্ঘদিন ধরে পর্বে পর্বে বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। মাঝখানে আমি এসে পড়ার পরে সেই ইতিহাস আমার জীবন বিকাশের সঙ্গে জড়িত তাই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরবর্তী চিঠিগুলি আমার নিজের কথার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াই সঙ্গত এবং আমার পক্ষে সুবিধার।

এর আগে আমি কয়েকটি বইতে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছি কিন্তু সেখানে যথাসাধ্য আমি নিজে অনুপস্থিত থাকতে চেষ্টা করেছি। "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" আমার সংসারের পরিবেশের বই হলেও সেখানে আমার নিজের মন, অনুভূতি ও ভাবনা সবই অনেকটা প্রচ্ছন্ন রেখেছি—সম্ভবত সেই কারণেই ঐ বইটি পাঠক-সমাজে আদৃত হয়েছে। সেই বয়সে তাই উপযুক্ত ছিল, কিন্তু আজ এখানে যে ইতিহাস লিখতে বসেছি তা কতকটা আমার নিজেরই কথা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি নিয়ে, আমার নিজের জীবনকেই আমি পিছন ফিরে দেখব এই আমার অভিপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথ 'রবি' নাম নিয়ে অনেক কৌতুক করেছেন। সূর্যকে বলতেন আকাশের 'মিতা', আবার নামের এই সাদৃশ্যের উপমা দিয়ে কয়েকটি সুন্দর কবিতাও আছে তার মধ্যে একটি অপূর্ব কবিতা—"হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?" মনে হত যেন আমারি কথা বলছে।

আমার এই রচনায় সেদিনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ উদ্ঘাটিত করার ক্ষমতা আমার নেই—স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে এসেছে—

মহাকালের হস্তক্ষেপে বারবার ধুয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে কত বর্ণাঢ্য দিন। যদি সেই স্বর্ণখচিত দিনগুলির পূর্ণ প্রকাশ করবার শক্তি আমার থাকত তাহলে একথা স্পষ্ট হত যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি প্রভাতে দুটি সূর্য উদিত হতেন ; একজন সেই বরেণ্য সবিতৃ যিনি তাঁর রশ্মির সহস্র হিরণ্যপাণি দিয়ে আমাদের শরীরকে পুষ্ট করছেন, আর একজন যাঁর চিন্তার আলো একটু একটু করে আমার প্রাণে মনে অন্তরাত্মায় প্রবিষ্ট হয়ে সুখে-দুঃখে বসবৈচিত্র্যের বিচিত্র মূর্চ্ছনায় হৃদয় পুষ্পের এক একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়েছে—বিকাশ করেছে আমার ক্ষুদ্র মনের প্রচ্ছন্ন স্বরূপকে।

একথা আরো অনেকের পক্ষেই সত্য। প্রধানত তাঁদের জন্যই আমার এ রচনা।

মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই কেবলমাত্র গুণের আধার নন, কিছু ত্রুটিও তাঁর ছিল। অল্প বয়স থেকে যেমন গুণের কথা তেমনি তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও যথেষ্ট শুনেছি। কিন্তু যে কারণেই হোক আমার মনের উপর তা কোনো প্রভাব ফেলে নি। আমার যথেষ্ট লেখবার শখ, লেখক হবার সাধ সত্ত্বেও আমি কোনো দিন স্বকীয়ত্বের অভিলাষ করি নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ল কিনা তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা কখনো আমার ছিল না। রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রবেশ পথও আমি খুঁজিনি—চিরদিন আমার সমস্ত প্রয়াসে, প্রযত্নে, চিন্তায়, মননে—আমি তাঁর ছায়েবানুগতা।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কবিতার বইয়ের ভূমিকায় সম্প্রতিকালে আমি 'আধুনিক' কবিতা ও আমার শিল্পের সমস্যার কথা যা লিখেছি তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"...কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক আজকালকার মত কবিতার স্থাপত্যে এমন প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাদেশে আর কোনো যুগে ঘটেছে কিনা জানি না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথই এর মূল কারণ। ওই রকম আকাশস্পর্শী কালান্তরব্যাপী প্রতিভার পাশে পাশে স্বকীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জীবন সংগ্রামই এর ভিতরের অব্যক্ত কারণ। তাঁর থেকে ভাষা ও ভঙ্গীতে চেষ্টাকৃতভাবেই অনেক দূরে সরে যাওয়াই জীবনধর্মের অভিব্যক্তি। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের মধ্যে বুদ্বুদের স্থায়ীত্বের আকাঙ্ক্ষার মতই জীবন লিপ্সা।

আমার নিজের পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা ছিল বিপরীত—আমার কবিতা নয়, আমার কাব্যজীবনকে বাঁচাতে হলে, অর্থাৎ কবিতার স্বকীয়তা হোক বা না হোক কবিতার আনন্দকে রক্ষা করতে হলে চিন্তায়, মননে, ধ্যানে, জ্ঞানে, তাঁর থেকে দূরে যাবার কোনো উপায় ছিল না। আমার মনের সমস্ত কল্পনা ও আবেগ সেই 'আদিত্যবর্ণ পুরুষম মহান্তম'কে কেন্দ্র করে আপনার কক্ষপথ তৈরী করে নিয়েছিল, কোনো প্রয়োজনই তাকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

আমার বর্তমানের কাজ 'খেলাঘর'-ও তাঁরই ব্রতের অনুসরণ। জীবনে বার বার নিজের কাছে নিজের হার হয়েছে। যা হতে চেয়েছি, পারি নি। আমার স্বভাবের দৈন্য বহু সময়ে অন্যকে পীড়িত করেছে। আমার মধ্যে যা কিছু গ্লানিকর, যা কিছু পরুষ ও রুক্ষ—সে আমার নিজস্ব। কিন্তু যখনই এই দীনতা থেকে 'অক্ষয় ধনে'র আস্বাদ পেয়েছি, রুক্ষ থেকে শ্যামলে, ধূসর থেকে বর্ণবৈচিত্র্যে পৌঁছতে পেরেছি—সে মুহূর্তে আলোর প্রসাদে হৃদয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে সে পূর্ণতা আমার গুরুর দান—যেখানে আমি পূর্ণ সেখানেই তাঁর চরণ স্পর্শ।

একথা আমি পূর্বেও নানা স্থানে লিখেছি। আবারও পুনরুক্তি করছি যে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি দৃষ্টিগোচর রূপ ছিল, তা যে শুধু কাব্যে-গানে-চিত্রে উৎকীর্ণ হত তা নয়। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিনের কথা মনে পড়লেই তা বুঝতে পারি। ১৯২৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি আপার সারকুলার রোডে মামাবাড়িতে। কাছেই রামমোহন লাইব্রেরী। তখন ঐ সভাগৃহটি কলকাতার অভিজাত সভাসমিতির কেন্দ্র। আজকের ঐ ঘরের অবস্থা দেখলে তা বোঝা যাবে না। বাড়িতে একদিন সোরগোল পড়ে গেল রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ আসছেন। দিদিমা, মা, মাসীরা সবাই চলেছেন সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখতে। সঙ্গে ন' বছর বয়সের আমিও। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নাম বহুশ্রুত হলেও এবং তাঁকে আমি দার্জিলিং-এ মামাবাড়িতে দেখে থাকলেও তার কোনো স্মৃতি আমার ছিল না। তাই বলতে গেলে সেই আমার প্রথম রবীন্দ্র সন্দর্শন।

রামমোহন লাইব্রেরীতে একেবারে প্রথমদিকেই বসেছিলাম আমরা। প্রথমে দিলীপ রায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর মাথায় একটা বিবেকানন্দী পাগড়ি ছিল। তিনি টেবিলে হারমনিয়াম

রেখে গান করলেন—'যেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান ওড়ে না আর'। দিলীপ রায় তখন তরুণ যুবক, গৌরবর্ণ সুন্দর চেহারা, মধুর গলার স্বর ও বিশিষ্ট তাঁর গায়কী ঢঙ। তিনি ঘাড় তুলে তুলে গাইছিলেন। 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির—।" সকলেরই তাঁর গান ভাল লেগেছিল। একটু পরে রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন সভার সমস্ত মানুষ স্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধ, গেরুয়া রংঙের জোব্বা। শাদা কালো মেশানো চুল, কিন্তু সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে কি এক মহিমা উদ্ভাসিত। অনেকক্ষণ তিনি বলেছিলেন, কি বলেছিলেন তা আমার মনে থাকা সম্ভব তো নয়ই, বুঝতেও পারি নি—কিন্তু তাঁকে দেখতে দেখতে একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার শিশুমন ব্যাকুল হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না কি কারণে আমার বুকের মধ্যে এই অনুভূতি যা কষ্টের মত অথচ কষ্ট নয় তা ধূপের ধোঁয়ার মত ঘুরে ঘুরে উধ্বর্মুখী। সেদিনের অভিজ্ঞতা পরে আমি আর একটি দিনের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি। চট্টগ্রামে আমাদেব বাড়ির সামনে ছিল ব্রাহ্ম সমাজ সেখানে এবং ব্রাহ্মদেরই উৎসাহে পরিচালিত খাস্তগীর গার্লস্কুল। এ দুটি জায়গাতেই মেয়েদের গান বা আবৃত্তি করার সুযোগ ঘটত বছরে দু একবার, ব্রাহ্ম সমাজে বালক-বালিকা উৎসবে কবিতা আবৃত্তি করা আমার প্রথম public appearance-এর স্মৃতি, কবিতা মুখস্থ করাতেন মা, আমার মনে আছে একদিন পণরক্ষা কবিতাটি পড়ছিলেন—অত অল্প বয়সে (৬/৭) ঐ ঐতিহাসিক কবিতাটির মর্ম কি বুঝেছিলাম জানি না তবে হঠাৎ ঐ লাইন দুটি—'বেলা বয়ে যায় ধূ ধূ করে মাঠ—দূরে দূরে চরে ধেনু। অতি দূর হতে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু'- মার গলায় কি এক অশ্রুভরা বেদনা নিয়ে এসেছিল, আমার বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে চোখে জল ভরে এল, সেই আমার প্রথম সুখগর্ভ দুঃখের অনুভব। রামমোহন লাইব্রেরীতে মঞ্চের উপর জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে সেই বালিকার সেদিন যে অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা কেবল গানেই চলে— "পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা, দুঃখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।"

১৯২৪ সালে আমরা বরাবরের মত কলকাতায় চলে আসি, সেইবার রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা যান, বিদায় অভিনন্দন দিতে আমার পিতা একটি কবিতা লিখে তার চারপাশে ছবি আঁকিয়ে বাঁধিয়ে স্টেশনে নিয়ে যান। তখনকার দিনে এই রকমই রীতি ছিল। এইসব যখন চলছিল তখন কবি আমার পিতাকে এক খণ্ড 'রক্তকরবী' সই করে পাঠিয়ে ছিলেন।

চট্টগ্রামে থাকতেও রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতাম—কলকাতায় আসবার পর তিনি যেন আমাদের বাড়িতে সর্বদা উপস্থিত।

আজ পুরোনো কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে অতীতে ডুব দিয়ে বুঝতে পারছি রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম জেনেছি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে নয়—দিনের পর দিন কোনো দূর অজ্ঞাত জগৎ থেকে তাঁর উপস্থিতি আমার প্রতি-দিনের জগতের আবরণ ভেদ করে কুয়াশার রন্ধ্রপথে উচ্ছ্বসিত সূর্যরশ্মির মত আমার অস্ফুট বালিকা মনকে স্পর্শ করে তাকে উল্লসিত করত। কেন? তার কারণ আমার জানা নেই।

১৯২৫-২৬ সালে আমার পিতা এমেরিকাতে নিমন্ত্রণ পেলেন। ওখানে তখন ভারতীয়রা স্যুট পরলে নিগ্রো ভ্রমে লাঞ্ছিত হত। পাগ্‌ড়িটা থাকলে রাজা, ফকির, সাপুড়ে, হিন্দু বা সাধু বলে চলে যায়। তাহলে আর ঘৃণা করে না, তাড়াতাড়ি ভাগ্য গণনা করতে হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই এমেরিকা যাবার আগে আমার পিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে পোশাক সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন। একখানা জোব্বা ও বক্কু (তিব্বতী জামা) চলে এল। সেই পোশাক দেখতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ভিড় করে এলেন। রবীন্দ্রনাথকে ভালোমত দেখবার আগে তাঁর পোশাক নেড়ে চেড়ে দেখলুম যেমন আশ্চর্য মানুষ তেমন আশ্চর্য পোশাক! ঐ পোশাক পারস্যের সম্রাট থেকে বাংলা দেশের বাউল পর্যন্ত সকলের অঙ্গে শোভা পেয়েছে।

ঐ পোশাক পরে রবীন্দ্রনাথ কখনো শাজাহান কখনো লালন ফকির।

যাহোক আমার পিতা বললেন এ পোশাক লম্বা মানুষকে মানায়। আমি যথেষ্ট লম্বা নই। এই সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কলকাতার বাড়িতে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন, সেই সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় এলেন। সেদিন আমার মা পঞ্চব্যঞ্জন নয়, পঞ্চাশটি ব্যঞ্জন রেঁধেছিলেন। আসনে বসিয়ে থালা বাটি সাজিয়ে একটি একটি করে বাটি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। সেদিন কি কি কথাবার্তা হয়েছিল স্মরণ নেই এবং সেদিনকার ঘটনার পাত্র-পাত্রী এক অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আজ আর কেউ জীবিত নেই যে আমাকে বলতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে মাঝে মাঝে নিরামিষাশী হতেন। সে সময়ে অবশ্য আমিষ খেতেন। আমার বাবার ধারণা ছিল উনি মৃগমাংস খেতে ভালবাসেন—এ ধারণার কারণ কি জানি না। যা হোক চেষ্টা করেই

তা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কবি একটু মুখে দিয়েই বল্লেন "এ কি, এযে ভেনিসন্।"

সেদিন আমার কোনো বিশেষ পরিচয় ছিল না। তখনও আমার মধ্যে আমার পিতামাতা সদ্যোত্তিন্ন কবিকে দেখেন নি। তাই কোনো রকম পরীক্ষা আমাকে দিতে হয়নি। এমন কি আবৃত্তি করেও গুণগরিমার পরিচয় দিতে হয়নি। আমি একটু দূর থেকে সেই বিরাট মানুষকে দেখছিলাম। তাঁর কথা, হাস্য-পরিহাস, বাচনভঙ্গী ও শরীর লাবণ্য সব মিলিয়ে যেন পরিচিত জগতের বাইরের নূতন ভুবনে উদিত কোনো নূতন বিবস্বানের আলো এসে পড়েছিল, তাকে ধারণ করবার, বুঝবার এমন কি স্মরণ করে রাখবার মতন বুদ্ধি, মন তখন তৈরী হয়নি। সেই অপক্ব অপরিচিত মনের বিস্ময়টির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল যখন বহুদিন পর ১৯৭১ সালে রেফিউজি ক্যাম্পে একজন এমেরিকান পাদ্রী আমায় তাঁর কন্যার গল্পটি বলেন। পাদ্রী ভদ্রলোকের নামটি স্মরণ হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন ১৯২৬ সালে কি ঐ রকম কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ যখন এমেরিকা যান তখন তাঁদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। ঘরভর্তি লোক। চায়ের আসরে তাঁর বছর পাঁচেকের কন্যা দৌড়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারপর মুখ তুলে দেখে আবার দৌড়ে ফিরে এসে বাপের কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল—"Father, I have seen God."

ঐ বালিকা রবীন্দ্রনাথের গুণের কথা কিছুই জানত না। তাই আবারও বলছি যেমন তাঁর কাব্য, ছবি ও গান একটি অনির্বচনীয় শিল্পসত্তাকে ব্যক্ত করে পাঠককে স্পর্শ করে তেমনি তাঁর উপস্থিতি, শরীরী সত্তা, বাচনভঙ্গী সবই দর্শককে এক গভীরতম রূপের পরিচয় দিত যা কেবল আকৃতিতেই নেই। সৃষ্টিকর্তা তাঁর এই বিশেষ রূপটি ক্ষণস্থায়ী করেছেন তাই অনেকে তা দেখতে পেল না।—"অসীম যাহার মূল্য সে ছবি সামান্য পটে আঁকি, মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি—"

১৯২৬ সালে আমার একটি ভাই জন্মায় আর সেই দিনই আমি প্রথম কবিতা লিখে আমার মাকে চমৎকৃত করে দিই। কবিতাটি যে কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট ছিল এ ধারণা আমার নেই—স্নেহই তার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছিল ফলে কবিতার বন্যা বইতে লাগল। আমার পিতা তখন এমেরিকা ছিলেন—ফিরে এলে মা তাঁকে আমার লেখা কবিতার খাতাটি উপহার দিলেন। মা প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে কপি করেছিলেন। আমার

কবিতা লেখায় তাঁদের এত উৎসাহ ছিল যে মা মাথার কাছে খাতা পেনসিল নিয়ে শুতেন যাতে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে কবিতার লাইন মনে এলে লিখে নিতে পারেন। উৎসাহ পেয়ে ঘুম প্রায়ই ভাঙত।

বাবা মনোযোগ দিয়ে বালিকার কবিতার খাতাটি শেষ করলেন তারপর বললেন, এ মেয়ে কবি ঠিকই তবে ছন্দে তো অনেক ত্রুটি আছে। ওকে একবার রবিবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা তখন রিচি রোডে একটা দোতলা বাড়িতে থাকতাম। রাস্তা থেকে একটা ছোট গলি পথ পার হয়ে বাড়ির হাতায় পৌঁছতে হয়। সেই গলির একপাশে একটি শিশু ছাতিম গাছ ঐ বাড়ির একমাত্র উদ্যান সম্পদ। সেদিন বাবা বললেন—ওকে শান্তিনিকেতনেই নিয়ে যাব ভাবছি। খাটের উপর চওড়া ঢালা বিছানার একপাশে শুয়ে কথাটা আমার কানে এল। আশা ও আগ্রহে আমার মনের ভিতরটা তখন ঠিক কি রকম স্পন্দিত হয়েছিল আজ এই খাতা নিয়ে বসে দুদিন ধরে ভাবছি কিন্তু সেই আস্বাদটা ফিরে আসছে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে আমার ধারণা ছিল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ছাতিম গাছের কী একটা সম্পর্ক আছে। আমি আমাদের বাড়ির গলির সেই ছোট ছাতিম গাছটি দেখেছিলাম যার সংস্কৃত নাম বাবা বলেছিলেন সপ্তপর্ণ। শান্তিনিকেতনের শূন্য ও রুক্ষ প্রান্তর ও খোয়াই-এর দৃশ্য আমার কল্পনাতে ছিল না। রাঙামাটির দেশ আমি আগে কখনো দেখি নি। শান্তিনিকেতনের সেই অদেখা ছাতিমগাছের তাৎপর্য যে কী তাও জানতাম না শুধু আমার সুখের নিঃশ্বাসে ভরে ঐ ছোট ছাতিম গাছটা ডালপালা মেলে অজ্ঞাত পুষ্প বিকাশ করে শান্তিনিকেতনের যে ছবিটা আমায় দেখাচ্ছিল সে আমার মনে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। যা হোক ঐ ছাতিম গাছটা একটা প্রতীক হযে গেল—ঐ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে নানা রকম অবিশ্বাস্য কথাবার্তা বলা এক রকম খেলা হয়েছিল আমার। সে সব একটা কবিতায় লিখেছিলাম। সেই কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি আছে—সেজন্যই এত কথা লিখলাম।

আমাদের শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা একটা কথার কথা, অত সহজে কি হয়। বাবা আমাকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখালেন সেই চিঠির বিষয় বস্তু কি মনে নেই—শুধু মনে আছে—চিঠি পোস্ট করবার দুদিনের মধ্যে উত্তর এল। পোস্টকার্ডে ছোট দু-তিন লাইন চিঠি। কি আশ্চর্য। বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে সত্য সত্যই একটা চিঠি পেয়ে গেলাম।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে বসন্ত উৎসবের আয়োজনে যেমন ব্যস্ত তেমনি ক্লান্ত। একটু ছুটি পেলে ও শক্তি পেলে তোমার চিঠির উত্তর দেবার চেষ্টা করব। ইতি ১ চৈত্র ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর কয়েকদিন পরই কলকাতায় এলেন, বাবার কাছে একটা পোস্টকার্ড এলো।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই বই কি। রবি ও মঙ্গলবারে আমার কিছু কিছু ছুটি আছে, সন্ধ্যাটি বাদ দিয়ে এসো।

ইতি বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিন স্থির হল, আমরা পিতাপুত্রী দেখা করতে যাব। কি মহাসৌভাগ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা হবে—নাইবা হল শান্তিনিকেতন—জোড়াসাঁকোর বাড়িও তো কম ব্যাপার নয়—সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে বাড়ির কীর্তি ঘোষিত, সে যেন রূপকথার রাজ্য। যেদিন ভোরবেলা যাবার কথা তার আগের দিন পর্যন্ত কোথাও কিছু নেই হঠাৎ শেষরাতে জ্বর এসে গেল। সামান্য জ্বর নয়—সাংঘাতিক জ্বর তাকে কোনো মতেই চাপা দেওয়া গেল না। আমার ক্ষুদ্র জীবনে সেই প্রথম হতাশা ও দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা হল, বাবা একাই গেলেন।

পরের দিনের অভিজ্ঞতা আরো করুণ, প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আছি হঠাৎ কানে এল কে বলছে—"রবিবাবু এসেছেন"—। আমি চমকে উঠলাম, মা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন একটু পরেই ফিরে এসে বললেন "তাই কি হয়! নবদ্বীপবাবু এসেছেন"—হায় রে হায় কোথায় বা রবীন্দ্রনাথ কোথায় বা নবদ্বীপ সাহা এরকম ভুলও হয়!

অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটেছিল, বিনা সংবাদে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আমাদের বাড়ি এসেছিলেন কিন্তু সে অনেক পরে।

সেবার রবীন্দ্রনাথের দেখা পেলুম না—তিনি যবদ্বীপ চলে গেলেন। আমি রোগশয্যায় একটা ম্যাপ বিছিয়ে কলকাতা থেকে যবদ্বীপের দূরত্ব দেখতে লাগলাম—আর আমার বুকের ভেতর গুরু গুরু করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, রবীন্দ্রনাথকে দেখবার ইচ্ছাটা কেন যে এত দুর্বহ হল কেনই বা সেটা দুঃখে রূপান্তরিত হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পূজোর ছুটিতে আমরা কার্সিয়াং গেলাম, আমার যে নবজাত ভাইটি আমায় কবিতার প্রেরণা দিয়েছিল সে তখন দারুণ অসুস্থ, ছয়মাসের শিশু। তারই আরোগ্যের জন্য পাহাড়ে যাওয়া। চারিদিকে প্রকৃতির আলিঙ্গন, পাইন ও বাতাসের খেলা দেখছি—আমাদের ৮ নং মণ্টিভিয়েট বাড়ি একেবারে রাস্তার উপরে, নিচে ঢালু উপত্যকা নেমে গেছে। সামনে একটু উঁচুতে একটা চার্চ। সেখানে বারবার ঘণ্টা বাজে, দলে দলে নরনারী, সাহেব মেম প্রার্থনা করতে যায়—আমিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এক পাশে বসে, থাকি। গীর্জার ভিতরে কি স্নিগ্ধতা, বলতে গেলে কার্সিয়াং-এ যে কী সুন্দর পরিবেশে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি কলকাতার সেই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে, তাই বাবা ভাবছেন কন্যা এবারে অনেক কবিতা লিখবে। এবং মাঝে মাঝেই সম্ভবত আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করছেন, ফলে আমার কবিতা যা লেখা হচ্ছে সবই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, পিতাপুত্রীর এই খেলার মধ্যে বাবা রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখলেন—সে চিঠিতে কি ছিল তা উত্তরেই কতকটা বোঝা যাবে।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে তোমার ব্যবসায়, আমি কবি, আমার সমস্ত পুঁজিপাটী ঐ বন্ধনতত্ত্বের মধ্যেই আটকে আছে। তোমার কন্যার বন্ধন এড়াবার শক্তি যে আমার নেই একথা তুমি জানলে কি করে? তোমার দৌত্য নিয়ে সে যদি আসে তাহলে হয় তো আমাকে হার মানতে হবে। কিন্তু আমি যদি তাকে আমার দলে টানি এবং তোমাদের ওপারের দূতীটিকে

নবদ্বীপবাবু আমার বাবার অনুগত ভক্ত চট্টগ্রামবাসী বণিক।

ভালোই হয়েছে কারণ সেইজন্যেই
তোমার চিঠিখানি পেলুম। চিঠির
মধ্যে হাসিম সাহেবের যে কবিতাটি
লিখেছ সেটি সুন্দর হয়েছে — ঐ
হাসিমে ভাবী কালে যে ফুলের
মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর
মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্ছি।
কাব্য সরস্বতী তাঁর নৈবেদ্যের জন্যে
এখন থেকেই তোমাকে বায়না দিয়ে রেখেচেন
সেইটতে আর সন্দেহ থাকচে না —

আমি পূজায় নিজে উপস্থিত
থাকব কি না বলতে পারিনে —
কিন্তু একটা আবশ্যক এই যে আমরা
যে ডালি সাজিয়ে পেলুম তারি
মধ্যে তোমার নব বিকশিত ফুলগুলি
এসে মিশবে।

তোমাদের রবীন্দ্র পরিষদের
যে রবীন্দ্রকে তোমরা আহ্বান করেচো
সে তো অশরীরী রবীন্দ্র — বাণী
তার বাহন, — আর এই দেহধারী

আমাদের এপারের অকাজ-খানায় বন্দী করে রাখি ? এ তর্ক এখন থাক, যথাসময়ে আলোচনা হবে—আপাতত তোমরা দর্শন দিয়ে যেয়ো।

রক্তকরবী অভিনয়ের আয়োজন করচি—তাছাড়া একটা উপন্যাস রবির বাহন অরুণেরই মতো অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ না করে আমার নিষ্কৃতি নেই। মৈত্রেয়ীকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—২২শে কার্তিক ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা বললেন—দূতী তো নৌকায় পাল টাঙিয়ে বসে আছে, একবার নোঙর খুলে দিলেই হয়।

রক্তকরবী অভিনয় করবার জন্য চেষ্টা করেছেন কবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি, আমাকে একবার বলেছিলেন "সাহস পেলুম না।" উপরের উল্লেখিত উপন্যাস 'যোগাযোগ'—ওটি অবশ্য কোনোদিনও শেষ হল না। বাবার চিঠিটা যবদ্বীপের একটি পিকচার পোস্টকার্ডে লেখা। তাল বনের মধ্যে একটি গ্রামের ছবি।

আমার ধারণা এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে একটি একটি করে বোঝাতে বোঝাতে বাবার হয়ত মনে হয়েছিল যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে বিশেষত ছাত্রদের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র চিন্তা-ধারার আলোচনা হওয়া উচিত। উৎসাহী সমর্থন পেলেন ছাত্রদের মধ্যে। প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদের জন্ম হল। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথম সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবীর ও তার সঙ্গে সহ হয়ত ছিলেন সুশীল দে। পরের বছর আসেন প্রতুল গুপ্ত।

প্রিনসেপ ঘাটের উপর এক নিশ্চল নৌকায় অর্থাৎ জেটির দোতালায় একটি পরিচ্ছন্ন ছোট রেঁস্তরা ছিল। সেখানে ফরাসী কায়দায় যে চকোলেট জাতীয় পানীয় তৈরী হত তাকে নাকি ফরাসীরা বলে 'শকলা'। সেই পানীয় আমার অতি প্রিয় ছিল—বাবা আর আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম। সেখানে বসে শকলা খেতে খেতে কখনো বা গড়ের মাঠে হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমাকে একটি একটি করে কবিতা বোঝাতেন। বলতেন, রবীন্দ্রনাথ ভালো করে কেউ বোঝে না। ওঁর সমস্ত লেখার মধ্যে দুটি তিনটি ভাব বিচিত্র মণির মধ্যে সূত্রের মত চলে গেছে—চিন্তার মালা গাঁথা হয়েছে। উনি বলেন বটে দর্শন শাস্ত্রে, তত্ত্বকথায় ওঁর রুচি নেই কিন্তু ওঁর রীতিমত

কয়েকটি দার্শনিক মত আছে। সেগুলি যদি তুমি বুঝে নিতে পার, ওঁর সমস্ত কবিতা জলের মত সহজ, স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তা না করে খালি ভক্তি, উচ্ছ্বাস আর সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকলে চলবে? মুগ্ধ কথাটার মানে জান তো?

এ অভিযোগ আমার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত গেল না। বইয়ের সমালোচকরা বলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কোনো ক্রিটিক্যাল দৃষ্টি নেই। কেবলই ভক্তির প্রাবল্য। কথাটা অস্বীকার করতে পারছি না। ঐ "মুগ্ধ" কথাটি নিয়ে একদা রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছিলেন "পড়েছ 'মুগ্ধ-বোধ' কিন্তু এ মুগ্ধের আর বোধ হল না।"

বাবা বলেছিলেন, 'কড়ি ও কোমল'-এর দুটি কবিতা, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এবং 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' মোটামুটি পরস্পরের পরিপূরক—এই কবিতা দুটির ভাব রবীন্দ্রকাব্যের এক বিরাট অংশ ধরে পরিব্যাপ্ত। আর একটি মনন যোগ্য কবিতা 'মানসীর' উৎসর্গ পত্র। বাবার মতে এই কবিতাটিতেই রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজমের বিতর্ক সবই সামঞ্জস্য পেয়েছে। এখানে অবশ্য 'রিয়ালিজম'-এর অর্থ আমরা সাহিত্যে 'বস্তুতান্ত্রিকতা' বলে যে শব্দটি ব্যবহার করি তা নয়—সাহিত্যের বাস্তবতার কথা নয়। দর্শনের বাস্তবতার কথা। অর্থাৎ বাইরের যে বস্তুকে আমরা জানি, দেখি, রূপে-রসে, গন্ধে-বর্ণে যার অস্তিত্ব আমরা বুঝি—'আমা' হতে অতিরিক্ত অর্থাৎ আমার মন ছাড়া তার বাস্তবিক অস্তিত্ব কি? অর্থাৎ 'বিষয়' ও 'বিষয়ী'র সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক, এখানে তারই কথা বলা হচ্ছে। বাইরের বিশ্ব একা, সে সঙ্গীহারা যতক্ষণ না সে অন্তরের কামনার সঙ্গে অর্থাৎ অন্তরের বোধের সঙ্গে মিলিত হয়।

আমার যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্র-পরিষদের উদ্বোধনের দিন বাবা এ কবিতাটির অর্থ বুঝিয়েছিলেন ও আমি আবৃত্তি করেছিলাম:

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।
সুখ দুঃখ গীতিস্বর বাজিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা

বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।
বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথা ভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সে আনন্দ মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

বাইরের রূপময় জগতে নানা শক্তির বিবিধ সংগঠন চলেছে কিন্তু তার নাম নেই, পরিচয় নেই। রূপময় জগৎ মানুষের মধ্যে এসে তবেই নামময় ও ভাবময় হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ডাকঘরের রাস্তা ভুলিয়ে দিয়ে তুমি যে মোহ উৎপাদন করেছিলে তারি দুর্বিপাকে আমার চিঠিখানা মাঠে মারা গেছে—নিজের সেই অপরাধের গঞ্জনা যেন আমার উপরে বর্ষণ না করা হয়।

কিন্তু আমি তোমাকে যে রাস্তা বাৎসিয়ে দেব তার মধ্যে কোনো ভুল নেই একথা নিশ্চিত জেনো—সে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের রাস্তা। হাবড়া থেকে সোজা চলে আসতে পারবে অভ্যর্থনার ত্রুটী হবে না। বিদেশে থাকার দুঃখ হচ্ছে এই যে যারা আত্মীয় তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়া

—দেশে থেকে যদি সে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ না করি তাহলে কোন্ ত্রাণ-কর্তাকে স্মরণ করব বলে দিয়ো। আপাতত তোমার কন্যাকে স্মরণ করেছি—নিশ্চয় জানি তার হৃদয় কোমল। তার আসন বিচলিত হবে। এবং এও জানি তোমাদের বিচলিত করবার শক্তি তার যেমন আছে এমন কারো নেই।

এর মধ্যে তোমার বইখানি পেয়ে তোমার উপরে আমার ঈর্ষাবোধ হচ্ছে। কারণটা বলি—হিবার্ট লেকচারে আমি আহূত। যে বিষয়টা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, দেখেচি আগে থাকতেই তুমি সেটি হরণ করে নিয়েচ—অপহরণ বৃত্তির পূর্বরাগ একে বলা যেতে পারে—আমার জিনিসটি উৎপন্ন হবার আগে সেটিকে আত্মসাৎ করা। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের প্রতি এই রকম অত্যাচার চিরদিনই করে আসচেন—নিজস্ব বলে কোনো বিষয় আর বাকি রইল না—এই রকম উৎপীড়নে পীড়িত হয়েই মানুষ পরস্ব হরণ করে থাকে। এ সব কথা দেখা হলে পরে আলোচনা করব। আপাতত অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, মনের মধ্যে যে অতিথিশালা অনেকদিন থেকে স্থাপিত, সম্প্রতি তাতে অনেকগুলি অতিথি এসে আশ্রয় নিয়েচেন—তারা আছেন একটা কথার কোঠায়। আদায় করচেন বিস্তর চিন্তা—কল্পনাদেবীর পাকশালে হাঁড়ি চড়ানোই আছে।

ইতি ২৮ কার্তিক ১৩৩৪

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাতিম গাছ

বাবা কার্সিয়াং থেকে কবিকে একটি চিঠি লেখেন, সে চিঠিটা কবি পান নি। তখন তিনি আমাকে দিয়ে একখানি চিঠি লেখালেন। আমি লিখলাম যে, বাবা আপনার চিঠি পাননি। আর তার মধ্যে আমার ছাতিমগাছের উপর লেখা কবিতাটাও পাঠিয়েছিলাম—নেহাৎ বালিকা বলেই পেরেছিলাম অর্থাৎ fools rush in where angels fear to tread এই আর কি!

তারপরে বাবার সঙ্গে কথোপকথন এই রকম······"রবিবাবুর চিঠিটার সঙ্গে তোর একটা কবিতা পাঠিয়ে দিস।" —"চিঠি চলে গেছে কবিতা দিয়েছি।"— "এ্যাঁ, কোন কবিতা?" —"ছাতিম গাছের কবিতা।"— "সেকি রে ছাতিম গাছের কবিতা পাঠালি কেন? এত ভালো ভালো কবিতা ছিল, 'বসন্ত'-টা পাঠালে পারতিস!" রিভলভিং বুককেসটা ঘোরাতে ঘোরাতে আমার "জন্মলীলা" কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন বাবা। "কিংবা 'কাল' বিষয়ে কবিতাটা পাঠাতে পারতিস—

কালের ঘরে হারিয়ে যাবে মুহূর্ত নিমেষ
কোন্ খানেতে শেষ আমার কোন্ খানেতে শেষ—"

বাবা মুখস্থ বলতে লাগলেন—

"রবি তখন তলিয়ে যাবে তলিয়ে যাবে চাঁদ
আলো তখন পেরিয়ে যাবে অন্ধকারের ফাঁদ—"

বাবা এখানে 'অন্ধকার' কথাটা কেটে 'তমোপুরী' কথাটা বসিয়েছিলেন। আমার বাবা আমার প্রায় সব কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর আশ্চর্য বই রবিদীপিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বলাকা'র উপরে —তাতেও তিনি আমার কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাবা, মা ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর যাঁরা আমার কবিতা মুখস্থ বলতেন তাঁদের মধ্যে আমার জ্যাঠামশায় সুশীল গুপ্ত, কাকা সুহৃদ গুপ্ত ছিলেন আত্মীয়ের মধ্যে, তাছাড়া ছিলেন "বঙ্গের মহিলা কবি"-র লেখক যোগেন্দ্র গুপ্ত, উপেন গঙ্গোপাধ্যায় ও আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র স্বর্গীয় সোমনাথ মৈত্র। শেষ জীবন পর্যন্ত এঁর অপর্যাপ্ত স্নেহ আমি পেয়েছি। এ ছাড়া আরো অনেকে পারতেন কিন্তু আমার এই অকৃতজ্ঞ মন তাঁদের নাম মনে করে শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রাখতে পারল না।

এতগুলি মানুষ আমার 'অহং'-এর বেলুনে ক্রমাগত ফুঁ দিয়েও যে তাকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে পারেন নি, আমি যে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছি তার কারণ পরবর্তী যুগের কবিরা আমার সেই বেলুনটি শত ছিদ্র করে দিয়েছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলুম আমার দ্বারা কবিতা লেখা হবে না—আমি কলম বন্ধ ক'রে ফেলেছিলাম, দু-খানা বই লিখেই।

ছাতিম গাছের কবিতায় ফিরে আসা যাক যেহেতু সেই কবিতাটা নিয়েই আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম মূল্যবান চিঠি। তাই তের চৌদ্দ বছর বয়সে লেখা সেই কবিতাটি থেকে ২/১টি লাইন তুলে দিচ্ছি এই আশ্বাসে যে কোনো সুধী পাঠক আজকের আমার সঙ্গে একে যুক্ত করবেন না :

"মন্দ বায়ু নীল আকাশের সনে
আমার কথা পড়বে না তোর মনে ?
থামবে না কি একটুখানি আলোয় পাতায় নাচ
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
এই তোমারি কুঞ্জতলে মাটির বক্ষ জুড়ে
মোদের কথা মরবে নারে ঘুরে······ ?
কোনো রাত্রে যবে
জ্যোৎস্না আলোয় আকাশ ব্যাকুল হবে
সেদিন তোমার মৃত্তিকাময়
রাখবে নারে লিখে
গাছের সাথে একটি মেয়ের
প্রেমের কথাটিকে ?

শান্তিনিকেতন

ঔঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার বাবা যদি আমার চিঠি না পেয়ে থাকেন সে তোমার বাবার দোষ। তিনি আমাকে কি একটা পাহাড়ে গোছের ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে সেই ঠিকানাতেই জবাব দিয়েছি। এখন বুঝতে পারচি তিনি আমাকে ঠকিয়েছেন। তা হোক এক রকম ভালই হয়েছে কারণ সেইজন্যেই তোমার চিঠিখানি পেলুম। চিঠির ভিতরে ছাতিম গাছের যে কবিতাটি লিখেছ সেটি সুন্দর হয়েচে—ওই ছাতিমে

ভাবী কালে যে ফুলের মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্চি।

কাব্য সরস্বতী তাঁর নৈবেদ্যের জন্যে এখন থেকেই তোমাকে বায়না দিয়ে রেখেচেন সেটাতে আর সন্দেহ থাকচে না। আমি পূজার দিনে উপস্থিত থাকব কি না বলতে পারিনে—কিন্তু একটা আনন্দ এই যে আমরা যে ডালি সাজিয়ে গেলুম তার মধ্যে তোমার নব বিকশিত ফুলগুলি এসে মিশবে।

তোমাদের রবীন্দ্র পরিষদে যে রবীন্দ্রকে তোমরা আহ্বান করেচো সেতো অশরীরী রবীন্দ্র—বাণী তার বাহন,—আর এই যে দেহধারী রবীন্দ্রনাথ এ আসন খোঁজে তোমাদেরই সংসদে—এর মেয়াদ অল্প—যে কটা দিন আছে তোমাদের একটুখানি যত্ন আদর আর ছাতিমগাছের দুটো একটা 'ফুল' উপহারে নগদ বিদায় চায়—এমন কি ঐ সম্ভবত সুচিরস্থায়ী পরিষদের রবীন্দ্রনাথের পরে তার ঈর্ষা জন্মে। অতএব বাবাকে মাকে নিয়ে শীঘ্র শান্তিনিকেতনে চলে এস, তারপরে অন্য কথা হবে।

ইতি ২৭ কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবার ও আমার চিঠি পৃথক খামে প্রায় এক সঙ্গেই হাতে এল। এর মধ্যে বাবাকে যে 'আত্মীয়' বলে উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন ও এবারে সকলে মিলে শান্তিনিকেতনে অবশ্যই যেতে হবে এটা স্থির করলেন।

এই সময় রবীন্দ্র-পরিষদ কলকাতার সাহিত্যিক মহলে একটা বিশেষ রকমের উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল—প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স ক্লাসে প্রতি পক্ষে এই সভা বসত। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে এরকম ধারাবাহিক ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ইতিপূর্বে বা পরে কখনই হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নামে এমন প্রতিষ্ঠানই কি এর পূর্বে হয়েছে? হলেও তা খ্যাতিলাভ করে নি।

প্রথম উদ্যোগেই রবীন্দ্র-পরিষদ স্থাপনের কারণরূপে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শিক্ষিত বাঙালী আজ যে ভাষা ব্যবহার করেন, তরুণ কবিরা যে ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, মধ্যবয়স্ক বাঙালী যে উচ্চ অঙ্গের চিন্তাধারায় পরস্পর ভাব বিনিময় করেন—তার প্রায় অধিকাংশই তাঁর দান

সম্প্রতি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট এই কাজ করছে।

—তাঁর এই দান আলো বাতাসের মত এত অলক্ষিতে আমরা গ্রহণ করেছি যে আমাদের চোখেই পড়ে না। কিন্তু তাঁর দান পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্যে চর্চার অপেক্ষা রাখে।'

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল থেকে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা সুরু করলেন বাবা। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে মেয়েদের পদার্পণ ঘটত না। ব্রাহ্ম প্রফেসরদের ব্রাহ্মিকা স্ত্রীরা কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে বা প্রীতি সম্মেলনে মাথায় লেস পিন এঁটে লনে ঘুরে বেড়াতেন এই পর্যন্ত। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরী যে ছেলেদের ক্লাশে বসে কবিতা শুনবে ও মাঝে মাঝে পিতার বক্তৃতার সঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ উপযুক্ত পদগুলি আবৃত্তি করবে এ-রকম ব্যাপার সে কালে অভাবনীয়। আলোচনার গুঞ্জন কিছু উঠেছিল কিন্তু আমার পিতার চরিত্রের জোরে তা মুখর হতে পারেনি।

অবশ্য আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকতাম অদৃশ্য বোরখা পরে। কারু সঙ্গে কথা বলার সাহসও ছিল না, উপায়ও ছিল না। ছেলেরা কথা বলত না বা বলার চেষ্টাও করত না। সেই কারণে ঠিক কারা যে বেশী উৎসাহ নিয়ে রবীন্দ্র-পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন তা আজ বলতে পারব না। উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে দুজনের নাম আগেই করেছি। পরের বার থেকে সম্পাদক ছিলেন প্রতুল গুপ্ত আর বিনয় ব্যানার্জী। রাধামোহন, বিভূতি, অমিয়, প্রভৃতি যে সব ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন তাঁদের দূর থেকে দেখতাম, কথাবার্তা বলার রেওয়াজ ছিল না বলে আলাপ হয় নি, সে কারণে অনেকের নাম হয়ত মনে পড়ল না—তাঁরা ক্ষমা করবেন।

রবীন্দ্র-পরিষদের সভা সুরু হত গান দিয়ে। সুশীল দে গান গাইতেন অর্গান বাজিয়ে—ফিজিক্স লেবরেটরির প্রকাণ্ড টেবিলের আড়ালে বসে সে গান শুনে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন কলকাতা সহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত কোথাও শোনা যেত না। এমন কি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' কথাটাও ব্যবহার হত না। তখন মাইক ছিল না—কিন্তু বাবার গম্ভীর কণ্ঠের উদাত্ত আলোচনায় ও উত্তরে প্রত্যুত্তরে সভা গম গম করত।

রবীন্দ্র-পরিষদে নিয়মিত আসতেন শ্রীকুমার ব্যানার্জী। মাঝে মাঝে আসতেন সুনীতিবাবু, সোমনাথ মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, বীরবলও এসেছেন। আর একজন রসিক মানুষ এবং বড়ো ভালোমানুষ ছিলেন বিশ্বপতি চৌধুরী। সুন্দর ছবি আঁকতেন তিনি, আমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরো অনেকে বক্তৃতা করেছেন কিন্তু তাঁদের নাম আমার মনে পড়ছে না। অপূর্ব চন্দ অবশ্যই মাঝে মাঝে আসতেন; প্রশান্তচন্দ্র কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিলেন মনে হয় কিন্তু তিনি কোনো দিন ভাষণ দেননি।

এই পরিষদের উদ্যোগ পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আনার কথা চলছে—তাই আমি প্রথম চিঠিতেই বাবার নির্দেশমত রবীন্দ্র-পরিষদের বর্ণনা ও আমার ছাতিমগাছের কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম।

আমাদের সেই রিচি রোডের বাড়িতেই পর পর দু খানা চিঠি পেলাম। সম্ভবত আমি তাঁকে কেবলি কলকাতায় আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলাম।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমরা ডাক দিলে আসন টলে না এত বড় স্থাবর পদার্থ আমি নই—কিন্তু অদৃষ্ট যে খাঁচা বানিয়েচেন তার শলাগুলোকে বিধাতা বধির করে গড়েচেন। মিষ্টি গলায় ওরা যে এতটুকু গলবে এমন নম্রতাও ওদের নেই। তাই বেরোবার ফাঁক পাচ্ছি নে। বহুকাল অনুপস্থিত ছিলুম—সেই দীর্ঘ সময়ের লোকসানটা অল্প সময়ের মধ্যে ঠেসে পুরিয়ে নেবার জন্য মনিব তাড়া লাগিয়েছেন। মনিব যদি বাইরেকার কেউ হতেন তাহলে ফাঁকি দিয়ে আপিস পালাতুম—কিন্তু ইনি অন্তরে বসে তাগিদ করেন এঁর শাসন এড়াবার জো নেই। খবর নিশ্চয় পেয়েছ একটা গল্প লিখতে সুরু করেছি—মাঝে দীর্ঘকাল ছেদ পড়ল আবার জোড় মেলাতে হচ্ছে। লেখা জিনিষ তো ছুতোরের কাজ নয়। অর্থাৎ শুকনো কাঠের কারবার একে বলে না। এ মালীগিরি সজীব গাছের ডালপালা নিয়ে কাজ, কাটা ডাল দীর্ঘ অনাদরে শুকিয়ে গেলে তখন মাটিতে পুঁতলেও শিকড় ছড়ায় না, কলমের জোড় লাগাতে গেলেও আর জোড়ে না, খসে পড়ে। এইজন্যে ভাঙ্গা ডালটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে তার তদ্বির করতে লেগেচি। এই যে কাজে নিযুক্ত আছি এর ফল তোমরাই ভোগ করবে—আমি তো তোমাদেরই মালঞ্চের মালাকর। তবু কিছুদিন বাদে কোনো না কোনো বিশেষ উপলক্ষে কলকাতায় যেতে বাধ্য হতে হবে—তখন মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হবে, আর তোমার ছাতিম গাছের মঞ্জরী ধরবার আগেই তার পরিচয় নেব

তোমার বাবাকে টানবার চেষ্টায় ছিলুম—তিনিও দেখি গতিশক্তি রহিত—মহম্মদ বলেছিলেন পর্বত যদি তাঁর ডাকে না আসে তিনিই পর্বতের কাছে যাবেন। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই পর্বত সেখানে উপায় কি? কলি যুগে গন্ধমাদন নড়াবার মত মহাবীর দুর্লভ—এই কারণেই মেঘদূতে দেখতে পাবে, একদিকে রামগিরি পর্ব্বত, আর একদিকে কৈলাস পর্ব্বত এর মাঝখানে মেঘের ডাক বসানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না—এখনো সেই যুগই চলচে। ইতি ২ অগ্রহায়ণ

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবাকে আর স্বতন্ত্র চিঠি লিখলুম না। যদি লিখতুম আমার অবকাশের অভাব স্বতঃই অপ্রমাণ হয়ে যেত। তোমার বাবা ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত এই জন্য কবিকেও সাবধানে চলতে হয়।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রোজ মনে করি চিঠি লিখি। লোকে বলে কবিরা স্বভাবত অহঙ্কারী। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু অহঙ্কারী মানুষের সঙ্গে কারবার করা সহজ। একটু স্তব করলেই তার মন পাওয়া যায়। গেল চিঠিতে তুমি আমার পত্র রচনার গুণ ব্যাখ্যা করেছিলে। সেটাতে কাজ হয়েচে, মন সম্পূর্ণ রাজি হয়েছে তোমাকে লিখতে। কিন্তু আমার দুষ্টগ্রহকে রাজি করানো শক্ত। কাজের অন্ত নেই। তুমি লিখেচ তোমার বাবার অনেক কাজ—বোধ হয় তিনি তোমাদের কাছে তাঁর কাজের বড়াই করে থাকেন। দেরি করে খেতে এসে, অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে, অনেক হাঁপিয়ে বিশ্বের লোককে তাড়া লাগিয়ে, ব্যস্ততায় পোষাকে বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে বোধ হয় তিনি প্রত্যয়জনক রূপে প্রমাণ করেচেন যে তিনি কাজের লোক। একটা কথা মনে রেখো কাজের লোককে কাজ কম করতে হয়। অকাজের লোকের কাজ অফুরাণ। অকাজের লোককে নিজের কাজ করতে হয় বলে তার ছুটি নেই। জলের কল হল কাজের। ঝরণার জল হল অকাজের। হাজার লোক ভিড় করে মীটিঙ করে উৎপাত করলেও জলের কলের ছুটি আছে কিন্তু

নির্জন গুহাতলে একটি মানুষ না থাকলেও ঝরণার হাঁক ছাড়বার সময় নেই। এক কথায় বলতে গেলে কাজের সীমা আছে অকাজ অসীম। আমি অকেজো হয়ে জন্মেচি বলে মরবারও অবকাশ পাইনে। সম্প্রতি একটা নাট্যালোচনা নিয়ে নাচগান কবিতার সাইক্লোন ঝড় চলচে। সেই তুফান ঠেলে একটি ছোট্ট চিঠির নৌকোকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেওয়া বড় শক্ত। মাঝে মাঝে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দাঁড় বাগিয়ে বসি এমন সময় আবার ঝড়ের দমকা এসে তরী ডাঙায় আছড়ে ফেলে। অনেক সাবধানে এই ডিঙিখানি তোমার ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি নোঙড় ফেললুম—তোমাকে খুসি করবার জন্য এটাকে নিয়ে যে খানিকটা বাচ খেলব সে সাধ্য আমার নেই। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল কলকাতায় রওনা হব।

রিচি রোডের বাড়িতেই পরপর এই দুখানি চিঠিও পেলাম এই চতুর্থ চিঠিখানি পড়ে বাবা বললেন "দেখেছ কাণ্ড, প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে একটা খোঁচা দেওয়া চাই।" চিঠির পুনশ্চতে যে লাইনটি ছিল আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে ঈপ্সিত। পরের দিন কলকাতায় আসছেন। সঙ্গে গান বাজনার রিহার্সেলের দল। ঋতুরঙ্গের উৎসব হবে। আমার পিতা বললেন টেলিফোন করে তুমিই দিন স্থির কর। টেলিফোন করলাম। ধরলেন কবি নিজে। আমি এমন চমকে গিয়েছিলাম যে, সে চমক আজো ভুলিনি। আশা করতে পারিনি যে উনি নিজেই ধরবেন। যে বড় ঘরখানিকে 'বিচিত্রা' বলা হত তার আশে পাশে অর্থাৎ এই ঘরখানিকে ঘিরে, ছোট ছোট ঘর ছিল সেগুলি বসবাসের জন্য নেহাৎ ছোট। ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে যে ঘর সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সেবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। টেলিফোনটা সেখানেই ছিল। ঘরে দেখেছিলুম আসবাব সামান্য, দেওয়ালে মৃণালিনী দেবীর প্রকাণ্ড ছবি।

টেলিফোনে সেই আমার ওঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ কথা বলা। উনি সাধারণত টেলিফোন ধরতেন না। তখন টেলিফোনে ইংরেজিতে প্রথম সম্ভাষণের রেওয়াজ ছিল। আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা বড়বাজার ৩৯৯৫ কিনা। উনিও ইংরেজিতে বললেন—"হুম ডু ইয়ু ওয়ান্ট ?"

মনে আছে তারপর বাক্যস্ফুরণ হতে অনেক দেরী হয়েছিল—কিছুতেই বলতে পারছিলাম না—হুম আই ওয়ান্ট।

সন্ধ্যেবেলা বাবা মা ও আমি জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হলাম। মা বাবা বসবার ঘরে বসলেন আমি "বিচিত্রা" ঘরে গেলাম—সেখানে রিহার্সেল চলছিল। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকায় ঘর ভরা। আমি সেই আশ্চর্য 'বিচিত্রা' ঘরের বর্ণনা অন্যত্র লিখেছি, আরো হয়ত অনেকে অনেক জায়গায় লিখে থাকবেন (অবশ্য আমি পড়িনি।) কিন্তু সেদিন তার সৌন্দর্য এক অদৃষ্টপূর্ব মনোহারিত্বে আমাকে চমৎকৃত করেছিল। বড়লোকের বাড়ির সজ্জা আমি কিছু কিছু দেখেছি। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কলকাতার বাড়ির ঝাড়লণ্ঠন, গিল্টি করা ফ্রেমে ছবি, মখমলের চেয়ার আমরা সুন্দর বলেই জানতাম, কিন্তু সেদিন এক মুহূর্তে 'বিচিত্রা' আমার চোখ থেকে সে সব পূর্বদৃষ্ট সজ্জার শোভা শুষে নিল—কারণ সেটা ছিল অনুকরণ, এটা সৃষ্টি—সেই সৃষ্টিতে কোনো উদ্ভট নূতনত্ব নেই তা ভারতের বহু পুরাতন নক্সা কারুকলা ও শিল্পের একত্র সমাহার। এই ঘরের পূর্ণ বর্ণনা অন্যত্র লেখবার ইচ্ছা আছে এখন সেদিনের সন্ধ্যাটা শেষ করে নি। কবি বসেছিলেন একটা লম্বা তক্তাপোষের মত তাকিয়া ছড়ানো নিচু আসনে, বারান্দার দিকে পিছন করে, তাঁর সামনে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ছাত্রছাত্রীর দল। গান থামতে আমি নিচু হয়ে পায়ের কাছে এগিয়ে গেলাম। কবি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে গো?" কারণ ইতিপূর্বে তিনি আমাকে যেটুকু দেখেছিলেন তা মনে থাকবার কথা নয়। আমি প্রণাম করে পায়ের কাছে বসে পড়লাম। আমি কোনো ফুল আনিনি—এনেছিলাম ছাতিম গাছের একটি কচি বৃন্ত, সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি একটু অবাক হয়ে তারপর বললেন—"এ যে সপ্তপর্ণ। ওঃ তুমি মৈত্রেয়ী?"

সামনে ঘর শুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল—সেই দিন থেকে শান্তিনিকেতনের মানুষদের কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হতো, যে হীনমন্যতা রোগ জন্মালো আজো তা যায় নি। আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম ঘরের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন। কি ওরা ভাবল, ফুলের ভাষায় কথা বলা যায় কিন্তু পাতার ভাষায়?

আমার সে দুঃশ্চিন্তা যে অহেতুক নয় পঞ্চাশ বছর পরে তা জানতে পেরেছি।—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমিতা সেন এই সেদিন আমায় বলেছেন—"সেই দিন থেকে তোমায় আমরা 'ছাতিমপাতা' বলে উল্লেখ করতুম।"

আমি বললুম—"তোমাদের এই নীরব র‍্যাগিং আমি বুঝতে পারতুম না তা নয়।"

অমিয়বাবু সংবাদ দিলেন আমার বাবা মা বাইরের ঘরে বসে আছেন—কবি উঠে এলেন পাথরের ঘরে। এটাই তখন বৈঠকখানা ছিল—সে ঘরের আসবাবের নক্সা ও সাজসজ্জা দেশীয় এবং সম্পূর্ণ নূতন। জাপানী মাদুরে তৈরী কুশন ও তোষক সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এসব জিনিস তখন আর কে কোথায় দেখেছে? বাবার পকেট থেকে আমার লাল মলাটের কবিতার খাতাখানি বেরুল এবং লজ্জায় কণ্ঠরোধ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কয়েকটি কবিতা পড়তে হল।

আজ ভাবি কবির ওপর কী অত্যাচারই যে চলত। উনি এ সব অত্যাচারে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একথা এখানে বলব যে বাবার আদেশ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আদেশ ছাড়া আমি কোনো দিন আমার নিজের লেখা তাঁকে শোনাই নি। লেখা প্রকাশের জন্য সাহায্য চাই নি। মোট কথা লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দিকে হাত বাড়াই নি—কিংবা স্বামীর চাকরী, কোন বিপদ থেকে উদ্ধার, কোনো বড়লোকের কাছে পরিচয়পত্র—এ জাতীয় কোনো ঐহিক সাহায্য সারা জীবনেও কখনো আমি চাইনি। অন্যেরা চেয়েছে। আমি চোখ মেলে দেখেছি গুরুতর অন্যায় করে সরকারের কাছে তাঁকে দিয়ে বলিয়েছে—তাঁকে অপদস্থ করেছে—স্নেহের খাতিরে তিনি দু একবার এমন নিচু হয়েছেন যা ভেবে আমি তখন কষ্ট পেয়েছি। আমারও ঘর-সংসার ছিল, প্রয়োজন ছিল, যশপ্রার্থীও আমি কম নয় এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের জীবনের মাঝখানে ঘরের লোক হয়েই কিন্তু তখনও তাঁকে আমি পার্থিব জীবনের গণ্ডীতে ডাকি নি। দীর্ঘ পনের বছর ধরে তিনি ধ্রুবতারার মত ঊর্ধ্বে অথচ দিক নির্দেশ করে, লোভ ক্ষোভের ধূলি মলিন আকাশ ভেদ করে তাঁর জ্যোতি বিকীর্ণ করেছেন।

সেদিন ঠিক হল আমাদের শীঘ্রই শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে। অমিয়বাবুকে সেই প্রথম দেখলাম। ছোটখাটো মানুষ, সুন্দর চেহারা, মিষ্টভাষী, আর দূর থেকে দেখলাম হৈমন্তী দেবীকে—অল্পদিন হয় নন্দিনীর গভর্নেস হয়ে ইয়োরোপ থেকে এসেছেন। সেদিনকার সব কথাবার্তা আজ কিছু মনে করতে পারি না। আসবার সময় বাবা বললেন, "আমাকে তো আপনি শত্রুপক্ষই ভাবেন—কিন্তু আমার বাড়িতে আমার কন্যাটি আপনার মিত্রপক্ষ—আপনার বিরুদ্ধে একটুকু কথা উচ্চারণ করবার জো নেই।" কবি

হাসলেন। সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। বললেন, "আমি এরকম ঘরে ঘরে আমার দুর্গ গড়ে রেখেছি।"

শান্তিনিকেতন যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে অমিয়বাবুর চিঠি ও টেলিগ্রাম এলো যাত্রার দিন বদলের অনুরোধ জানিয়ে। অনেক লোকজন ঠিক ঐ সময়ে আসবে কথাবার্তা কইবার সুযোগ হবে না। আমি বিমর্ষ মনে ভাবতে লাগলাম এইবার বাবার মত বদলাবে কিংবা এত ক্ষুণ্ণ হবেন যে যাওয়াই হবে না। অভিমানে মন অন্ধকার হয়ে গেল। শিশু মনে হতাশার কান্না এত তীব্র যে, নিজেই তার মানে বুঝতে পারলুম না। পরের দিনই খুব কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কবির স্বহস্তে লেখা একটি চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির অক্ষরগুলি এমনই ভাঙ্গা যে পীড়িত অঙ্গুলীর কষ্ট বুঝতে দেরী হল না। আমাদের সকলের মনের মেঘ কেটে গিয়ে আনন্দ ঝক্‌মক করে উঠল।

কল্যাণীয়েষু

অতিথি অভ্যাগতে ঘর ভরে গিয়েছিল। কাল তোমার টেলিগ্রাম পেয়েই এদের মধ্যে তিনজনকে নির্মমভাবে বিদায় করেচি। গাড়িও স্টেশনে পাঠিয়েছিলুম আশা ছিল অমিয়র চিঠি টেলিগ্রাম যথাসময়ে না পৌঁছতে পারে। শূন্য গাড়ি ফিরে এল। অনুতাপ বোধ করচি। আজ হীরেন্দ্র দত্ত মশায় ও আরো অনেকে আসচেন এখানকার কাজে সুতরাং পুনরায় স্থানাভাব ঘটবে। তবু ইতিমধ্যে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারতো। আগামী শুক্রবার কোনো বাধা হবে বলে আশঙ্কা করি নে—অতএব এবারকার বিঘ্নকে উদার মনে ক্ষমা করে আর বারে সকলে মিলে প্রসন্ন মুখে এসো। আমার অঙ্গুলী পীড়িত।

ইতি শনিবার—

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময়ে আমি কাব্যের রবীন্দ্রনাথকেই চিনতাম—ব্যক্তিগত মানুষকে তখনও কিছুই জানিনা। পরে জেনেছি কোথাও যাওয়ার সময় পরিবর্তন করা, engagement-এর পরিবর্তন করা এঁদের বংশগত অভ্যাস। "Babu changes his mind so often।" এটা দ্বারকানাথ সম্বন্ধে তাঁর সেবকের উক্তি।

বিকেলের দিকের কোনো গাড়ীতে শান্তিনিকেতন পৌঁছন গেল—ভাইবোনদের নিয়ে মা, বাবা ও আমি।

১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতন অন্য রকম ছিল। যানবাহন প্রধানত গরুর গাড়িই তবে মোটরের-রাস্তাও হয়েছে এবং সবে মাত্র একটি বাস হয়েছে আশ্রমের। রথীদার একটি সিডান গাড়িও ছিল।

আমাদের আনতে সেই গাড়ি নিয়ে অমিয়বাবু এসেছিলেন। গাড়ির ভিতর ঢুকে অবাক হয়ে দেখি, গাড়ির ভিতরটা পাটি দিয়ে মোড়া টুকিটাকি জিনিষে সাজান; জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ঘরের প্যানেলিংও ছিল পাটির। এটা অভিনব কারণ তখন বিলাতী নকসার ফুলের ছাপ দেওয়া কাগজ (Wall paper) দেওয়ালে লাগান রেওয়াজ ছিল নয়ত হত বার্ণিশ করা কাঠের প্যানেলিং।

গাড়িতে ঢুকেই বাবা বললেন, "রবিবাবুর দেখছি পাটি প্রীতি অসাধারণ।" অমিয়বাবু বললেন এসব রথীন্দ্রনাথের করা!

তখনকার গেষ্ট হাউস অর্থাৎ মহর্ষির আমলের দোতলা শান্তিনিকেতন বাড়িতে আমাদের স্থান তৈরী ছিল। সামনের গেটে লোহার পাতে লেখা সংস্কৃত মন্ত্রটি "আনন্দ রূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি" বাবা পাঠ করে বুঝিয়ে দিলেন—এইটি মহর্ষির জপমন্ত্র, রবীন্দ্রনাথেরও অতিপ্রিয়। আনন্দরূপেই কবি ঈশ্বরকে জানেন।

আমরা মন্দিরের পাশ দিয়ে তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সেই অট্টালিকায় ঢুকলাম। বাবার তো চেনা জায়গা, মা ও আমি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করছি। শুধু তো রবীন্দ্রনাথ নয় মহর্ষিকেও মা দেখেছেন—আর দিদিমার কাছে কত গল্পই শুনেছি তাঁর।

দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা; রাত্রের আহার ঐ খানেই দিয়ে যাবে। পরদিন সকালে আশ্রম দেখা। দুপুরে উত্তরায়ণে নিমন্ত্রণ। বিকালে প্রত্যাবর্তন।

আমি ভাবছি আমি একটু একলা কি করে যাই! তাহলে মন খুলে কথা বলি। ট্রেন থেকেই এই চিন্তাটা আমায় পেয়ে বসেছে! একলা গিয়ে আমি কি বলব তা কিন্তু কিছুই ঠিক করিনি। আমাদের দেখাশুনো করছিলেন স্থূলকায় এক ভদ্রলোক। তাঁকে জোড়াসাঁকোতেও দেখেছি। সম্ভবত তিনি জমিদারী সেরেস্তায়ও কাজ করতেন, জমিদারী সংক্রান্ত অনেক তথ্য বাবাকে দিচ্ছিলেন। খুব আমুদে লোকটি—নাম বোধহয় গোপাল। তাকে আমি একটু একলা পেয়ে বললাম, "আমি শান্তিনিকেতন দেখতে চাই না—রবিবাবুর সঙ্গে একটু একলা দেখা করতে চাই—" (এখনকার পাঠকরা

আশ্চর্য হবেন কিন্তু তখন সকলেই তাঁকে ঐভাবে বলত—কেবল শান্তিনিকেতনে গুরুদেব বলা হত)

গোপালবাবু বললেন, "তা কেন, দুটোই হতে পারে! আমি খুব ভোরে এসে তোমায় ডাকব।"

অতি প্রত্যুষে উঠে কম্পিত হৃদয়ে তৈরী হচ্ছি—বাবাকে বললাম—"গোপালবাবু এসেছেন আমি এখন একটু রবিবাবুর কাছে যাচ্ছি। বাবা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন—"কখন এ এপয়েন্টমেন্ট হল ?'' তখন 'ডেট' কথাটার ব্যবহার ছিল না।

সেই প্রথম শান্তিনিকেতনের প্রত্যূষ দেখলাম। দিগন্ত বিস্তৃত খোয়াই এর ঢেউ চলেছে। মাঝে মাঝে তালগাছ কখনো নিঃসঙ্গ কখনো দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে অজ্ঞাত ফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে এল উত্তরায়ণের কাছে আসতে। কবি তখন পাশের মাটির বাড়ি ছেড়ে এসেছেন কোনার্ক বাড়িতে। পাশে মাটির বাড়ি মৃন্ময়ীতে থাকেন নব বিবাহিত অমিয় ও হৈমন্তী। নিপুণ করে আলপনা দেওয়া দরজার উপর থেকে পেলমেটের মত খড়ের ফুল ঝোলানো, ভিতরে দেওয়ালে টাঙ্গান ওঁদের বিয়ের সুচিত্রিত পিঁড়ি—আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখছি! আমার পাঠকরা হয়ত ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ধান ভানতে শিবের গীত সুরু করেছি—এখন তা মনে হতে পারে কারণ এখন এসব পরিচিত দৃশ্য, তখন তা ছিল না। কেউ ভাবতে পারত না যে মাটির ঘরে এমন উচ্চমার্গের মানুষরা বাস করবে এবং রবীন্দ্রনাথ এই কাজে হাত দিয়েছেন। বাঁশের বেড়া আর আল্পনা তাঁর তস্কর বৃত্তির হাতিয়ার, তিনি অপহরণ করছেন, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জীবন থেকে অর্থের মূল্য অপহরণ ক'রে, সৌন্দর্যের মূল্যে তাকে মনোহর করছেন। সেদিন এত কথা আমি ভাবতে পারি নি সত্য--তবে ঐখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম—আমার যদি কোন দিন বিয়ে হয় আমি চক-মেলান দালান চাই না এরকম বাড়ি হলে যথেষ্ট হবে! এটা ঠিকই যে মাটির বাড়ির অনেক অসুবিধা আছে খড়ের চালের নিচে থাকলে তবে জল পড়ার দুঃখ বুঝতে পারা যায় কিন্তু তাও তো মাঝে মাঝে বোঝা দরকার, সে কথা অবশ্য আমি এখানে বলছি না। রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদ প্রচার করছিলেন না। তিনি যেন অতি স্বাভাবিক ভাবে আপন অজ্ঞাতসারে তাঁর অন্তরস্থ সত্যবোধগুলি তাঁর চারদিকে বিস্তার করছিলেন, অবশ্য তা কোনো বৈরাগ্যসাধনের জন্য নয়। তিনি জীবনকে শূন্য করেছেন না পূর্ণ করছেন সত্যে

পেতে—এদের কাছে কত ভূতের গল্প করলুম।" ভূতের গল্প বানিয়ে তাকে সত্যি বলে চালিয়ে দিয়ে ভয় দেখানো ওঁর বরাবরের আমোদ—মাস্টারমশাই গল্পটি এই ভাবে লেখা—পরে আমিও মিথ্যে ভূতের গল্পে অনেকবার সত্যি ভয় পেয়েছি। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির কল্পনা মাথায় আসতেই তা দিয়ে "ভাই ছুটি" কে ভয় দেখাবার ইচ্ছে হয়েছিল সাহস হয় নি। (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য)

সুহৃদ ও সেঁউতি হাসছিলেন, আমি বুঝতে পারলাম আগের দিন ওদের অনেক গল্প বলেছেন, আরো বুঝতে পারলাম সন্ধ্যেবেলা আসা কিছু অসম্ভব ছিল না। এতখানি সময় নষ্ট হয়েছে বলে মনটা হায় হায় করে উঠল।

সেইদিনই আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কখনো অভিনয় করেছি কিনা, এবং করবার ইচ্ছে আছে কিনা। আমি তো জীবনে অভিনয় করিনি, কোথায় করব? আমি বললুম, আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারি। উনি বললেন মালিনী নাটকটি অভিনয় করবার কথা ভাবছেন। তখন আমি মালিনী পড়িনি। আমায় বললেন, তোমাকে আমি কয়েকমাসের জন্য তোমার বাবার কাছে ধার চাইব—যদি দেন তবে তোমাকে মালিনী সাজাই। তোমার মধ্যে মালিনীর মত একটি মনের আকাশ আছে। ইতিমধ্যে মা-বাবা এসে পড়লেন, কথা উঠল ঋতুরঙ্গ নটরাজের—এ যাবৎ কবির প্রায় সমস্ত লেখাই প্রবাসীতে প্রকাশ হত। ভারতবর্ষ ও বসুমতী দুটি বৃহৎ পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েছে বরাবর। এই পত্রিকাগুলির মেজাজের সঙ্গে ঠিক রবীন্দ্র কাব্য খাপ খেত না। কেবলমাত্র 'নটীর পূজা' হঠাৎ বসুমতীতে প্রকাশ হয়! যা হোক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'বিচিত্রা' নামে পত্রিকা বিচিত্রা কবিতায় সজ্জিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজান শেখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি
বিচিত্রা হে বিচিত্রা
যেখানে তব রঙ্গের রঙ্গভূমি।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখা লিথো করা নন্দবাবুর ছবিতে সজ্জিত কবিতা দেখতে এবং পড়তে ভালো লাগত খুব। এর মধ্যে একটি লাইন "অর্থহারা সুরের দেশে ফিরালে দিনে দিনে"—সুরের দেশ যে 'অর্থহারা'

অর্থাৎ এই জগতে অন্যত্র তার কোনো counterpart নেই এই কথাটা আমি বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল শুধু সুর নয় আরো অনেক কিছু অর্থহারা ভাব আছে—এই যে আমার থেকে থেকে মন কেমন করে, চোখে জল আসে এর অর্থ কি? কিছুই না। বাবা বিচিত্রা আবৃত্তি শুনতে শুনতে বোধহয় হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলেন; একদিন আমায় বললেন, "খুব তো কবিতা আওড়াচ্ছ—মানে কি বল—কে এই বিচিত্রা?" তাই তো! আমি কি করে জানব কে এই বিচিত্রা—মানুষ নয় তো! বাবা বললেন, "এতো সেই একই বিচিত্রা—জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে/তুমি বিচিত্র রূপিনী—সেই-ই কৌতুকময়ী যিনি অন্তর মাঝে বসে মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিচ্ছেন; আবার সেই-ই নিরুদ্দেশ যাত্রারও সঙ্গিনী—নিরুদ্দেশ যাত্রা কি বল্ তো? পারলি না তো? আমরা তো প্রথম দিন থেকেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করে বেরিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত এই যাত্রা নিরুদ্দেশ থাকবে।" 'কোনো দিনই উদ্দেশ পাব না' এই কথাটি আমাকে ভারি ব্যাকুল করেছিল। এ সব কথা যখন হচ্ছিল তখন আমার বয়স চৌদ্দ।

সেদিন কোণার্কে বসে বাবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঋতুরঙ্গের কবিতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন—নটরাজ নামে যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে বা হবে, সে আলোচনা খুব মন দিয়ে শোনা সত্ত্বেও সেদিন অনুধাবন করতে পারি নি। পরে বাবার সঙ্গে বহুবার আলোচনা করার ফলে মনে আছে। বিশ্ব সৃষ্টি যেন এক নৃত্যলীলা—নটরাজের তাণ্ডবে এক পদক্ষেপে বাহিরের আকাশে রূপলোক জন্ম নেয়—কবির এই উদ্ধৃতি দিয়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই রূপলোক কি? এইসব বস্তু যা দৃশ্যে, স্পর্শে, শ্রবণে, ঘ্রাণে আমরা জানতে পারি —আর অন্য পদক্ষেপে অন্তরে রসলোক মথিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেই সেই বস্তুর স্পর্শে জাগে অনুভূতি। 'অন্তরের ও বাহিরের এই মিলিত তালে যোগ দিলে জীবনে রস উপলব্ধির আনন্দ পাওয়া যায়'। ঋতুরঙ্গের ছন্দে গানে তাই বলা হয়েছে।'

বাবা আমাকে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের মূল ভাব কতগুলি স্থির আছে সেগুলি নানা সাজে সাজিয়ে বলেন যেমন এই কথাই তো তোমায় বলেছি। মানসীর উৎসর্গ পত্রে আছে—'বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে—বিরহী সে ঘুরে ঘুরে, ব্যথাভরা কত সুরে কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে......' তারপর পূর্ণতা আসে তখনই যখন অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রূপের মিলন ঘটে।

এসব কথা সেদিন অনেক অস্পষ্ট ও সুদূর ছিল যেন 'না বোঝা' বাণীর ঘন যামিনী'—তবু সেই অন্ধকারে ঈষৎ বোঝার জ্যোৎস্নালোকের আলো-ছায়ার খেলায় যে 'অধরা মাধুরী'র সন্ধান পেয়েছিলাম তেমন অনেক বিজ্ঞ হয়েও আর পাই না।

সকালবেলা শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখা হল। সেবারই পূর্বপল্লীতে সপরিবারে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সেই বাড়িতে বাবা নিয়ে গেলেন, যে মাটির বাড়ির বর্ণনা তাঁর কন্যা অমিতা সেন মনোজ্ঞ ভাষায় তাঁর 'আশ্রম কন্যা' বইতে লিখেছেন।

দ্বিপ্রহরে খাবার নিমন্ত্রণে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। উত্তরায়ণ তখন সবে সুরু হয়েছে। খুব ছোট একটি খাবার ঘর যাতে খাবার টেবিল চেয়ার রেখে আর নড়বার জায়গা নেই। ভিতরের রান্না ঘরগুলো ও বসবার ঘরটি মাত্র তৈরী হয়েছে। পিছনের পশ্চিমের বারান্দার চিহ্ন মাত্র নেই—সেখানে মোরাম ঢালা ও তার চারদিকে বাঁধান সরু পথ। খাবার ঘরের দরজায় পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর সঙ্গে দেখা হল। অসামান্যা রূপসী। তখনকার দিনে মেয়েদের খুব গহনা পরার রেওয়াজ ছিল। প্রতিমাদেবীর হাতে গোছা করে চুড়ি আর গলায় একটি মাদ্রাজী হার ছাড়া আর কোনো ভূষণ ছিল না! কিন্তু সামান্য গহনার অসামান্য নক্সা তাঁর স্বর্ণবর্ণের উপর ঝক্ ঝক্ করলেও তাঁর তুলনা হচ্ছিল না।

খাবার টেবিলের দৃশ্য অভিনব। সে সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাড়ীতে কাঁসার থালাবাটি, পাশ্চাত্য ভাবাপন্নদের বাড়িতে চীনামাটির বাসন অর্থাৎ ডিনার সেট ব্যবহৃত হত। বিধবা, ব্রহ্মচারী ইত্যাদিদের জন্য সাত্ত্বিক খাবারই পাথরের বাসনে দেওয়া হত। খাবার ঘরের চেয়ারগুলো চওড়া, নিচু। প্রশান্ত নিচু টেবিলে শ্বেত পাথরের থালাবাটিতে অন্নব্যঞ্জন আমাদের চোখে তাই নূতন ঠেকেছিল। ছোট খাবার ঘরখানি শিশুকাঠের তক্তা দিয়ে প্যানেলিং করা আর পশ্চিমদিকের প্যানেলের সঙ্গে কয়েকটি রঙ্গীন ছবি ফ্রেমে আঁটা। ছবিগুলি অসিত হালদারের আঁকা। দেওয়ালে নানা রকম কাঠের শৌখীন হাতা চামচ প্রভৃতি টাঙানো ছিল। শুনলাম এগুলো সিংহলের জিনিষ। তাকে আরো বেশ কিছু খুঁটিনাটি জিনিষ বিশেষ করে বাঁশের উপর গালা দিয়ে ঢাকা জাপানী বাসন—সব যেন এক সৌন্দর্যের ঐক্যবন্ধনে বাধা পড়েছে।

আমরা টেবিলে খেতে বসেছি এমন সময় ফুটফুটে ফর্সা ভ্রমর কৃষ্ণ চুল

টানা টানা কালো চোখ একটি বছর তিনেকের মেয়ে সাদা ফুরফুরে ফ্রক ঘুরিয়ে সামনের মোরামের উপর দিয়ে 'লা লা লা লা লা' বলে ছুটে গেল তার পিছন পিছন ছুটলেন শাড়ি পরা একটি বিদেশী তরুণী অর্থাৎ হৈমন্তী দেবী। নন্দিনী সদ্য বিদেশ থেকে এসেছে তখনও দু এক কথা ফরাসী বলে—এই সেই তিন বছরের প্রিয়া— "কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে / তিন বছরের প্রিয়া আমার দুঃখ জানাই কাকে।"

নিকট এবং দূর, ঘর ও বাহিরের সামঞ্জস্যে সুন্দর দৃশ্য সেদিন আমার কাছে অভূতপূর্ব লাগছিল। চারিদিকের বিশিষ্টতার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে দেখছিলাম—কাব্যের মূর্তি মানুষের রূপ নিচ্ছিল। আমার মধ্যে তখন যে উত্তরণের চেষ্টা চলছিল আমি তাকে ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। কিন্তু সেদিন আমি খেতে কিছুতেই পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে হাত নেড়ে মুখে খাদ্য তোলা, বিশেষত হাত বাড়িয়ে বাটি এনে থালায় ঢালা—তাও অসম্ভব। প্রতিমা দেবী যত অনুরোধ করছেন, আমি তত আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাথা নিচু, হাত অনড়। এ-রকম আমার অনেক দিন পর্যন্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে খাওয়াটা বড় মুস্কিল হত। একবার রানীদির কাছে বকুনি খেয়েছিলাম, 'মৈত্রেয়ী তুমি তো বড় অবাধ্য। তোমাকে উনি অত করে ক্ষীর আমসত্ত্ব খেতে বললেন, আনিয়ে দিলেন, আর তুমি একটু খেলে না! পারো কি করে এরকম করতে?' খুব ন্যায্য বকুনি কিন্তু এটা ঠিক অবাধ্যতা নয়—মরমে মরে যাওয়া কি অবাধ্যতা? ওটা teen-ager-এর মূঢ়তা কিংবা বিমূঢ়তা!

পরে অবশ্য এরকম ছিল না। উনি ওঁর থালা থেকে চামচ দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্লেটে তুলে দিচ্ছেন আর আমি মহানন্দে খাচ্ছি এরকম হয়েছে কতবার। বিশেষ করে আম। রথীদা এবং তাঁর পিতা দুজনেই ছুরি কাঁটা দিয়ে আম কাটতে দড় ছিলেন। সুনিপুণ কৌশলে কাঁটা দিয়ে চেপে ধরে খোসাসুদ্ধ মাংসল অংশ আঁটি থেকে বিযুক্ত করে ফেলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে খেতেন ওঁরা, একটু রস গড়িয়ে পড়ত না। হাতে লাগত না, নোংরা হত না। মংপুতে আম পাঠাতেন রথীন্দ্রনাথ—আর তাঁর পিতা প্রায়ই খাবার টেবিলে কুরে কুরে আম আমার প্লেটে তুলে দিয়েছেন।

সেদিনকার প্রধান সাক্ষাৎকারের সময় ছিল দ্বিপ্রহরে আহারের পরে—তখন আমার কবিতার খাতা দেওয়া হবে। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আবার আমরা কোণার্ক-এ উপস্থিত হলাম। এবার দক্ষিণে আর একটি ছোট ঘরে

কবি বসেছিলেন, সেখানেই একপাশে তাঁর খাট ছিল আর একটি নলখাগড়া জাতীয় জিনিষের চেয়ার ও কয়েকটি মোড়া ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব ছিল না ; সম্পূর্ণ নিরাভরণ সাদাসিদে ঘরটি ঐ সুসজ্জিত খাবার ঘরের চেয়ে বিপরীত তা লক্ষ্য করবার মত বুদ্ধি ছিল না আমার।

অবশ্য যদি আমি বলি যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিই তাঁর চারপাশ অলঙ্কৃত করে রেখেছিল তা হলে সে কথা কেউ যেন বাড়িয়ে বলা না মনে করেন।

বাবা মা মোড়াতে বসলে আমি তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। বাবা পকেট থেকে ছোট লাল রংএর কবিতার খাতাটি বের করে কবিকে দিলেন— "একে একটু ছন্দ বুঝিয়ে দিন"—

আজ দুঃখ হচ্ছে সেই খাতাটি হারিয়ে গেছে বলে। আমি সে সময়ে ছন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমার পিতাও হয়ত সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, নৈলে তিনিই তো প্রাথমিক ভুলগুলি সংশোধন করে দিতে পারতেন। কিংবা ভেবেছিলেন গুরুর কাছেই প্রথম পাঠ নেওয়া ভালো। আমার লেখায় যেখানে যুগ্ম মিলের অভাব ছিল সেগুলো প্রথম তিনি দেখিয়ে দিলেন। অন্ত্যমিল যে যুগ্ম হওয়া চাই সে কথা বলে মাত্রা বুঝিয়ে দিলেন। মাত্রা ঠিক না থাকলে ছন্দ কেটে যাবে নিজের যে কবিতাটি গুণে গুণে তিনি ছন্দ বোঝাছিলেন সেটা হচ্ছে—

> পঞ্চশরে/দগ্ধ করে/করেছ এ কি/সন্ন্যাসী
> বিশ্বময়/দিয়েছ তারে/ছড়ায়ে
> ব্যাকুলতর/বেদনা তার/বাতাসে ওঠে/নিঃশ্বাসি
> অশ্রু তার/আকাশে পড়ে/গড়ায়ে—

তাঁর ডান হাতে আমার ছোট খাতাটা ধরা ছিল। কোলের উপর ন্যস্ত বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল থেকে অক্ষর গুণে গুণে বলতে লাগলেন—পঞ্চশরে/দগ্ধ করে/করেছ এ কি/সন্ন্যাসী—অর্থাৎ তিন দুই, তিন দুই, তিন দুই, চার তারপরে বিশ্বময়/দিয়েছ তারে/ছড়ায়ে--তিন দুই তিন দুই তিন। এর মধ্যে হঠাৎ যদি তুমি দুই দুই ঢুকিয়ে দাও তাহলে ছন্দপতন হয়ে যাবে—তখন্ পতনের ফলে যা অনিবার্য—কবিতা পদ অর্থাৎ পা ভেঙ্গে খোঁড়াতে থাকবে। এরপর আমার একটা কবিতা যেটা রবীন্দ্রনাথের উপরেই লেখা সেটা পড়লেন। সেটাতেও ঐ রকম ভুল ছিল তিন তিন দুই হতে হতে হঠাৎ দুই দুই হয়ে গিয়েছিল, যে কথাটা দুই দুই হয়েছিল সেটা হচ্ছে 'কবিবর'—যা হোক ঐ খাতাটি হারিয়ে গেছে নৈলে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার্থে সেটা আমায় যদি

এখানে ছাপাতে হত তাহলে মান্ধাতার আমলের গন্ধমাখা সে কবিতা পড়ে আমার বর্তমানকালের পাঠকরা হাস্য সম্বরণ করতে পারতেন না। কবিতাটি ছিল অবশ্য তাঁর সম্বন্ধেই। যা হোক খাতা দেখতে দেখতে উনি বললেন "কবিবর" দুই দুই হয়ে যাচ্ছে এক কাজ কর, আমার শুধু কবি বললেই যথেষ্ট হবে -বর না হয় নাই হলুম। তারপর মুচকি হেসে "বরকে বরবাদ করে দাও। —আমার উপর কবিতা লেখা তো খুব সহজ রবীন্দ্রর সঙ্গে কবীন্দ্র মিলিয়ে দিলেই হল।"

খাতাটা কোলের উপর চেপে করে রেখেছিলেন, চেয়ারের হাতলের উপর দুই কনুই রেখে হাত দুটি উপরের দিকে সোজা করে কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল, সেদিনও তাই করছিলেন। তার আধখোলা কোরকের মত মুঠি কোনো শিল্পীর দেখা মুর্তির মত আমাকে মুগ্ধ করছিল। ছন্দ টন্দ ভুলে আমি সেই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখছিলাম। কবি বললেন "এই বারে তুমি নিজে নিজে কবিতাগুলো সংশোধন করে আমায় দেখতে পাঠিও।"

ছন্দ শিক্ষার পাঠ শেষ করার পরে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা চলল যে যে বিষয়গুলো তখন দেশে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল শরৎচন্দ্র ও নরেশ সেনগুপ্তের সঙ্গে বিচিত্রা পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়ে যে বিতর্ক হচ্ছিল, মনে হয় আলোচনায় সেটাই প্রাধান্য পেল। বিতর্কটা কিছু কটু হয়ে উঠেছিল। আমি শুনেছিলাম নরেশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র, বিশেষ করে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে গেছেন। তাঁদের তর্কের বিষয় বস্তুটা বোঝবার বয়স আমার নয়। যদিও সমস্ত প্রবন্ধগুলি বাবা আমায় পড়িয়েছিলেন- আমি সারমর্ম বুঝেছিলাম রবীন্দ্রনাথের মতে কুমড়ো ফুলের উপর কবিতা লেখা চলবে না কারণ তা খাদ্যবস্তু রসনার ভোজ্য - তার প্রয়োজন জৈবিক। জীবনের উদ্বৃত্ত অংশের নয়। কথাটা মোটামুটি বুঝে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমি কোনো দিন লাউ-কুমড়োর বা আম কাঁঠালের কবিতা লিখব না। লিখিও নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরে সজনে ফুলকে কবিতায় বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন।

সেদিন বাবার সঙ্গে আলোচ্য বিষয় ছিল আর একটি চরক আর 'পথের দাবী' পথের দাবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও আমার পিতার বক্তব্য আরো কয়েকবার শুনেছি তাই সেদিনের কথা ও অন্যদিনের কথা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বই সম্বন্ধে এঁদের মত বোধহয় বরাবরই এক ছিল, সেটা মোটামুটি এই—পথের দাবী অত্যন্ত কাঁচা উপন্যাস— বালসুলভ উৎসাহে লেখা। একজন বিপ্লবী নেতার যে মূর্তিটি খাড়া হয়েছে তা অবাস্তব। সর্বকর্মপটু

সর্ববিদ্যাবিশারদ, ভাষাবিদ নায়ক সব্যসাচী—অর্থাৎ সে অর্জুনের মত বীর তথাপি সে ভাবালুতায় ভরা হৃদয়াবেগের ফানুস—অপূর্ব দলের নির্দেশে শাস্তি পেলে প্রেমিকার দুঃখে গলে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া বিপ্লবী নেতার চেয়ে সাধুসন্তর কাছেই প্রত্যাশা করা যায়। সব্যসাচীর মধ্যে দোষত্রুটিহীন যে বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করা হয়েছে তা যেমনই অলীক তেমনি বালসুলভ। দুই প্রাজ্ঞ মানুষের এরকম আলোচনা শুনে দুঃখিত ও অবাক হয়েছিলাম। কারণ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাহিনী তখন পল্লবিত হয়ে বাংলা দেশের তরুণ তরুণীদের মনে আগুনের রঙ লাগিয়ে দিয়েছিল—আমরা তো তার বাইরে ছিলাম না। আমার সহপাঠিনী আমাকে এই গল্পটি বলেছিল উৎসাহের সঙ্গে—বইটিও লুকিয়ে এনেছিল, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল ক্লাশে—সব্যসাচী সম্বন্ধে আমরা এমন উৎসাহিত হয়েছিলাম যে যদি কোনো উপায়ে তিনি সশরীরে আমাদের ক্লাশে এসে দাঁড়াতেন তবে পুলিশ আসবার আগেই আমরা সকলেই তাঁকে মালাদান করে ফেলতাম। সেই সব্যসাচী সম্বন্ধে এই কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই এ-রকম করতেন—সবাই যা ভালো বলছে যা নিয়ে মেতে উঠেছে উনি তার বিপরীত কথা বলবেন—তখন আমি তর্ক সুরু করে দিতাম। চরকা তার মধ্যে একটি। তখন আমি কেন, সারা দেশেই উপন্যাস বিচারের মাপকাঠি ছিল একটি নিটোল গল্প আর টেররিষ্ট আন্দোলন এমনই মনোহরণ করেছিল দেশের যে সে সম্বন্ধে যে কোনো অত্যুক্তিই গিলে ফেলবার লোকের অভাব ছিল না।

অভিনয় ও রবীন্দ্রপরিষদ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে উত্তর প্রত্যাশা করে চিঠি লেখ এ কথা আগে ভাবিনি। তার কারণ এই যে, তোমাদের বয়সে যখন চিঠি লিখতুম তখন চিঠি লেখা—মনকে পেয়ে বসত বলেই লিখে যেতুম—তার কাছে কৃতজ্ঞ হতুম যাকে উপলক্ষ্য করে চিঠি লেখা সহজ হত। কাজের চিঠি যাকে-তাকেই লেখা যায় কিন্তু সহজ চিঠি লেখাতে পারে এমন লোক অল্পই মেলে—যখনি তাদেরকে পেয়েছি তখন নিজের গরজেই চিঠি লিখে গেছি—। কিন্তু সে এ বয়সে

নয়। অকারণ কর্মের বয়স আমার ফুরিয়েচে, এখন সকারণ কর্মের বোঝায় আমার পিঠ গেল বেঁকে। এখন আমার মনোবনস্পতি ফলভারের ভিড়ে নিষ্পত্র—এখন শেষের সেইদিন ঘনিয়ে আসচে, যখন—অন্যে পত্র লেখে কিন্তু আমি রতি নিরুত্তর। জীবিতকালের প্রধান ঐশ্বর্য্য হচ্চে অবকাশ, সেই অবকাশের ফাঁক দিয়েই আসে আলো হাওয়ায় গন্ধে-বর্ণে বিশ্বের মৈত্রী। আর সেইটিই হলো চিঠি চালাচালির প্রশস্ত পথ। পাছে এই পথ দিয়ে পাঠশালা পালাই কাজ কামাই করি তাই কর্তা এ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে বয়সে কর্তব্যের বালাই নেই সেই বয়সে এপথে পাহারাওয়ালা থাকে না—আমারো ছিল না—ভুলে এখন যদি এই রাস্তায় এসে পড়ি পদে পদে পার্মিট দেখাতে হয়—পথে দণ্ডধারীর অন্ত নেই—অতএব আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার চালাতে যে চায় তাকে গীতার উপদেশ খুব ভালো করে হজম করতে হবে এ সম্বন্ধে তোমার বাবার কতদূর উন্নতি হয়েছে জানিনে কিন্তু উপদেশ দিতে পারবেন। তাঁর কাছে থেকে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যটা আদায় করে নিয়ো - যে সুখটুকুর জন্য ডাক-পিওনের ঝুলিটার পরে নির্ভর করতে হয় তার আশা বন্ধন থেকে মনকে মুক্তি দান কোরো। তোমার বাবার অসুখের খবর শুনে উদ্বিগ্ন হলুম—সেরে উঠতে যেন দেরী না করেন তাঁর পরে আমার এই অনুরোধ।

ইতি ২৮ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে চিঠি লিখিনি বলে বোধহয় রাগ করেচ ভালো করে চিঠি লিখব সঙ্কল্প করে দিন পিছিয়ে দিতে দিতে দিন নষ্ট হলো। শরীর ক্লান্ত ছিল—অবস্থা অনুকূল ছিল না। তাই দৈন্য যখন তখন দানের চেষ্টা বন্ধ রেখেছিলুম। তার কারণ আমার মতে অনেক স্থলেই কানা মামার চেয়ে নেই মামা ভালো। যাহোক দেশে ফিরেছি—কিন্তু স্থির করেছি নির্জনে আশ্রয় নেবো পড়া ও লেখা সম্পূর্ণ বন্ধ করব। অল্প বয়সে নানা কাজ করবার শক্তি ও সময় থাকে, এখন একটা মাত্র কাজে এসে ঠেকেছি। অন্য সব খরচ বাঁচিয়ে সেইটেতে মন দিতে হবে—একে এক কথায় বলা চলে সন্ধ্যা-

বেলাকার প্রদীপ জ্বালানো। সোমবার পর্যন্ত এখানে আছি—তারপরে অদৃশ্যমগ্রাহ্যং হবার চেষ্টায় থাকব।

ইতি ২৯ জুন ১৯২৮
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিটি সম্ভবত কলকাতা থেকেই লেখা।

কবি বাংলা ইংরেজি দু-রকম তারিখই ব্যবহার করতেন। আমার তাই আজ চিঠিপত্র সাজাতে গিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ঘটছে—ইতিহাস আমার মানসপটে ছবি এঁকে গেছে—কালের প্রভাবে কোনো রং গাঢ় হয়েছে কোনোটা বা ফিকে কিন্তু তারিখের শলাকায় সব ঘটনাকে বিদ্ধ করে রাখতে পারি নি। এই সব চিঠি যখন আসছিল তখন আমরা রীচি রোড ছেড়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আর একটি বাড়িতে ভবানীপুরে উঠে এসেছি।

২৮শে মাঘ ১৩৩৪-এর চিঠিটা পড়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন চিঠিটার অর্থ আমি বুঝেচি কিনা—আমি এক রকম করে বুঝেছিলাম এবং জীবিতকালের প্রধান ঐশ্বর্য যে অবকাশ তা বুঝতে আমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের দেরি হবার কথা নয়। কিন্তু বাবা বুঝতে দেন কই? এক মুহূর্ত পড়ার ফাঁক নেই।

কিন্তু বাবা এর নিহিতার্থ আমায় বললেন, এই চিঠির মধ্যে গীতার কথা রয়েছে। উত্তর প্রত্যাশা করে চিঠি না লেখা যে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' র ব্যাখ্যা তা আমি কি করে বুঝব—তখন আমি গীতা বইটির নাম ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানতাম না। বাবা বললেন, প্রতি চিঠিতে আমায় একটি খোঁচা না দিয়ে ওঁর চলে না। অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা উপদেশ দেন কিন্তু পালন করেন না।

জীবনে বহুবার এই চিঠিখানি পড়েছি ও বিস্মিত হয়েছি। প্রত্যেক লাইনে কী চিন্তার চমক্। কী উপমার ঐশ্বর্য। অকারণ কর্ম ও সকারণ কর্ম যে নিষ্কাম কর্ম ও সকাম কর্মের অভিব্যক্তি বা প্রতিধ্বনি, অবকাশ বা জীবনের উদ্বৃত্ত অংশ যেখানে জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি, কবিতার লীলাক্ষেত্র—এ বিষয়ে কত জায়গায় কতভাবে লিখেছেন কিন্তু এই ছোট চিঠিটুকুর মধ্যে সেই সব গূঢ় গভীর চিন্তা চুমকির মত ঝক্ ঝক্ করছে। আজও আমি পড়ে আশ্চর্য হই। যা হোক শঙ্করাচার্যের বা রবীন্দ্রনাথের কারু উপদেশই মানতে পারলুম না—ডাক পিওনের ঝুলির দিকে

আমার দৃষ্টি অবিচল রইল এবং চিঠির জন্য প্রতীক্ষায় সুখ দুঃখ মেশান আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে রাখতে লাগল।

*　　　*　　　*

এই সময়ে আমার মনে কেবলি আশা হচ্ছিল যে কবি হয়ত মালিনী নাটকে মালিনী অভিনয় করতে আমাকে ডাকবেন। সেই রকমই তো বলেছিলেন কিন্তু তারপর আর কিছু শুনলাম না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পুরানো ছাত্রী ইন্দুসুধা ঘোষ আমার ইন্দুদি (যিনি খুব সুন্দর গান গাইতেন পরে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন প্রায় সারাজীবন) ইদানীং আমাকে বললেন যে গুরুদেব নাকি তাঁদের বলেছিলেন, আমি মৈত্রেয়ীকে রক্তকরবীর নন্দিনীর জন্যে চাই। ওকে পেলে রক্তকরবী করব। আমি অবশ্য একথা কখনো শুনিনি। আমাকে কখনো বলেন নি। আমায় বলে যে কোনো লাভ নেই তা তিনি জানতেন। ইন্দুদির অবশ্য তখন সে কথাটা ভালো লাগেনি। ইন্দুদি এখন আমায় বলে, আমরা তোমাকে অসহ্য ন্যাকা ভাবতাম—জানলার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে, নয়ত গুরুদেবের পায়ের কাছে অনড়। হাতে আবার ছাতিম পাতা। নুটুদি আমায় বললে, এই মেয়েটা এত ন্যাকা কেন রে? উত্তরে আমি বলি, ইন্দুদি তোমরা জান না তোমাদের আমি কোন স্বপ্ন জগতের মানুষ মনে করতাম। অবশ্য কলকাতার লোকরা তোমাদেরই ন্যাকা বলত! শান্তিনিকেতনের ছেলেরা মেয়েলী, মেয়েরা ন্যাকা, শুনে শুনে আমার রাগ ধরত। কি কারণে এই নিন্দা আজ হয়ত তা বিশ্বাস হবে না। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা নম্রভাবে কথা বলে, পরস্পর দেখা হলে নমস্কার করে, তারা কুৎসিত কথা বলে না বা শুনলে বিরক্ত হয়। এই হচ্ছে তাদের ন্যাকামী।

আমি ভাবি তোমাদের আমি কি চোখে দেখতাম তোমরা তা জান না। তোমাদের নিরাভরণ হাতে ফুলের গহনা। বেণীতে ফুলের মালা জড়ানো (তখন বাংলাদেশে মেয়েরা ফুলশয্যার রাত্রে ছাড়া ফুল পরতো না) শুভ্র নির্মল সুতির কাপড়ের পাড়ে বিচিত্র নক্সা, কপালে চন্দনের টিপ—গলায় সুর, পায়ে নাচের ছন্দ। তোমরা যেন কোন সুরপুরী থেকে শান্তিনিকেতনের রঙ্গীন মাটিতে ডানা মেলে নেমে এসেছ কবির এই বিশেষ লীলাকে রূপ দেবে বলে, আর আমি? আমি দর্শক, হায় শুধু দর্শক। লীলার ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে। আমি বলি, "ইন্দুদি ভাগ্যক্রমে তোমরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী

হয়েছিলে। তাই দৈবক্রমেই তাঁর আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলে।" ইন্দুদি বলে, "কেন তুমি হও নি?" আমি মনে মনে বলি হয়েছি বটে এবং মিথ্যা বিনয় না করেই বলব নিকট আত্মীয়ই হয়েছি কিন্তু সে দৈবক্রমে নয়। আমাকে সাধনা করতে হয়েছে। রীতিমত তপস্যা এবং তা আজও শেষ হয় নি।

যতদূর মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের নৃত্যগীতোৎসব প্রথম দেখেছিলাম ঋতুরঙ্গ—নটীর পূজা তার আগে হয়ে গেছে—সে বিষয়ে অনেক বর্ণনা শুনেছি, দেখিনি।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা নামে যে কবিতা গানের গুচ্ছটি বিচিত্রা পত্রিকায় নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রে শোভিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, তারই কিছু গান কবিতায়, নৃত্যে ঝংকৃত। সেই দৃশ্যগুলি আমার মনোহরণ করেছিল—। অদৃষ্টপূর্ব সেই শিল্পসৃষ্টি আমার চোখে মোহাঞ্জন লাগিয়েছিল, আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সে সময়ে নাচ, গান, জলসা ও অভিনয়ের এত ভূরিভোজনের আয়োজন ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমরা শুনতেই পেতাম না। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' কথাটাই তখনও তৈরী হয় নি। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গান শুনতে যেতেন সঙ্গীতপ্রিয়রা। ব্যাস, ঐ টুকুই যা সুযোগ। সেদিনের নৃত্যগীত আমার তাই অত অভিনব লেগেছিল। ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে, উঠোনে বসবে দর্শক আর চণ্ডীমণ্ডপে রঙ্গমঞ্চ। ঋতুরঙ্গের গানগুলো ছোট একটি চটি বইতে মুদ্রিত। সেটি বহুদিন আমার কাছে ছিল। এখনকার 'সুভেনির'-এর মত বিজ্ঞাপনে ঠাসা নয়। হলদে মোটা কাগজের মলাটের পিছনে লেখা আছে—"অনুগ্রহ করিয়া হাততালি দিবেন না।"

ভিতরের মঞ্চ সজ্জাও অসাধারণ, শুনলাম যবদ্বীপের অনেক সজ্জাদ্রব্য দিয়ে তা অলঙ্কৃত। কয়েকটি দৃশ্য মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে—রবীন্দ্রনাথের একক আবৃত্তি—'আষাঢ়' কবিতা।

বর্ষার আহ্বান। আজকে যখন কবিতাটি পড়ি বুঝতে পারি আজকের পাঠকদের কাছে বিশেষত আজকের কবিদের কাছে কবিতাটি অতিরিক্ত সরল অর্থাৎ জোলো মনে হবে। কবিতায় কলা, কৌশল, বাচনভঙ্গীর নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সেদিন আমাদের অনুভূতিতে সে কবিতা এক আশ্চর্য ধ্বনি বাজিয়েছিল।

....নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী
বুঝি আসন্ন হল তার বর

শুনি গর্জন রথ ঘর্ঘর

বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত

তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল

আঁখি পল্লব বাষ্প সজল

তাই সে রোমাঞ্চিত……।

শুষ্ক পৃথিবী যেন বিরহতপ্ত আর বর্ষা আসছে তার কান্ত—এতদিন এই মৃত্তিকা যেন তারই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, তার "রুক্ষ অঙ্গ পাংশু ধূসর—ধ্যান অঙ্গন শুষ্ক ঊষর। নাহি সখী সঙ্গিনী" গ্রীষ্ম তাপে শুকিয়ে গিয়েছে পৃথিবী। সেই পৃথিবীকে বলা হচ্ছে "ধরণী তপস্বিনী"—এবার তপস্যার ফল পাবার সময়, রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছেন দাঁড়িয়ে—এক হাত সামান্য ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছে। উদাত্ত ভঙ্গীতে তিনি পিপাসিত পৃথিবীর তৃষ্ণা হরণের আশ্বাস দিচ্ছেন—

ওগো বিরহিণী গেল দুর্দিন

দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে

মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে

পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে

দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে।

কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে উপমাকে সফল করা হচ্ছে—তপস্যার সঙ্গে অগ্নির সংযোগ আছে আর গ্রীষ্মের সঙ্গে উত্তাপের। তাই নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন ধরণী তপস্বিনী—। কিন্তু বর্ষা আসছে তার আশ্বাস নিয়ে—

গাও জয় জয়, গাও জয় গান

ঢেউ তোলো স্বর সপ্তকে

বন পথে আসে মনোরঞ্জন

নয়নে পরাবে প্রেম অঞ্জন

সুধা দিবে চিরতপ্তকে—

কবিতাটি যেন বর্ষার সমস্ত জল সম্ভার নিয়ে আমারই হৃদয়ের উপর ঝরঝর ধারায় ঝরে পড়তে লাগল—আর মনের মধ্যে অনুদগত যে সব অনুভূতির বীজ ছিল তা যেন অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুরের মত উদ্গত করে তুলল। "সুধা দেবে চিরতপ্তকে" আমার সেই বালিকা মন তপ্ত ছিল না, শূন্য ছিল, সুপ্ত ছিল, তার উপর সুধার বর্ষণে যেন কোন অজ্ঞাত সুখ আশায় সে উন্মুখ হয়ে উঠল।

সেদিন এ কবিতাটি এত ভালো লেগেছিল যে এক বারেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সদাসর্বদা উচ্চৈঃস্বরে এই একই কবিতার আবৃত্তি বাড়ি-শুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করেছিল নিশ্চয়।

আর একটি দৃশ্য—"শেষ মিনতি" ধরণী বিদায়োন্মুখ বর্ষাকে যেন মিনতি করে বলছে, এখনই যেয়ো না। 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?' এখনই যাবে কেন?

আস্থায়ীর সঙ্গে একটি বালিকা নৃত্য করছে, তার লম্বা বেণী দুলছে, তার ওড়না উড়ছে—আর রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে—তিনিই পান্থ—রবীন্দ্রকাব্যে সব ঋতুই পথিক—বসন্তও পথভোলা পথিক, বর্ষাও চঞ্চল পান্থ—সব ঋতুরই একই রঙ্গ—এসেই বলে, যাই যাই—

আস্থায়ী থামল। পান্থ আবৃত্তি করলেন, "যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে বন্ধনডোর ছিন্ন হবে—" এমনি করে সবটা গানে, নাচে, অভিনয়ে মিলিয়ে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। একদিকে রসের লীলা ('ধৈর্য ধরো সখা ধৈর্য ধরো, দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর) কিংবা ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো—বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান……।' আকাঙ্ক্ষার প্রার্থনা অন্যদিকে—বৈরাগ্যের, ত্যাগের স্পৃহা—একদিকে এসো এসো। অন্যদিকে যাই যাই।

পায়ের কাছে নৃত্যময়ী বালিকা শেষ মিনতি জানাচ্ছে যে সে মালতী এখনই ঝরে যেতে চায় না। "ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা"…আর একটু থাকো আর একটু দাঁড়াও। শ্বাসরুদ্ধ করে সেই সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি দেখছি—ঐ বালিকার সঙ্গে আমি একাত্ম অনুভব করছি মনে হচ্ছে যেন আমিই চরণে প্রণতা! পরে জেনেছিলাম সে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা অমিতা। সে সেদিন আমায় বুঝিয়েছিল বেদনা কি করে সুন্দর হয়—'ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর…'

একটি নাচ বাবার খুব ভালো লেগেছিল। নীল শাড়ি পরা কুসুমা-ভরণা একটি মেয়ে নৃত্য করছিল স্বর্ণ কলস নিয়ে, পরিশীলিত তার ভঙ্গিমা—"এসো নীপ বনে ছায়াবীথিতলে।" গাড়িতে উঠে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ মেয়েটা কে রে, এত সুন্দর নাচল। আমি বললাম, "আমি শুনেছি ওর নাম শ্রীমতি হাঁথি সিং।" "হাঁথি সিং," বাবা চমকে উঠলেন, "বলিস কি! এমন ললিত লবঙ্গলতা, এমন লাবণ্য বিলাস—নাম কিনা হাতি!"

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে রবীন্দ্রনাথ যে নাচ শেখাতেন তিনি কি নাচের কিছু জানতেন? আমি বলি তিনি বসে বসেই নাচ শেখাতে

পারতেন। কিন্তু ঋতুরঙ্গ নাটকের শেষ দৃশ্যে আমি তাঁকে রঙ্গমঞ্চে নাচতে দেখেছি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ—"রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও, যাও, যাও গো এবার যাবার আগে—" সকলে একসঙ্গে তালে তালে নৃত্যময় হয়ে উঠলেন—রঙ্গীন আলো এসে পড়ে সেই নৃত্যগীত মুখর রঙ্গমঞ্চ আমার চোখে যে শোভা ধারণ করল—সে দৃশ্য পৃথিবীতে দেখবার আশা করিনি। দিনেন্দ্রনাথ যে অত স্থূলকায় তাও তাকে একটু বেমানান লাগল না—তিনি গলায় খোল ঝুলিয়ে নৃত্য করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তো অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বাউলের মূর্তি—তালের সমতায় রসলোকে উত্তীর্ণ হয়ে ছোট বড়র বিভেদ ঘুচে গিয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত ঐ দৃশ্য আমার মনকে আলোকিত, দ্রব ও বিষণ্ণ করে রেখেছিল। বিষণ্ণ, কারণ যে জগতের আভাস পাচ্ছি সে জগতে পৌঁছবার আমার উপায় নেই

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে
পাষাণ গুহার কক্ষে নির্ঝর ধারা জাগে ......

এমনি করে রূপে রসে গানে একটি একটি করে তারা ফুটতে লাগল এই আনন্দহীন, আচারে বিচারে শুষ্ক দেশের হৃদয় আকাশে—

তপতী অভিনয়

ওঁ

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা—

কল্যাণীয়েষু

আগামী শুক্রবারে কলকাতায় পৌঁছিয়ে সেইদিনই সায়াহ্নে তোমাদের সভায় কিছু বলবার চেষ্টা করা যাবে। সেদিন ছাড়া আর এক দিনও সম্ভব হবে না, এই রইল কথা। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

ইতি ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯
তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

. তোমার ১৩ই সেপ্টেম্বরের চিঠি আজ ১৫ই পাওয়া গেল!

এরপর ১৯২৯ সালের শেষের দিকে রবীন্দ্র-পরিষদে কবির শুভাগমন হয়। বাবা অনেকদিন ধরেই কবিকে 'রবীন্দ্র-পরিষদে' আনবার চেষ্টা করছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি সঞ্চয় করেছে এবং ঐ কলেজেই প্রতিস্পর্দ্ধী শরৎ পরিষদ স্থাপিত হতে চলেছে। অনেকেই বলছেন রবীন্দ্র

পরিষদ যদি হয় তবে শরৎ পরিষদ হবে না কেন! এতেই বোঝা যাবে রবীন্দ্র পরিষদ কতখানি খ্যাতি অর্জন করেছিল। নিয়মিতভাবে প্রতিপক্ষে এক একখানি গ্রন্থ ধরে আলোচনা চলত। বলাকা সম্বন্ধে আলোচনাটি রবিদীপিতা গ্রন্থে পরে প্রকাশিত হয়। কবির পরিমণ্ডলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অপূর্বকুমার চন্দ ও অমল হোম রবীন্দ্র-পরিষদে আসতেন। সোমনাথ মৈত্র তো নিয়মিত আসতেন! রবীন্দ্রনাথকে ঐ পরিষদে আনতে বাবা ও তাঁর ছাত্রদের আগ্রহ তো স্বাভাবিক।

তপতী অভিনয়ের কথা শোনা যাচ্ছিল। ঋতুরঙ্গের পর এই আর একবার কলকাতায় অভিনয় হবে—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাজা সাজবেন। তপতী রাজা-রানীর সংশোধিত সংস্করণ। কথা স্থির হল ২৬।২৮।২৯ তপতী অভিনয় হবে, ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে কবি আসবেন। সাজ সাজ রব পড়ে গেল ছাত্রদের মধ্যে—কলকাতা শহরের গুণী, মানী ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হলেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য তখন কলকাতায় সুধী সমাজে গভীর আগ্রহ। যারা সহজে আমাদের অর্থাৎ আমার পিতাকে পাত্তা দিতে চাইতেন না তাঁরাও কার্ডের জন্য ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল এবং আজ অনেক দূর থেকে এসব ছোটখাট ঘটনাও রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে বুদবুদের মত ভেসে উঠছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গন্ধটুকু ধুয়ে ফেলে ঐ সময়ের পরিবেশ বোঝাবার জন্য এর একটা প্রয়োজনও আছে। আশা করি পাঠকরা এই ঘটনার উল্লেখকে সেই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নিয়েই দেখবেন। আজকে আমার কাছে অন্তত সমগ্র ঘটনাটার মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই, বরং একটু কৌতুকসুখ আছে।

যেদিন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র পরিষদে বিকাল বেলায় আসবেন তার আগের দিন রাত্রি এগারটার সময় মা আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, "নিচের ঘরে রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র এসেছেন ; ওরা বোধহয় বলছেন কাল রবীন্দ্র পরিষদে কবির আসা সম্ভব নয়, এক্ষুণি একটা ভীষণ কাণ্ড হবে।" আমরা মাতাপুত্রী দৌড়ে এসে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরের উত্তেজিত বিতর্ক শুনতে লাগলাম। রথীন্দ্রনাথ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছেন, অন্য দুজন সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। প্রশান্তচন্দ্র বলছেন, "কালকের দিনটা আপনাকে বদলাতেই হবে। জনসাধারণ চাইছে আর একদিন অভিনয় হোক।"

সুরেন্দ্রনাথ—"বেশ তো! হোক না, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু অভিনয় হোক।"

"পরশু ঘর পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন বাইরের ষ্টেজে হওয়া চাই।"

"তাহলে আর কি করা যাবে আপনার জনসাধারণ চাইছে অভিনয় হোক আমার জনসাধারণ চাইছে কবি রবীন্দ্র পরিষদে আসুন। আমার কয়েক শো কার্ড বিলি হয়ে গেছে তার কি হবে?"

"আপনি ঠিকানাগুলো দিন, আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসব।" একজন কথা বলছেন ধীরে ধীরে মোলায়েম পরিশীলিত ভঙ্গীতে। আর একজনের পূর্ব বঙ্গীয় মেজাজের তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান।

"আপনি কি আমাকে আহাম্মক পেয়েছেন? এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাকে অপদস্থ করবেন?"

এই ভাবে বিতর্ক অগ্রসর হতে লাগল, উত্তরোত্তর স্বর চড়তে ও ভাষা তীক্ষ্ণ হতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "আপনি কবির কোনো চিঠি এনেছেন? আনেন নি! রবীন্দ্রনাথ আপনার সম্পত্তি? রবিকে কুক্ষীগত করার উৎসাহ তো ভালো নয়।"

প্রশান্তচন্দ্রর ফর্সা সুন্দর মুখ রক্তবর্ণ হল। তিনি বললেন, "আপনি আমায় বাড়িতে পেয়ে অপমান করছেন?'"

সুরেন্দ্রনাথ নির্বিকার—"তা মশাই আপনার সঙ্গে দেখা হল বাড়িতে; অপমান করতে কি রাস্তায় নিয়ে যাবো?" কথাটা বলেই সম্ভবত লক্ষ্য পড়ল আর একটি মানুষের দিকে যিনি একপাশে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। শান্ত, নম্র ও নির্বিকার তাঁর মুখশ্রী ভদ্রতার প্রতীক—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি কোনো কর্কশ কথা, কলহ বা 'showdown' সহ্য করতে পারেন না। নিজে কখনো উচ্চগ্রামে গলা তোলেন না। সুরেন্দ্রনাথ সেই ধীর স্তব্ধ মানুষটিকে দেখে লজ্জিত হলেন। প্রশান্তচন্দ্রকে বললেন, "আপনি কি জন্য এই নিরীহ, ভদ্র মানুষটিকে ঘুম থেকে তুলে কষ্ট দেবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন? রথীবাবু, আজ প্রথম আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন—এ অপ্রিয় ব্যাপারের জন্য ক্ষমা করবেন।"

যাক, শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত দিনেই তাঁর আসা হল রবীন্দ্র পরিষদে। আমার যতদূর ধারণা রবীন্দ্রনাথ এ ঘটনার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না কারণ কোনো দিন তিনি সেদিনের কথা আমার কাছে উল্লেখ করেন নি। তবে রথীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আমায় বলতেন যে সে সেদিনের কথা মনে পড়লে তাঁর হৃৎকম্প হয়। রবীন্দ্র পরিষদে কবির বক্তৃতা সেদিনকার বহু আলোচিত বিষয়টি নিয়ে, সাহিত্যের স্বরূপ কি ও সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি

কি। এই বক্তৃতা সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে তাই আর সবিশেষ উল্লেখ করলাম না। তার চেয়ে 'তপতী' নাটকে রবীন্দ্রনাথকে কেমন দেখেছিলাম তাই বলি।

যদিও ঋতুরঙ্গ ও তপতী অভিনয়ের মধ্যে বেশ কিছু দিনের ব্যবধান আছে তবু আমি প্রায় একসঙ্গেই দুটি অভিয়ের কথা উল্লেখ করছি কারণ মাত্র এই দু-বারই রবীন্দ্রনাথকে আমার অভিনয় করতে দেখা। এছাড়া পরে চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা ইত্যাদিতে তিনি একপাশে বসে থাকতেন ষ্টেজের উপরে। অবশ্য একবার শ্রীমতী দেবীর নৃত্য সহযোগে কবিতা পাঠ—দে দোল্ দোল্—অপূর্ব সৃষ্টি দেখেছি।

তপতীতে কবি রাজা সাজেন। দাড়ি উল্টিয়ে বেঁধে কালো রং করে দেওয়া হয়েছিল, একেবারে যুবকের তারুণ্য এসে গিয়েছিল তাঁর প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ দেহে। বাহুল্যবর্জিত ষ্টেজ, রাণী সেজেছিলেন অমিতা ঠাকুর। ইনি অজিত চক্রবর্ত্তীর কন্যা ও ঠাকুর বাড়ির বধূ। আমাদের চেয়ে সামান্যই বড়। তপতী কাহিনীতে নারার উদ্বোধন চিত্রাঙ্গদার মতই। যখন বিপাশা, এক নারী অন্য নারী তপতীকে বলছে "ওই ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না। কিছু নিলে না, একি নিষ্ঠুর নিরাসক্তি! ......তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী।"

ঐ ভুবনমোহন রূপ কথাটা ভাল লেগেছিল ; যাকে বলা তাকে শোভা পেয়েছিল। রাজার উগ্রপ্রেম যখন হাহাকার করে উঠল, "তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী। শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি?" ... ..কিংবা শেষ দৃশ্যে পরদার আড়ালে রঙীন-আভা আগুনের মত ..সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজা পিছন দিকে হাত দুটি সংবদ্ধ করে, যেমন রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অভ্যাস......মৃত্যুর কাছে পরাজিত, চিতাগ্নির সামনে অভিভূত। আশ্চর্য সুন্দর অভিনয়।......এখানে দৃশ্যপট ওঠাপড়া ছিল না, পিছনে পট ছিল না, এই অভিনবত্বে সকলে আশ্চর্য হয়েছিল। থিয়েটারে পর্দা পড়বে, কিছুক্ষণ চানাচুর খাওয়া হবে, তারপর হু হু করে পর্দা সরবে, কখনো আটকে যাবে, এতেই অভ্যস্ত ছিল তখনকার মানুষ। এই সব হৈ চৈ বন্ধ হওয়ায় নিরলঙ্কার ষ্টেজ, অপরূপ বাচনভঙ্গী ও নৃত্যগীতে মিলে তপতী সত্যিই অভিনব সৃষ্টি। কোথায় রাজা রাণী কোথায় তপতী। অমিতার বোন সুমিতা বিপাশা সেজে ছিল। তার নাচ...প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে......বড়ই জনপ্রিয় হয়েছিল। গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে চালাতে গাইছে—আমি শুনেছিলাম।

তপতী অভিনয়ের পর একটুক্ষণের জন্য তিনতলায় গিয়েছিলাম—দেখলাম দাড়ির কালি তুলতে হুলুস্থুল চলছে।

তপতী অভিনয় ঠিক কোন তারিখে হয়েছিল বলতে পারি না। তবে এই প্রসঙ্গে বাবাকে লেখা আর একটি চিঠি আছে—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত ২১শে সেপ্টেম্বরের যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেচেন সেটা ভুল এবং অসম্ভব। ২৭শে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনয়। তার বেশি আগে যাওয়া চলবে না—কেননা এখানকার অধ্যাপক এবং ছাত্ররাই অভিনেতা। তাছাড়া কলকাতার স্বাস্থ্য ভালো নয়। আমাদের অভিনয় ২৯শে পর্যন্ত। তার পূর্বে হতে পারবে কিনা সন্দেহ। কেননা শেষ পর্যন্ত প্রবল বেগে রিহার্সেল চালাতে হবে। ১লা অক্টোবরে যদি তোমাদের পক্ষে অসম্ভব না হয় তাহলে সেই দিনটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

ইতি ২৭ ভাদ্র ১৩৩৯
তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকোতে শিল্পী ভ্রাতারা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তুই একদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেম একটা সভায় বক্তৃতা করে ফিরে এসেছি কথাটা সত্য। তোমাকে খবর দিইনি কেন জিজ্ঞাসা করেচ। আমার কৈফিয়ৎ এই যে খবর দেবার চেয়ে বেশি কিছু দেব এই ছিল অভিসন্ধি। অর্থাৎ, সশরীরে দর্শন দেবার ইচ্ছা ছিল। মনের উৎসাহে ভুলে গিয়েছিলাম যে বেশির জন্যে আকাঙ্ক্ষাটা সম্ভবপরের শত্রু। মহাদেবকে আশুতোষ বলা হয়েচে তার কারণ উপস্থিত তাঁকে যা দেওয়া হল অল্প হলেও তাতে তিনি রাজি। বেশি দেব বলে আশা দিতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে ফাঁকি দিয়ে থাকে। আমি সেই দলের। বেশি নেবার ইচ্ছাটাও যেমন লোভ, বেশি দেবার ইচ্ছাটাও তেমনি লোভ। এই লোভের তাড়নায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে মরেচি—সেই ব্যস্ততায় হারিয়েচি অনেক স্বল্পকে অর্থাৎ সুন্দর

অল্পকে। এই সুন্দর অল্পকে দেবার শক্তি নিয়ে কতলোক পৃথিবীকে রমনীয় করেচে—যেমন তৃণ—সে বট গাছের মতো বেশি দেবার চেষ্টা করে না। তবু সে কৃতার্থ—ধরণীকে মরুর আক্রমণ থেকে সেই বাঁচিয়েছে। ৮ই মাঘে কলকাতায় যাব, বিশু ডাকাতের মত আগে থাকতে খবর দিলুম।

ইতি—৫ই মাঘ ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অপূর্ব চিঠিটা বাবা অনেককে শুনিয়েছেন। বাবা বলতেন—কবিতা অনেক কবি লিখেছে সে তো ভেবেচিন্তে লেখা কিন্তু এমন চিঠি লিখতে পারে ক'জন—কলমের মুখে উপমা যেন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। এই চিঠিতে একটা কথা ব্যবহার হয়েছে "সুন্দর অল্প" এটা আর কোথাও শুনিনি। সম্প্রতি ইয়োরোপে একটা কথা চলছে Small is beautiful। এই চিঠিটা আবার দেখে সে কথা মনে পড়ল।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে সাধারণত আমায় খবর দিতেন এবং আমিও দেখা করতে যেতুম। ভবানীপুর থেকে চিৎপুর যাওয়া তখন প্রায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম নয় যেন তিনটে গ্রাম পেরিয়ে যাওয়া। আমাদের তখন একলা ট্রামে বাসে চলার অভ্যাস ছিল না। যদিও ভীড় কিছুই ছিল না—বাসগুলোর সব ঠাকুর দেবতার নাম—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা এই সব নামও ছিল। একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে—সে সময় শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্রকে নিয়ে অনেক গল্প রটনা ছিল। তার মধ্যে একটি, একদিন উনি বাসে বসেছেন, একজন তাঁকে বল'ল করেছেন কি, আপনি যে উর্বশীর ঘাড়ে বসেছেন। অর্থাৎ, বাইরে যেখানে উর্বশী লেখা আছে ঠিক সেখানে। শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন খাঁটি ব্রাহ্ম এবং অন্য জায়গায় বসলেন। অর্থাৎ তখন বাসে বসা তো যেতই, স্থান বদলেরও অসুবিধা ছিল না।

মেয়েরা ট্রামে বাসে বড একটা চড়ত না। ক্বচিৎ কখনো চড়লেও চলনদার সঙ্গে থাকত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে আমি একটি ফিটন গাডি কিংবা পাল্কিগাড়ি করে কাকাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হতাম। কখনো বা বাবা নিয়ে যেতেন। রমেশ মিত্র রোডের প্রান্তে চরকডাঙ্গার কাছাকাছি একটা ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ড ছিল। ফিটনগাড়ি পেলেই আমি খুশী হতাম। ওটা চলেও দ্রুত, দেখতেও ভালো।

অতি প্রত্যূষে উঠে যখন রওনা হতাম—চলতে চলতে পূব দিক রাঙা হয়ে

সূর্য উঠত—সেই আলো পড়ত আমার মনের গভীরে—আগেই লিখেছি—তখন বিচিত্রার প্রথম কবিতাটা খুব পড়তাম—"ছিলাম যবে মায়ের কোলে, বাঁশি বাজান শিখাবে বলে, চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি, বিচিত্রা হে বিচিত্রা—"এর মধ্যে একটি অনুপ্রাস ঝংকৃত যুগ্মপদ "বারণহীন নাচিত হিয়া কারণহীন সুখে"—আমার অন্তরে অর্থবান হত। প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে একটা চিহ্ন আছে তাই দিয়ে পথের মাপ করতুম। রসা রোড দিয়ে চৌরঙ্গী হয়ে বেন্টিক স্ট্রীট পার হয়ে চিৎপুর রোড তারপর ডান দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। ঘোড়ার ক্ষুর ঠক্ ঠক্ করে চলত। আর আমার বুক ধ্বক ধ্বক করত। গলির মোড়ের বটগাছটির কাছে এলে হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক ব্যবহার করত। কী দৈন্য নিয়ে সামান্য এক বালিকা সেই মহামহিমান্বিত উপস্থিতির সামনে পৌঁছাবে। কেনই বা যাচ্ছে—এই প্রশ্নের সে কোনো উত্তর পেত না। বহুদিন পরে এই সময়ের কথা মনে করে একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

> কেন এ আকাঙ্ক্ষা জাগে কোনে তার পাইনা উত্তর
> ধূম্রলীন প্রদীপের কেন এ আরতি নিত্য মোর।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে সে সময়ে বেশির ভাগ তিন তলায় বাস করতেন। লাল বাড়ি ও আসল বাড়ির মাঝখানে সঙ্কীর্ণ ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উঠে সাঁকো পার হয়ে বড় বাড়ির বারান্দা। পাশাপাশি তিন খানি ঘর। মাঝখানে একটি ঘরে তাঁর লেখবার টেবিল চেয়ার ও সামান্য আসবাব। তারপরের ঘরে জাপানী বিছানা তাতামি পাতা রয়েছে। তারপরের ঘরে পালঙ্ক আর জলের কুঁজো ছাড়া কোনো আসবাব নেই। পাশে স্নানের ঘর—তখন পাম্প ছাড়াই কলকাতা করপোরেশনের জল তিন তলায় পাওয়া যেত। স্নানের ঘরে বড় পিতলের গামলায় জল। পিতলের জগ সোনার মত উজ্জ্বল—কোনো খুঁটিনাটি জিনিষে সাজানো নয় সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার-শুভ্র পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরের আসবাব ক্রমাগতই ভ্রাম্যমান। আমি অবাক হয়ে দেখতুম এ-ঘরের সেই বিরাট জাপানী বিছানা আজ এক ঘরে আছে কাল অন্য ঘরে চলে গেল।

ভোরবেলা পৌঁছলে তাঁকে একা পাওয়া যেত, টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে লিখছেন। সহাস্য সম্বর্ধনা জানাতেন—"এস, এস—"। দু-একটা কথার পর তিনি লিখতেন আমি চুপচাপ চেয়ারের পিছনে বসে থাকতাম। সেখান

থেকে লক্ষ্য করতাম কত রকম মানুষ কত বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা করতে আসছে—সমাজের শীর্ষস্থানীয় থেকে আরম্ভ করে আমার মত অকিঞ্চনের দল।

প্রথম যেদিন অবনীন্দ্রনাথকে দেখি, আশ্চর্য হয়ে যাই। হাতে একটি কারুকার্য খচিত রূপার পানের কৌটো—মুখের পান বাইরে ফেলে 'রইকা' বলে ঘরে ঢুকতেন। তখনকার দিনে গুরুজনের সামনে পান খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। খুড়োও 'এস অবন এস', বলে প্রায় সমবয়সী ভাইপোকে সমাদরে ডাকতেন। একদিন আলোচনা হচ্ছিল লোক শিল্প সম্বন্ধে—আমার মনে পড়ে সেদিন সেখানে সুনয়নী দেবীর পটের মত ঢঙে চিত্রিত আশ্চর্য সুন্দর ছবিগুলি ছিল।

ওঁরা বলছিলেন সুনয়নী দেবী ফিরে গেছেন সেই উৎসে যেখানে মানুষ অকৃত্রিম স্বভাব-সৌন্দর্যে উদ্বুদ্ধ। কেন লোক-শিল্পের চরিত্রে দেশে দেশে ঐক্য, কেন সে চির নবীন—এ বিষয়ে সেদিন দুই শিল্পীর যে কথা হচ্ছিল আমি ত' ভালো করে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু লোক শিল্প দেখবার চোখ তৈরী হচ্ছিল। সেদিন এই ছবি প্রসঙ্গে কতগুলি বাউলের গানের কথা হচ্ছিল কিন্তু পটের ছবি ও বাউলের গানের সঙ্গে নাগরিক ও পরিশীলিত শিল্পের কোথায় তফাৎ সে সব কথা লিখে রাখবার মত তখন শিক্ষা, বুদ্ধি, বয়স কিছুই ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সেদিন যাঁদের দেখতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ আর, তাঁদের ভাই সমরেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পী ব্রতীন্দ্রনাথ। ব্রতীন্দ্রনাথ সুন্দর ছবি আঁকতেন। তাঁর চিত্রে সজ্জিত রবীন্দ্রনাথের লেখা বিচিত্রা-য় প্রকাশিত হচ্ছে। গগনেন্দ্রনাথকে কিছুদিন চলে ফিরে বেড়াতে আমি দেখেছি—তাঁর আঁকা অপূর্ব ব্যঙ্গ চিত্রগুলি তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—তাঁর ত্রিকোণ চিত্রগুলিও অভাবনীয় লাবণ্যময়। মনে হয় তাঁর মত ব্যঙ্গচিত্র তখনও আর কেউ আঁকে নি। কিন্তু রাজশেখর বসুর মতই গগনেন্দ্রনাথের হাস্যরস তাঁর আকৃতি বা আচরণে প্রকাশ পেত না—গম্ভীর, ধীর, স্থির, সৌম্য চেহারা। অল্প দিন পরই হঠাৎ তাঁর স্ট্রোক হল—এবং তারপর থেকে বৈঠকখানা বাড়ির জানলায় ছবির মত তাঁর মূর্তি একটি চির পরিচিত দৃশ্য—চুপ করে দূরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন, সামনে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে—সম্ভবত তাঁর নাতনী—স্থির বসে থাকত। এই দুজনকে গগনেন্দ্রনাথের নিজেরই আঁকা কোনো রূপকথার দৃশ্য মনে হত—যেন কোন 'পাথর পুরী'তে দুজন মানুষ পাথর হয়ে গেছে।

সেই আশ্চর্য সুন্দর বৈঠকখানা বাড়িটি তার স্মৃতি সম্ভার নিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতন—পৌষমেলা

আমি এর আগেই আমার ভবানীপুর থেকে চিৎপুর ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখেছি। কিন্তু শুধু জোড়াসাঁকো নয় সুযোগ পেলেই শান্তিনিকেতন যাবার ইচ্ছা আমার ক্ষেপিয়ে বেড়াত। যাই কি করে? তখন মেয়েরা অর্থাৎ বয়স্ক মেয়েরাই চলনদার ছাড়া চলতে পারতেন না আর আমি তো বালিকা মাত্র! তাছাড়া বাবা আমাকে সহজে ছাড়বেন না। পড়াশুনো নষ্ট করে যখন তখন যাওয়া চলবে না কোথাও। তাই বাবা যেই কলকাতার বাইরে যেতেন অমনি আমি সঙ্গী জুটিয়ে রওনা হতাম শান্তিনিকেতনের দিকে। ইতি মধ্যে ১৩৩৪-এর পৌষ-মেলায় একটি ছোটখাট দল জুটিয়ে আমি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিলেন আমার দাদামশায় ও আমার সমবয়সী একটি আত্মীয়া। সাতই পৌষের যাত্রীর ভিড়ে তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টগুলি ঠাসা। তখন যদিও পদমর্যাদার স্তর বিভাগ ট্রেনের কামরার নম্বরের উপর নির্ভর করত--শান্তিনিকেতনের যাত্রীরা সব তৃতীয় শ্রেণীতেই যেতেন—কেন জানি না রবীন্দ্রনাথ কাউকে কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী করান নি বটে তবে তাঁর চারপাশে বিত্তহীনের দলই জুটিয়েছিলেন। ঐ গাড়িতে ছিলেন স্বনামধন্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এবং তাঁর কয়েকটি ছাত্র। আমার দাদা-মশায় হেমেন্দ্রনাথ রায় তাঁর একমাত্র পুত্র হিমাংশু রায়কে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন তাই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ থাকলেও তিনিও বোধ হয় সেবার প্রথম সেখানে যাচ্ছিলেন কিংবা, অনেক দিন পরে। আমাদের কামরাটি জমে উঠেছিল—আমার দাদামশায় প্রধানত বৈজ্ঞানিক হলেও বিভিন্ন ভাষার ও দেশের সাহিত্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল—উর্দু গজল, পারসিক শেরও জুৎসই ভাবে লাগাতেন। ওদিকে ক্ষিতিমোহন সেন—ব্রাত্য ঋষিদের মন্ত্রের উদ্গাতা—তাঁর অসামান্য মধুর পূর্ববঙ্গীয় টানে দোঁহা বলছেন ও ব্যাখ্যা করছেন আর এদিকে হেমেন্দ্রনাথ সেদিন আওড়াচ্ছেন পাশ্চাত্য কবিতা—কীটস ও ব্রাউনিং। দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলির বাচনিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোনো মানবিক সম্পদে ভরে তুলছে সকলের মন। সারা পথ গল্প-গুজবে আমোদে আহ্লাদে কেটেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর রসিকতার জন্য বিখ্যাত। সেদিন তার কিছু কিছু নমুনা পেয়ে গেলাম।

স্টেশনের নামগুলি নিয়ে যে পরিহাস করছিলেন সেটুকুই মনে আছে—বোনপাস স্টেশনে গাড়ি ঢুকতেই বললেন—"এখানে সব ভাই ফেল!" আর গুসকরায় ঢুকতেই 'মসকরা'র সঙ্গে মিলিয়ে একটি ছড়া বলেছিলেন।

সাতই পৌষের ভিড়—স্টেশনে লোকারণ্য! যদিও খবর দেওয়া ছিল তবু আমাদের জন্য কেউ এসেছে মনে হল না। দাদামশায় বিরক্ত করতে লাগলেন তাঁর কোনো পরিচিত ব্যক্তি আছেন, আগে সেখানে চলো বলে। আমি তো ঠিক করেছি আগে তো উত্তরায়নে যাই। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

তখন কবি নিরুপমা দেবী শান্তিনিকেতনে থাকতেন। তাঁর মাটির কুটীর খানির সামনে দাদামশায়কে তাঁর লটবহর সহ পরিত্যাগ করে আমি ও আমার আত্মীয়া মালু উত্তরায়ণের দিকে চললাম। সেই মাটির ঘরটি বেশ প্রশস্ত– তাতে একটি ঢালা বিছানায় অনেক লোক শুয়ে ছিল। পরমাসুন্দরী নিরুপমা দেবী 'দাদা' 'দাদা' বলে দাদামশায়কে ডেকে নিলেন—এইটুকুই আমার স্মৃতি আছে।

এক বছরে উত্তরায়ণ অনেকটা বড় হয়েছে। দোতালার সিঁড়ি হয়েছে ও নিচে একখানি বড় ঘর এবং উপরে একটি বড় ঘর হয়েছে। উত্তরায়ণের হাতায় ঢুকতে ঢুকতেই দেখি অমিয়বাবু (চক্রবর্তী) গলায় পেঁচান চাদর ও ধুতি-পাঞ্জাবীতে সজ্জিত—আমাদের দেখেই বললেন—এই যে কোন্ ট্রেনে এলেন, দুবার আপনাদের জন্য গাড়ি গিয়ে ঘুরে এসেছে—আমিও গিয়েছিলুম —আর শেষ ট্রেন তো কখন এসে গেল—আমরা ভেবেছি আপনারা আজ আর এলেন না—। আসল কথা দাদামশায়ের খামখেয়ালীপনার জন্য এর ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। অমিয়-বাবু বললেন, গুরুদেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন—এক সঙ্গে খাবেন বলে, —এখন হয়ত শুয়ে পড়েছেন। চলুন দেখি। —তখন সেই সুরঙ্গের মত বিস্ময়কর সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম তিন জনে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, চকচকে কাঠের দরজা, অমিয়বাবু একটু ঠেললেন। তারপর বললেন, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার মনে হল যেন একটি দেউলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ওটা খোলবার তপস্যা আমার নেই। দাদামশায়ের জন্যই এমনটি হল—আজ আর দেখা হল না। আজকের তারিখটি বৃথা গেল। প্রতিমাদেবীরা সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না—ভৃত্যরাজতন্ত্র চলছে। আমার তো এ বাড়িতে ঢুকলেই আকাশ জোড়া লজ্জা পেয়ে বসে, তাই বললাম রাত্রে

আমরা খেয়ে এসেছি। নিরীহ অমিয়বাবু বিশ্বাস করলেন এবং ভৃত্যদের কাছ থেকে একটি লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে বললেন চলুন পৌঁছে দিই—আপনারা থাকবেন কোণার্কে। কোণার্কের মাঝখানে একটি চওড়া জায়গার দুপাশে দুটি ঘর। একটিতে অন্য অতিথি আছেন। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ, অন্ধকারে মোরামের উপর জুতো পায়ে চলার মচ্‌মচ্‌ শব্দে নৈঃশব্দকে যেন বাড়িয়ে তুলে আমরা তিনটি প্রাণী কোণার্কে এসে পৌঁছলাম। অমিয়বাবু আমাদের দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। ভিতরে ঢুকে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে দেখি দুটি খাটের উপর মোটা মোটা দুটি গদী আছে। কুঁজোতে জল আছে—কিন্তু বালিশ বিছানা কিছু নেই। সম্ভবত তখন সবাই বিছানা নিয়ে যাতায়াত করত।

শান্তিনিকেতনে আসবার সময় আমার অবস্থা নাসাগ্রে নিবদ্ধ-দৃষ্টি তপস্বীর মত এক রোখা—বিছানার কথা ভাবছে কে?

দাদামশায় পেল্লায় একটি বিছানা এনেছেন কিন্তু আমরা আনিনি—যা হোক কোন মতে সেই প্রচণ্ড শীতে আমরা দুই বালিকা গুটিসুটি মেরে চাদর জড়িয়ে পড়ে রইলাম—। রাত যেন আর কাটে না। মশাও তেমনি। শান্তিনিকেতনে তখন কী মশাই ছিল! ঝাঁক বেঁধে যখন ঘুরতে থাকত মনে হত যেন তুলে নিয়ে যাবে। শেষ রাতে উঠে স্নান সেরে তৈরী হচ্ছি এমন সময় দরজায় করাঘাত—কৈ গো তোমরা মন্দিরে যাবে না?

রাত্রির তপস্যার ফল ফলল—দরজা খুলেই দেখি সামনে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে—এ যে অভাবনীয়! যাঁর বন্ধ দরজার সামনে থেকে কাল ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসেছিলাম তিনি স্বয়ং আমাদের দ্বারে এসে করাঘাত করলেন।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে অমল হোম বেরিয়ে এলেন—রবীন্দ্রভক্ত বলে তিনি সুপরিচিত। অমলবাবুর মত অমন সুসজ্জিত পুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় অমিত রায়ের ধুতি পাঞ্জাবীর বিশেষ সজ্জা বর্ণনায় অমলবাবুর প্রভাব আছে। অমলবাবু তখন বোধহয় সদ্যবিবাহিত সঙ্গে ইলাদেবী ও তরুণী ভগ্নী বীণাদেবী। পরিপাটি করে সজ্জিত মাথায় কাপড় দুদিকে পিন দিয়ে আঁটা ইলাদেবী দুই পুরুষের ব্রাহ্মিকা। তখনকার দিনে বেশভূষা দেখে বোঝা যেত কে ব্রাহ্ম। শুধু বেশভূষা নয় আচার আচরণ ধরণ ধারণ সব কিছুতেই তার চিহ্ন থাকত। বছর পঁচিশ আগে কেউ আমাকে বলেছিলেন চেহারা দেখে বোঝা যায় কে

কমিউনিষ্ট এবং দু একটি প্রমাণও দিয়েছিলেন। কথাটা অসম্ভব নয়। ভাবনা চিন্তার ধারা কেবল কথায় নয় আকৃতিতেও ছাপ রেখে যায় হয়ত।

আমরা ক'জনে উত্তরায়ণের দিকে এগুতে লাগলাম রবীন্দ্রনাথের পিছন পিছন। হঠাৎ ইলাদি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা চুল আঁচড়াও নি কেন? চিরুণী আনোনি বুঝি?—কি করে যে এমন সঠিক অনুমান করলেন বুঝতে পারলুম না—আমরা তো তখন মরমে মরে গেছি। ইলাদি হাসতে লাগলেন—হাঃ হাঃ, গুরুদেবকে দেখার উৎসাহে বেচারারা চিরুণীই আনেননি। আমরা তো ভাবছি ধরণী দ্বিধা হও!

মন্দিরে সেদিন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে উপাসনা করতে শুনলাম—ক্ষিতিমোহন সেনও ছিলেন—পূজার আয়োজন উপাচারের দৃশ্য একই। ফুল চন্দন ও ধূপ দীপ আলপনা সবই আছে নেই শুধু বিগ্রহ। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা এর পূর্বে আমি অনেক শুনেছি। সে নিরলঙ্কার তত্ত্ব কথার কচকচি একটু পরে অনেকেরই অসহ হতে দেখেছি—যাঁরা ভক্তি ভরে শুনতেন তাঁরাও দীর্ঘ বক্তৃতা হলে সমালোচনা করতেন। বিশেষত পরম করুণাময় নিরাকার ব্রহ্মের পাদপদ্মে প্রণতি জানান বিষয়ে বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল—নিরাকারের পা কোথা থেকে আসে! ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে হিন্দুছেলেদেরও ভীড় হত সে সুধাকণ্ঠের গানের তৃষ্ণায়।

কিন্তু সেদিন সুর, গান, গানের বাণী ও বক্তৃতা মিলে আমার বুকের ভিতর কাঁপতে লাগল। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু বাড়ি থেকে এসেছি সেখানে গান জীবনের অঙ্গ নয়। পূজাও সকলকে নিয়ে নয়, ব্যক্তিগত পূজা বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলিত—ত্রিপত্র বিল্বপত্র না হলে শিবের পূজা হবে না। দিনের পর দিন বৃদ্ধা প্রৌঢ়াদের পূজা দেখেছি। ভক্তির চিহ্ন বড় একটা দেখিনি। পূজার আসনে বসে তাঁদের ভাঁড়ার ঘরের কর্তৃত্ব চালিয়ে যেতে দেখেছি। 'জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং' ইত্যাদি মন্ত্র বলতে বলতে—এই দুধের বালতিটা তুলে রাখ বিড়ালে মুখ দেবে, বলতে শুনেছি। আবার দুর্গা প্রতিমার সামনে করজোড়ে চণ্ডীস্তব করতে শুনেছি কিন্তু আমার মনে কোনো অধ্যাত্ম উপলব্ধি জাগেনি। কিন্তু সেদিন শিশিরসিক্ত কুসুমের সঙ্গে ধূপের গন্ধ মেশান প্রভাত, সামনে দিব্য উপস্থিতি আর অনেকগুলি সুকণ্ঠের গান মিশে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা আমার তরুণ অস্ফুট মনের উপর মেঘবিদীর্ণ সূর্যরশ্মির মত ঝরে পড়ছিল—আমি এক অচেনা জগতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যাঁরা গান করছিলেন তাঁদের কাউকেই আমি

চিনতাম না। কেউ একজন, যতদূর মনে পড়ে একলা গম্ভীর গলায় এস্রাজের সঙ্গে একটি গান গাইছিলেন। হতেও পারে তিনিই দিনেন্দ্রনাথ। গানটি—'এ হরি সুন্দর তেরে চরণ পর শির নমে' তার মধ্যে দুটি লাইন—বন বনমে ঢুঁড়ত ঢুঁড়ত গিরি গিরিমে উন্নিত উন্নিত সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, সাগর সাগর গম্ভীর এ.........গানের কথাগুলি একটু অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কিন্তু সেই সুরের ধ্বনি নতমস্তক শ্রোতাদের পেরিয়ে, রবীন্দ্রনাথের উন্নত ঋজু মাল্যচন্দন শোভিত শরীরের দৃশ্য মিলেমিশে যে ভাব সৃষ্টি করেছিল আমার কাছে তা ভক্তির ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির অভিজ্ঞতা।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি সিঁড়ির উপর দাদামশায় কবিকে ধরেছেন—তখনই ভয় পেয়েছি, দাদামশায় কবিকে কী বলবেন না বলবেন কে জানে। যা ভেবেছি তাই। দাদামশায় বলতে সুরু করেছেন এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা ছোট কন্যাটির বিবাহ। সুপাত্র জোটে না, কবির জানা যদি কোনো পাত্র থাকে ইত্যাদি। আমি তো মরমে মরে যাচ্ছি—কোনো রকমে পালাতে পারলে হয়। দাদামশায়কে তাড়া দিয়ে সরিয়ে এনে বলি এঁর সঙ্গে তুমি এই সব কথা সুরু করেছো? দাদামশায় বললেন, কেন কী দোষ হল, রুবি লুবি ফুল দিদিমণি সুন্দরী ছোট বৌ? কবিকে কি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়নি। মেয়ের বিয়ের জন্য হয়রাণি হতে হয় নি? পণ দিতে হয়নি? মেয়ের বাপের দুঃখ উনি বুঝবেন না কেন? ওঁর কাছে কত লোক আসে যোগ্য পাত্রও তো আসতে পারে? তোমরা কবিতায় কথা কও। তোমার পদ্য আমার গদ্য। আমাদের সব ইউটিলিটি তোমাদের সব বিউটি।—

আমি তখন একেবারেই জানতাম না যে রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই সামাজিক পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পাননি তাঁকেও পরমা-সুন্দরী প্রথমা কন্যার বিবাহ নিয়ে কম দুঃখ ভোগ করতে হয়নি। তখন তো বটেই এখনও যাঁর কন্যা হয়েই জন্মাও, কন্যা একটি দায়। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে আমরা জানতে পারি শেষ পর্যন্ত তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা পণও দিতে হয়েছিল বিহারীলালের পুত্রকে—এই যন্ত্রণাতেই হয়ত গল্পগুচ্ছের দু একটি গল্প লেখা হয়েছে এবং এই কারণেই সম্ভবত শরৎচন্দ্র শ্বশুরের উপর অতটা বিরূপ হন। যার কাছে অপরাধ করা যায় সাধারণত তার উপরই ক্রোধ জন্মায় তাকে ক্ষমা করা যায় না।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় এসেছি। কিন্তু শরীরটা ক্লান্ত—একে নিয়ে টানাটানি করা বড় কঠিন হয়েচে। ডাক্তার বল্‌চে কিছু কোরো না—চুপ করে থাকো—আর সকলেই বলচে, কথা কও, বক্তৃতা করো, প্রবন্ধ লেখো, সভাপতি হও—কাজ করো, করতে করতে রাস্তার মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে হঠাৎ মরো। রাজি ছিলুম যদি কাজের মত কাজ হত। যত রাজ্যের বাজে কাজের আবর্জনা চাপা পড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার মতো দুর্গতি আর কিছুই নেই। ক্রুসের উপর পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেরেছিল যিশুখৃষ্টকে, আমাদের মারে আলপিন ঠুকেঠুকে, কোনো একদিন সুস্থ যদি থাকি এবং সময় যদি পাই তবে তোমাকে গিয়ে দেখে আসব। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

একটু ভালো আছি—সেই পরিমাণে ছোট্ট চিঠি লিখব। কথা আছে কলকাতায় ফিরে গিয়ে নীলরতনবাবুর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করব। ফিরতে লেশমাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু চিকিৎসককে ফাঁকি দিতে গেলে পাছে যমরাজ অট্টহাস্য করেন এই ভয়ে যাওয়াটাই স্থির করেচি। আগামী হপ্তায় কোনো একসময় পৌঁছব। যদি গলিতে জল দাঁড়ায় তাহলে কি করব সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করি? ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতায় এলেই হয় টেলিফোনে নয়ত আগেই চিঠি লিখে খবর দিতেন। এই চিঠিটি কলকাতায় আসছেন শুধু সেই খবর দেবার জন্য লেখা।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়াসু,

আমার খবর জানতে চাও কিন্তু যে কোণে বাস করি এখানে খবর ঘটে না—খবরহীন দিনের মাঝখানে রবি বিরাজমান। তুমি একদা এখানে

আমাকে একটা প্রকাণ্ড বেতের চৌকির উপর লম্বমান পড়ে থাকতে দেখেছিলে। সম্প্রতি সেই ছবির কোনো পরিবর্বর্তন ঘটেচে কিনা জিজ্ঞাসা করেছ। ঘটেচে। কারণ সংসার যেমন চলচ্চিত্তং—চলদ্বিত্তং তেমনি চলদাসনমালম্বং। সে ঘরে আমি নেই—তারি অনতিদূরে দুটি ছোট ঘর আশ্রয় করে থাকি—তাতে আমি ছাড়া বড়ো পরিমাণের কোনো পদার্থ নেই—দুই একটা আসন আছে,—কিন্তু দৈর্ঘ্যে তারা আমার প্রতিস্পর্দ্ধী নয় এখানে জানালা আছে এবং বাহির বলে বিরাট পদার্থটি অবারিত ভাবেই আমার দৃষ্টির সামনে বিস্তীর্ণ। ঐটিই আমার প্রকাণ্ড কেদারা, আমার মন ওরই উপর নিজেকে প্রসারিত করে অনেক সময়ই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কাজ কর্ম কিছু যে নেই তা নয় তবে সে সব কাজের বিবরণ প্যাম্ফ্লেটে লেখা চলে চিঠিতে নয়। অতএব ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদা যে বৃহদাকার আরাম কেদারায় বসে থাকতে দেখেছি বলে লিখেছেন সেই দ্বিপ্রহরটির কথা লিখছি। দ্বিপ্রহরে আহারের পরে আমি পাশে বসলাম মাটিতে। ইচ্ছা কয়েকটা কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করব।

আমার তখন রবীন্দ্র সাহিত্যে জ্ঞান খুবই কম। ছোট বেলায় 'কথা ও কাহিনী' মুখস্থ করেছি যা আমাদের সময়ে সমস্ত শিক্ষিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের অবশ্য পাঠ্য ছিল। তারপর 'চয়নিকা'খানা পড়া হয়েছে ও চয়নিকার অনেক কবিতাই মুখস্থ হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পাঠকদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল তারই উপর নির্ভর করে 'চয়নিকা' গ্রন্থন হয়েছিল, এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। রবীন্দ্র-পরিষদে 'সন্ধ্যাসংগীত' 'প্রভাত সংগীত' 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসীর' আলোচনা শুনেছি ও অনেকগুলি কবিতা পড়েছি, এই বিদ্যা নিয়ে কি আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যালোচনা করতে এসেছি? তা নয়। আমি অন্যত্রও লিখেছি আবার ও লিখছি আমরা যখন রবীন্দ্র ভক্ত হই তখন তাঁর কাব্য পড়ে বিশারদ হইনি তাঁর কীর্তির বিপুলতা সম্বন্ধেও ধারণা অস্পষ্ট কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমার কাছে ছিল সুস্পষ্ট। সমস্ত প্রতিভাধরদের পক্ষে একথা খাটে না।

"চলৎ আসনম্ আলম্বম" কথাটা বড় সত্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। এক

বাড়িতে বেশিদিন তিষ্ঠাতে পারতেন না। এক ঘরে তো নয়ই। ঘর বদল বাড়ি বদল নিদেন পক্ষে ফার্নিচার বদল করেও নূতনত্বের আস্বাদ পেতেন। সেদিন সেই বিরাট কেদারার পাশে বসে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কবিতা পড়া ও উচ্চারণ সম্বন্ধে। ম্লান কথাটা আমরা উচ্চারণ করি ম্লান্ তাহলে জ্বালনোর সঙ্গে তো তার মিল হতে পারে না। অথচ অনেক জায়গাতেই তা করা হয়েছে। ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো, বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লানো আজও হয়নি-ম্লানো—

উনি বললেন না না, ম্লান্ নয় ম্লানোও নয়, ওটা হবে ম্লান অ—। সেই সময় র ফলা ও ঋ ফলার প্রভেদ ছাড়াও আরও অনেক উচ্চারণ বিকৃতির কথা বলেছিলেন, আজ সব মনে পড়ছে না যেমন 'ভেতরে' উনি বললেন আজকাল দেখি শুধু বলা নয় লেখাতেও 'ভেতরে' লেখা হয়। আমাদের বাড়িতে মুখেও কেউ বলে না, বলে 'ভিতরে'। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অবনবাবু যে ভাষায় কথা বলেন সেটা কি? সেও তো দেশজ ভাষা, বিকৃত। কবি বললেন, 'না না, ও ওর নিজের সৃষ্টি, ও অবনের কাব্য।'

তখন আমি সৌম্যেন্দ্রনাথকে দেখিনি তাহলে আর একটু তর্ক চালাতে পারতুম, উনি বলতেন, "নোমোস্কার"।

আমি বললাম অনেক চলতি কথা আছে যা আপনাদের বাড়িতে ব্যবহার হয় অন্যত্র হয় না। যেমন আমরা বলি 'তরকারি কাটা' আপনারা বলেন 'তরকারী বানানো', আমরা বলি মুস্কিলে পড়লাম', আপনারা বলেন, 'এ কি গেরো হল'—অন্তত আপনি বলেন। আমরা বলি 'অন্তত' আপনি বলেন, 'নিদেন পক্ষে'—একটা কথা আপনি ব্যবহার করেন 'বেগানা' এটার মানে কি? কবি বললেন 'অপরিচিত'—এতক্ষণে ওঁর চোখ বিস্ফারিত হয়েছে— "আর কি কি আমি বলি কণ্ঠে?" আমরা বলি 'থামো থামো'। আপনি বলেন 'রোসো রোসো'—অবনবাবুও তাই বলেন। আমরা বলি 'বারটা বেজে গেছে,' আপনি বলেন 'দুপুর বেজে গেল'—উনি খুব বিস্মিত "এ্যাতো খেয়াল কর তুমি?" আসলে আমি তখন ওঁদের বাড়ির ধরনধারণ কথাবার্তা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতুম। অনুকরণ করবার জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা সম্মোহিত অনুরাগের জন্য—যে জন্য আমি তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর যা যা কথা হল মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে স্মরণ রাখতাম। সব সময় লিখে ফেলা হত না। ডায়েরী লেখার ধৈর্য ছিল না। সে কারণে বোধহয় এখনো উনি ঠিক কি শব্দটি কোথায় ব্যবহার করতে পারেন বা

পারেন না তা নির্ভুলভাবে বলতে পারি। তাই কেউ যখন রবীন্দ্রনাথের কথা ব'লে কোটেশন মার্কে কোনো বক্তব্য লেখেন, তার সত্যতা নিরূপণ করা আমার পক্ষে কঠিন নয়, অবশ্য প্রমাণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি যাঁরা থাকতেন তাঁরা অনেকেই ওঁর পরিশীলিত বাচনভঙ্গী, ধরণ ধারণের অনুকরণ করতেন। আমার দ্বারা তা কোনো দিন হয়নি। আমার সেটা ভালোও লাগত না—কৃত্রিম মনে হত। আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, রেগে ওঠা, প্রভৃতি গ্রাম্যতা দোষ কোনো দিনই স্খালন করতে পারি নি। আমি যে উগ্র বরিশালের কন্যা তাই রয়ে গেলাম। শুধু ঐ বাড়ির বা শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির মধ্যে গেলে গলার স্বর ক্ষীণ, মাথা নত হয়ে যেত—সিংহী হরিণ হয়ে যেত। মৃদু এবং ভীরু।

কবি বললেন, "আচ্ছা এসো এসো অনুবাদের খেলা খেলা যাক"—এই বলে কয়েকটা বাংলা ইডিয়মের ইংরেজি করতে বললেন—। দুঃখের বিষয় সে অনেক দিনের কথা, আমি সব ভুলে গেছি—শুধু মনে আছে কী রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলুম ইংরেজি জানি না বলে। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মত আমরা ফর ফর করে ইংরেজি বলতে পারতুম না। একটি বাক্যই শুধু মনে আছে—"হবি তো হ"—এমন সময় অমল হোম সপরিবারে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই আমাকে দেখে বললেন, "বাইরে এক জোড়া টুকটুকে মখমলের পাদুকা দেখেই বুঝেছি মৈত্রেয়ী এসেছে—আমাদের উপর খুব রাগ করবে, আমরা আপনার উপর ভাগ বসাতে এলাম—।" কবি বললেন, "আমরা অনুবাদের খেলা খেলছিলাম—অমল হবি তো হ-র ইংরেজি কি হবে?" অমল অবলীলায় বললেন "as ill luck would have it"·········রবীন্দ্রনাথ উঠে তাঁর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাখা বড় টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ আসছিল তা ওঁর চুলের উপর পড়ছিল এবং সমস্ত স্থানটা উদ্ভাসিত করে দিচ্ছিল। উনি লেখবার জন্য কাগজপত্র ঠিক করতে লাগলেন, আমরা বেরিয়ে এলাম। অমল বাবুদের সঙ্গে খেলার মাঠের দিকে চলেছি, নূতন অভিজ্ঞতার আবেশে মন্থর আমার গতি। অমলবাবু বললেন, "মৈত্রেয়ী লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমাদের সকলেরই একটা অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা হয় কবির কাছে যেতে, এটা হচ্ছে—desire of the moth for the star" এই বাক্যটি আমি সেদিন প্রথম শুনলাম এবং খুবই ভালো লাগল। এর সংস্কৃতটা আমি অবশ্য জানতাম—পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু—কিন্তু তার তাৎপর্য তো ভালো নয়। তখনই মনে করেছি এরকম অন্ধ ভক্তি ঠিক নয়

আমাকে সব ভালো করে জানতে হবে। এঁর সমগ্র রচনা পড়তে হবে এবং পারলে জীবনকেও তেমনি ভাবে গড়তে হবে।

সেবারে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি নূতন অভিজ্ঞতা হয়, প্রথম একদিন দুপুরে মেলা প্রাঙ্গনে জিমনাষ্টিক লাঠিখেলা ছোরা খেলা দেখান হয়—কবিও ছিলেন দর্শকদের মধ্যে। ওঁকে একটা চেয়ার দেওয়া হল—আমি তো ছায়ার মত ঘুরছি। ওঁর পাশে মাটিতে বসে খেলা দেখলাম। আর দেখলাম কবির সঙ্গে একটা তাঁবুর মধ্যে সিনেমা কবিরই একটি বই, সম্ভবত গোরা। সে সিনেমা কারা করেছিল মনে নেই—শুধু মনে আছে আমিও পিছন পিছন উঠে এলাম। এখন জানতে কৌতূহল হয় সেটাই ওঁর বইএর প্রথম ছবি কিনা এবং কে ছিল তার প্রডিউসার।

এছাড়া এসেছিল মুকুন্দদাসের যাত্রা। সারারাত জেগে যাত্রা দেখবার খুব শখ আমার—জীবনেও এত স্বাধীনতা পাই নি। কবি বললেন, খুব ভীড় হয় বাইরে থেকে অনেক লোক আসে, একা একা তোমার না যাওয়াই ভালো —যদি কেউ তোমাকে হরণ করে তো তোমার বাবাকে কি কৈফিয়ৎ দেব?

কিন্তু আমি লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। মুকুন্দদাসের যাত্রা ও গান সেই আমার প্রথম ও শেষ দেখা। খুবই ভালো লাগছিল। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল—মনে হল চুলে একটা টান লাগল দেখি কাণের একটা মুক্তার দুল কে টেনে নিল, যাত্রা তখন প্রায় শেষ—একটা গোলমাল হল, ভলান্টিয়ার ছেলেরা খুব খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু অপহৃত অলঙ্কারটি পাওয়া গেল না। ভীড়ের মধ্যে রাণীমহলানবিশকে দেখলাম, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল গহনার জন্য নয়, গুরুজনের বারণ না শোনার জন্য। যদি জানতে পারেন কী হবে? এবং বুঝলাম জানতে পারবেনই। প্রত্যুষে দেখা করতে গেলাম। দেখি রাণীদি বসে আছেন, কবি মুচকি মুচকি হাসছেন, বললেন—ভাগ্যিস আমার ঘরে তোমার কর্ণভূষণ খোয়া যায়নি—আমার যে রকম অর্থকষ্ট চলেছে লোকে ভাবত আমিই বা......।'

কবি রাগ করলেন না দেখে আমি আশ্চর্য ও আনন্দিত হলাম, আমরা সে যুগে যে বাঁধাবাঁধি চাপাচুপির মধ্যে বাস করতাম, যে একটু একটু স্বাধীনভাবে ঘুরতে পাওয়ার আস্বাদ বড় মধুর লাগত।

মাঘোৎসব

ওঁ

কল্যাণীয়াসু—

তুমি জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করতে লেগে গেছ শুনে ভীত হয়ে পড়েচি। নাড়ি নক্ষত্রের কথা যা আমার নিজের কাছেও অগোচর তাই যদি তোমার কাছে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে হয়ত লজ্জা পেতে হবে, নক্ষত্রের সাক্ষ্যের উপরে আমার সাক্ষ্য হয়ত প্রামাণ্য হবে-না। একজন জ্যোতিষী একবার আমাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল দেবদ্বিজে আমার ভক্তি মাত্র নেই, এমন কি গরুতেও। শেষ নালিশটা শুনে মনে বড়ো গ্লানি হল চেষ্টা করলুম তখনি সেই জ্যোতিষীকে ভক্তি করতে তার মুখ দেখে পেরে উঠলুম না। শরীরটা সম্বন্ধে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েচি। তাতেই রুষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে ও আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করে—আমি কিন্তু হার মানবার পাত্র নই, ওর আপত্তির উপর দিয়েই আমার কাজের বোঝাই করা রথ চালিয়ে দিই কিন্তু অত্যাবশ্যক কাজ ছাড়া অন্য সব কাজ পরিহার করতে হয়েচে।

ইতি—২০শে অক্টোবর ১৯২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পরিহাস করে লিখলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রে রবীন্দ্রনাথের একেবারে উৎসাহ ছিল না তা নয়। এ নিয়ে আলোচনা করতে, মজা করতে তাঁর ভালই লাগত। তাই বলে একেবারে বিশ্বাস করতেন তা বলা যায় না। সব দিকে খোলা মন রাখাই ছিল তাঁর মত। প্ল্যাঞ্চেট সম্বন্ধে মনোভাবও সেই একই রকম বলা চলে। আমাদের বাড়িতে তখন খুব জ্যোতিষীদের আনাগোনা তাই মাঝে মাঝেই আলোচনা হত। আমিও কুষ্ঠী করতে শিখেছিলাম। অবশ্য বিচার করতে নয়। হাত প্রসারিত করে বলতেন বল কি অজ্ঞাত রহস্য বলতে পার—দেখতে শুনতে ভালো, কবিতা লেখে, নাম খ্যাতি আছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—পরিহাস সত্ত্বেও আমার পিতার বন্ধু বিপিনবিহারী জ্যোতিষশাস্ত্রী কিছুতেই ছাড়লেন না তিনি তাঁর বইয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের হাতের একখানি ছবি তুলিয়ে নিলেন। এই ছবির কপি এখনও আমার কাছে আছে।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan

কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমাকে একশো মাইল ব্যাপিনী কান্নার ভয় দেখিয়েছ—সেটা শান্ত করবার জন্য চিঠি লিখতে বসেচি। উত্তর হাওয়া দিলে পত্র ঝরে, আমার হয়েচে কি উত্তর দিতে গেলেই আমার পত্র অদর্শন করে—এতে বোঝা যাচ্ছে আমার আয়ুতে শীত ঋতুর আবির্ভাব। দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিণ্য আমার কাছে আশা করা বৃথা। এগারই মাঘ উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা মাত্র নেই। আমি এখানে চুপচাপ বসে আমার সেই ছোট ঘরের বাতায়ন থেকে সূর্য্যাস্ত দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটাতে চাই। একেবারে রাজকীয় চালে কুড়েমি করতে পারলে খুশী হতুম কিন্তু গ্রহ নারাজ, ছুটি মেলে না। বাল্যকালে কাজ ফাঁকি দিয়েছি, এখন তার সুদ গুণতে হচ্ছে। আমার এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমার যেন শিক্ষা হয়—নইলে সাতষট্টি বছর বয়সে পাকা মাথায় খাটুনীর অন্ত থাকবে না।

ইতি—৫ই মাঘ ১৩৩৫
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিতে মাঘোৎসবে কলকাতায় আসবার কথার উল্লেখ আছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে খুব সমারোহে উৎসব হত—একবারের কথা আমার মনে আছে—তবে সেটা কোন তারিখ তা মনে নেই। এই চিঠিটার প্রসঙ্গে সেদিনের সন্ধ্যা মনে পড়ছে। সাধারণত মাঘোৎসব সারাদিন ব্যাপী উৎসব। কিন্তু সেদিন জোড়াসাঁকোয় সেটা ছিল একটা সন্ধ্যা। ভিতরের চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে উৎসব হচ্ছিল, দিনেন্দ্রনাথের গানে গম গম করছিল সভা—তখন মাইক ছিল না—মাইকের দরকারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গলা যদিও খুব মোটা নয় সাধারণের চেয়ে এক অকটেভ উপরে বাঁধা, সূক্ষ্ম এবং মধুর, তবু তিনিও সেনেট হল ভর্তি মানুষকে শোনাতে পারতেন, আর দিনেন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা অনেকেই দোতালার বারান্দায়, ও পিছনের ঘরে জানালায় বসে ছিলেন। মনে হয় তখনও যেন একটু পর্দার প্রভাব ছিল। ক্ষিতিমোহন সেন ও রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করলেন—শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা গান গাইল। সেদিন প্রতিমাদেবী আমাকে

রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থানটি দেখিয়েছিলেন। অন্ধকার ছোট একটি ঘর এটিই ঠাকুর বাড়ির আঁতুড়ঘর। আঁতুড়ঘর সর্বদাই বাড়ির নিকৃষ্ট ঘর।

প্রতিমা দেবীকে সেই একদিনই আমি খুব নিপুণ করে সাজতে দেখেছিলুম। অপরূপ সুন্দরী প্রতিমা দেবী বিনা আভরণেই নিরুপমা—তিনি সেদিন একটি বিশেষ ঢাকাই শাড়ি পরেছিলেন সেটি ত্রিপুরার রাজবাড়ির উপহার, কালো জমির উপর সাদা জরির ডুরে, 'ঢাকাই ফুল' নয়। আর গলায় পরেছিলেন একটি মুক্তা মালা—ঐ মালাটি জাভা থেকে রবীন্দ্রনাথ এনে দেন। সম্ভবত তাঁকে কেউ উপহার দিয়ে থাকবে। না হলে মুক্তা মালা তিনি পাবেন কোথায়? গয়না তিনি পছন্দও করতেন না কেনবার ইচ্ছা মনেও স্থান পেত না। প্রতিমা দেবীর সেই শাড়িখানি অনেক পরে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আমাকে দিয়েছিলেন। আমার কন্যা মধুশ্রী দাশগুপ্তার কাছে সেটি সযত্নে রক্ষিত আছে। আর মুক্তার মালাটি যখন প্রথম রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার খোলা হয়, তখন বিক্রি করে টাকা তোলবার জন্য কিংবা রবীন্দ্রনাথের নামে যে মিউজিয়াম হবে তাতে রাখবার জন্য সুরেশচন্দ্র মজুমদারের হাতে তুলে দেন। সে সময় সুরেশচন্দ্র প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন।

মাঘোৎসবের দিনের একটি স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, লোকের ভিড়ে বড় বড় মানুষদের ও অতি পরিচিত আত্মীয়দের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ আমার থেকে যেন অনেক দূরে চলে যান। সেদিন পূজামণ্ডপ থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে ঘিরে কত লোক, সবাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে একটু এগিয়ে যেতে চায়। কী অদ্ভুত আকর্ষণের চুম্বকভূমি তাঁকে ঘিরে তৈরী হত—আজ অবাক হয়ে ভাবি কত মানুষ তো দেখলাম দেশে বিদেশে ঐ রকম চুম্বক শক্তি বা ক্যারিসমা আর কারু মধ্যে তো আমি অনুভব করিনি।

ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে আছি বড় বড় লোকেরা কথা বলছেন। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা ঘিরে আছে এর মধ্যে ভিড় ঠেলে এগোই কি করে। ভিড়ের উপর দিয়ে তাঁর চন্দনচর্চিত কপালের অংশ দেখা যাচ্ছে—আমার সমস্ত শরীর মন টানছে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে কিন্তু কী সংকোচ কী হীনমন্যতাবোধ আমাকে অনড় করে রেখেছে—একটু এগিয়ে যাচ্ছি প্রায় সামনে গিয়েছি এমন সময় একটি আশ্রম কন্যা আমাকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। ওদের কত অধিকার! ওদেরই তো গুরুদেব। আমি হৃতমান হৃতৈশ্বর্য ভিখারীর মত চেয়ে রইলাম।

কবিতার ভূমিকা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দুটো দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাটিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু এখানে অনেক কালের জমা কাজ আমার পথ চেয়ে ছিল, এসে পৌঁছবামাত্র চারিদিকে ঝেঁকে এসেছে। এই ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠতে কিছু দিন লাগবে। রাশীকৃত চিঠি টেবিলের উপর ভিড় করে আছে, তাদের ধ্বনিহীন বাক্য যদি ধ্বনিত হয়ে উঠত তাহলে সেই বহুভাষার সাইক্লোনে আকাশ যেত পাগল হয়ে।

বুলা তার স্বামীকে বলে নিঃসম্বল বিশ্বভারতীর জন্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েচে, পূর্ব্বে কিছু দিয়েছে, পরেও কিছু দেবে এই তার সঙ্কল্প। সেদিন তার মুখ থেকে এই কথারই আভাস পেয়েচো। হাতের কাজগুলো শেষ করে তার পরে হিবার্ট লেকচার লেখবার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আপাতত ব্যস্ততার অন্ত নেই।

তোমার খাতা পাঠিয়ে দিয়ো। এখন তোমার লেখা শোধন করবার দরকার হয় না। তোমার রচনার ধারা তার নিজের পথ নিজেই তৈরী করে নিয়েচে—আমরা তাতে হাত লাগাতে গেলে হয়ত তাকে মুক্ত না করে বাধাগ্রস্ত করা হবে। ইতি—জুলাই ১৯২৯

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যানীয়াসু,

খাতা ফিরে পাঠাই, তোমার রচনা সংশোধন করবার অবস্থা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। পত্রযোগে সে কাজ করতে গেলে অন্যসব কাজ স্থগিত রাখতে হয়। অতএব ভবিষ্যতে যখন দেখা হবে তখন মোকাবিলায় আলাপ করবার সংকল্প মনে রইল।

নানা প্রকারের কাজে ব্যস্ত আছি।

ইতি ৫ই শ্রাবণ ১৩৩৮
আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির সংশোধন থেকে দু একটি লাইন তুলে দিলি। আর ভূমিকাটি। শনিবারের চিঠির তীক্ষ্ণ দংশনে পাছে আমি বিনষ্ট হই ভূমিকায় তারই সম্ভব

উল্লেখ আছে, কিন্তু শনিবারের চিঠি পুঁটি মাছ মারত না, রাঘব বোয়ালের দিকে দৃষ্টি ছিল, শুধু একবার আমি রবীন্দ্র পরিষদে যাই বলে একটি বিশ্রী ইঙ্গিত করেছিল।

এখানে বুলা বলে যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মোহিতচন্দ্র সেনের দ্বিতীয়া কন্যা উমা দেবী। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর বিষয় অন্যত্র কিছু লিখেছি পরেও লেখবার ইচ্ছা রইল। বুলা যে কোনো উপায়ে ওঁর কাজে লাগছে ওঁকে কোনো সাহায্য করতে পারছে এতে আমার ভারি আত্মগ্লানি হচ্ছিল আমি তো কিছুই পারব না। আমার খালি নেওয়া। এই সময় আমার বই প্রকাশ করবার ইচ্ছে হয়েছিল বাবার। বাছাই করে কবিতা একটি সুদৃশ্য খাতায় কপি করা হয়েছিল, আমি করিনি, আমার মাসী 'মাতৃস্বসা' বলে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এ যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি করেছিলেন। সেদিন এই খাতা পাঠাতে আমার দ্বিধা সংকোচের অন্ত ছিল না। সেই খাতা সংশোধিত হয়ে ফিরে এসেছিল—কাঁচা লেখার সঙ্গে ভাবসাম্য মিলিয়ে ওঁর সংশোধনগুলো খুবই আশ্চর্য। এই পত্রে "স্নেহানুষক্ত" বিশেষণটি এই প্রথম ব্যবহার করে ছিলেন।

যোগাযোগ মহুয়া ও শেষের কবিতা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার উচিৎ ছিল আইন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া। তুমি পুরোনো দলিল ঘেঁটে যে সব তর্ক তুলেচ তার জবাব দেওয়া কঠিন। সাহস এই যে আদালতে বিচার হবে না। গোড়ায় যে আভাস মাত্র দেওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি যদি কিছু নাও দিই তাহলেও সাহিত্যের বিচারে চুক্তি ভঙ্গের মকদ্দমায় ড্যামেজ দিতে হয় না। আমার পক্ষে এই হচ্ছে মস্ত ভরসা।

ঘন ঘোর বর্ষা নেমেচে—আকাশ শ্যামল ধরণী শ্যামল রবির আলো তারি মাঝখানটাতে ক্ষণে ক্ষণে সোনার লেখন লিখচে। ইতি আষাঢ় ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে যে উপন্যাসের উল্লেখ আছে সেটি যোগাযোগ। 'যোগাযোগ 'তিন পুরুষ' নামে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল, যখন শেষ হল হতাশ্বাস ভাবে

দেখলুম অবিনাশ ঘোষাল কোথায় ? আসলে তৃতীয় পুরুষের কাহিনী যখন আর পাওয়া গেল না অর্থাৎ লেখা হল না তখন নাম বদলে হল 'যোগাযোগ' দুই পুরুষের খবর জানা গেল কিন্তু তৃতীয় পুরুষ একটি লাইনে সমাপ্ত হয়ে গেলেন। যদিও আশা দেওয়া হয়েছিল যেন গল্পটি হবে তারই গল্প। পূর্ব পুরুষের কাহিনী হচ্ছে "সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালবার আগে সকালবেলার সলতে পাকানো" কিন্তু দীপ আর জ্বললো না। তাই অভিযোগ করে চিঠি লিখেছিলুম। উত্তরে এই চিঠি এল কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলুম না।

আজ যখন ছবি আঁকার প্রথম যুগের কথা ভাবি তখন এক সঙ্গে যোগাযোগ উপন্যাসের, শেষের কবিতার ও মহুয়ার লেখক এক হয়ে যান। এর একটা কারণ আছে। এই বই গুলো ও ছবিগুলোর একটা অভিঘাত একসঙ্গে পাঠকের মনের উপর পড়েছিল। বই গুলো সম্পূর্ণ নূতন ভাবের ও ভাষার। এখনকার পাঠকরা সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে পান, তাদের কাছে ক্ষণিকা ও মহুয়া যে বহু যোজন দূরে তা মনে হয় না। আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট যুগ বিভাগ আছে। ১৯২৮ সালের একটা সময় বেশ কয়েকদিন কবি আমাদের কাছাকাছি চৌরঙ্গীতে ছিলেন। এই সময় মুকুলচন্দ্র দে গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। চৌরঙ্গীর উপর দোতালায় তাঁর কোয়ার্টার্স। সেইখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন। কিছুদিন থেকেই তাঁর কলকাতায় থাকতে ভালো লাগত না। চিৎপুর রোডের গোলমালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ের মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা তাঁর বিষম উৎপাত মনে হত। মনে আছে অনেক পরে রোগশয্যায় শুয়ে কর্ণপটাহ-ভেদকারী শব্দ শুনে চমকে উঠতেন--একদিন বলেছিলেন, "আমাদের দেবতা বধির কিনা তাই এত শব্দ করে তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হয়।"

সেজন্য কলকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর বাইরে কোথাও থাকতে পেলে বরাবরই খুশি হতেন। বরানগর বেলঘরিয়া প্রভৃতি জায়গায় প্রশান্ত মহলানবীশের বাড়িতে মাঝে মাঝেই দুচারদিন করে থেকে কাজ সেরে চলে যেতেন শান্তিনিকেতনের নীড়ে। তবু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অল্পক্ষণের জন্য এলেও দর্শনপ্রার্থীরা খবর পেয়ে যেতেন এবং দেখা করতে আসতেন। কবিও তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন যেন কোনো তাড়া নেই কাজ নেই। বিষয় বস্তুগুলো অবশ্য যে খুবই প্রয়োজনীয় সব সময় তাও নয়। যেমন কাণ এ মূর্দ্ধণ্য ণ হবে না দন্ত্য ন—সোনা স্বর্ণ থেকে জন্ম নিলেও রেফ কাটা গেলে আর কেনই বা মূদ্ধণ্য ণ থাকবে কবির এই মত। কিন্তু

কেউ কেউ এইসব বিষয় নিয়ে প্রচুর তর্ক করে যেতেন। অবশ্য কানের মাথা কাটা যাওয়া সোজা নয় এত কালের লব্ধ কর্ণ, অর্থাৎ একটা ভাষার বানানের এই ধরনের পরিবর্তনে মত দিতে সবাই সহজে রাজী হবেনই বা কি করে।

এই সময় জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে আমার বয়সী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেও কবিতা লেখে তারও কবিতা প্রবাসীতে বের হয় তার নাম সুফিয়া খাতুন।

সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৭২ সালে সুফিয়া কামালের সঙ্গে দেখা। তিনি কবি হিসাবে পূর্ববঙ্গে যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আমার তার কাছাকাছিও কিছু হয়নি। সুফিয়া কামাল নাম খুব শুনতাম কিন্তু তিনিই যে সেদিনের বালিকা তা জানতাম না। ঢাকায় সুফিয়া কামাল আমায় বললেন, আপনার মনে আছে কবির ঘরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তোমরা দুই কবি তোমরা বন্ধু হও। আজকাল তোমরা সই পাতাও না কেন—ও তো বকুল বাগানে থাকে তোমরা বকুল ফুল পাতাও—কথাটা আমার মনে পড়ল। দুঃখ হল কবির ইচ্ছা পূর্ণ করিনি বলে—তারপর এই উপমহাদেশ কত অবস্থার মধ্য দিয়ে ছিন্নভিন্ন হল—আমরা দুই সম্প্রদায়ের সমমর্মী মানুষ যদি বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকতাম তাহলে হয়ত এক সঙ্গে অনেক কাজ করতে পারতাম।

মুকুলচন্দ্রের সরকারী ফ্ল্যাটটি প্রশস্ত—রবীন্দ্রনাথের বসবার ঘরটি একটি হল ঘর বললেই হয়। সামনে বারান্দা সেখান থেকে বাগান ও একটা পুকুর দেখা যায়। হল ঘরে লেখবার টেবিল চেয়ার ছাড়া একটি ডিভান ছিল। কবি মাঝে মাঝে লিখতেন মাঝে মাঝে চেয়ারে অর্ধশায়িত ভাবে বিশ্রাম করতেন।

তখনই ছিল আমার গল্প করবার সময়। মাটিতে বসে মৃদুস্বরে আমি ২/১টি প্রশ্ন করতাম কবি গল্প করে যেতেন। তখন গল্প ছিল খালি ছবির। ছবির এক একটা মুখ মনে যাওয়া আসা করত।

মাঝে মাঝে অপূর্ব চন্দ এসে উপস্থিত হতেন। কখনো বা প্রশান্তচন্দ্র। মহুয়ার কবিতা নিয়ে আলোচনা হত। শুনতাম বিবাহের উপহারের জন্য একটি প্রেমের কবিতার সংকলনের কথা ভাবছিলেন প্রশান্তচন্দ্র প্রভৃতি—কবি তদুত্তরে নূতন প্রেমের কবিতা লিখলেন। এবং মহুয়া নামে তা প্রকাশিত হল—মহুয়ার গন্ধে একটা প্রগল্‌ভ মাদকতা আছে যা প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়

তাই বইটির নাম মহুয়া—কিন্তু মহুয়ার বেশির ভাগ কবিতাই বিশেষত অনবদ্য শেষ কবিতাটি "কালের যাত্রা" তো শেষের কবিতার অঙ্গ। তাছাড়া 'মায়া' কবিতার বক্তব্য—আমায় তুমি আপনি' রচে আপন কর—' তো লাবণ্যর কথা। —মহুয়ার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা "দায়মোচন"ও শেষের কবিতার মর্মবাণী।

সে সময়ে একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে এত রবীন্দ্রকাব্য পড়ছ কী বোঝ বল—লাবণ্য কেন অমিতকে বিয়ে করল না? অকালপক্ক আমি বলেছিলুম মহুয়ার 'দায়মোচন' কবিতাতেই তো তা বলা হয়েছে।

তিন খানি বই যোগাযোগ শেষের কবিতা ও মহুয়া যেন হাত ধরাধরি করে আছে—যোগাযোগ প্রকাশিত হল বিচিত্রায়। বিচিত্রা নূতন কাগজ কিন্তু খুব জাঁকজমক করে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক হলেন উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের মামা।

যোগাযোগের পর ঐ কাগজে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে যোগাযোগের প্রভাব সুস্পষ্ট এমন কি নামের মোহটিও কাটাতে পারেন নি। তবে কথায় কারুকার্য ছাড়া ও বইতে আর কোনো বক্তব্য পাওয়া গেল না। শরৎচন্দ্রের আচার-বিচারী বিপ্রদাস যোগাযোগের বিপ্রদাসের চেয়ে বহুদূর। যাহোক যোগাযোগ প্রকাশ হওয়ার জন্য এবং তাঁর আগে ঋতুরঙ্গ প্রকাশের জন্য বিচিত্রা জন্মেই যৌবনে পৌঁছে গেল। খুব খ্যাতি হল বিচিত্রার। প্রবাসীকে তিল তিল করে মাথা তুলতে হয়েছে—অনেক দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে। প্রবাসীতে বরাবর রবীন্দ্রনাথের লেখা বেরিয়েছে। প্রবাসী ছাড়া আর শুধু খুচরো পত্র পত্রিকায়—বসুমতী ভারতবর্ষে বড় একটা তাঁর লেখা বেরুত না। সেই প্রবাসীকে ছেড়ে এত দিন পরে লেখা একটা সুবৃহৎ উপন্যাস চলে গেল বিচিত্রার কাছে—নূতন বড়লোকের জাঁকজমকে যা তখন চারিদিক সরগরম করছে। রামানন্দবাবু মর্মাহত। ইতিমধ্যে লেখা হল শেষের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "খবর দেবার চেয়ে বেশি কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল অর্থাৎ সশরীরে আবির্ভূত হবার।" আমি ভেবেছিলাম এটা একটা কথার কথা। কিন্তু একদিন 'শেষের কবিতা'র ম্যানস্ক্রিপ্ট রামানন্দবাবুকে দিতে এসে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। "রামানন্দ-বাবু তোমার কথা বলেন তাই ভাবলুম তোমাকে একবার দেখে যাই।"

এরকম খবর না দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে পড়বেন এ যে একেবারে অভাবনীয়। সেদিন আমাদের অতুলনীয় সৌভাগ্যে আমরা সকলে অভিভূত ও সম্মানিত হয়েছিলাম। এক গ্লাস ডাবের জল ছাড়া আর কিছু দিয়ে আতিথ্য করা গেল না—। বাবা ছেলে মানুষের মত খুশী হয়েছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল আমার কবিপ্রতিভা কবিকে আকৃষ্ট করেছে। আমি জানতুম এবং এখনও জানি তা নয়—আমার মধ্যে তিনি একজন অতন্দ্র একাগ্র ও রসনিমগ্ন পাঠককে আবিষ্কার করেছিলেন। ভাবুককে তাঁর দরকার। ছিন্নপত্রে আমার এ কথার সমর্থন আছে।—"আমাদের মত লোকের পক্ষে একজন খাঁটি ভাবুকের প্রাণ সঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব ?"

যোগাযোগ মহুয়া ও শেষের কবিতার পর্ব মেশামেশি করে আছে—এখানে তাই সে সময়ের কথা কিছু লিখছি। বাংলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে এই সময়ে একটা বড়ো রকমের আন্দোলন সুরু হয়েছিল। নবীন বা তরুণ লেখকরা নূতন ধরনের লেখা লিখছিলেন—যার মধ্যে জৈবিক জীবনই প্রাধান্য পাচ্ছিল। এঁদের অনেকেই কল্লোল যুগের প্রবর্তক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন—এঁদের মধ্যে কাঁচা পাকা দু রকমের লেখাই ছিল—অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে' তখন খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিল। এঁদেরই কারো একজনের লেখার একটি লাইন আমার এখনও মনে আছে—সঠিক কোটেশন না হলেও মোটামুটি এইরকম—"বুড়ো বাপটা পৃথিবীকে মুখ ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল—" বাপের মৃত্যু বর্ণনায় এরকম ভাষা তখন ভালো লাগত না। একদিকে সমাজ বন্ধন ছেঁড়া স্বাধীনতার তাণ্ডব, অন্যদিকে কুৎসিত সমালোচনা, সাহিত্যক্ষেত্রে যেন মল্লযুদ্ধ চলেছে। সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত শনিবারের চিঠির কাজই ছিল খুঁজে খুঁজে কোথায় কত কুৎসিত কথা বর্ণনা করেছে তারই সংকলন করা—এবং অকথ্য গালাগালি করা; খুঁজে খুঁজে বার করতেন কোথায় কার কি খুঁৎ আছে। এই সজনীকান্তের বায়ুমণ্ডলে বনফুল প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। আধুনিক কবি ও লেখকদের মনের কথা বোঝা দূরে থাক—রবীন্দ্রনাথকেও তাঁরা বুঝতেন না। হয়ত কয়েকটি কবিতা তাঁদের ভালো লাগত কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিকতা, মানবতা, বিশ্ববোধ, তাঁর জীবনচর্যা সবই ছিল সজনীকান্ত গোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। সহশিক্ষা প্রবর্তন, ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে

নাচ-গান এসব ভুচ্ছ কাজের সমালোচনা ছাড়াও তাঁর রচনার এবং চরিত্রেরও সমালোচনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে শনিবারের চিঠি বোঝাই থাকত। এই প্রসঙ্গে একটা দিনের কথা কখনো ভুলব না একদিন আমি যথারীতি কবির চেয়ারের পিছনে বসে আছি উনি লিখছেন, ঘরে লোকজন যাওয়া আসা করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় ডাক এলো—তাতে শনিবারের চিঠি একখানি। বইটা খুলে একটু দেখে চেয়ারের পিছনে আমার দিকে ফেলে দিলেন—দেখো তোমার স্বদেশবাসীর কীর্তি।—খুলে দেখি ইন্দিরা দেবী প্রসঙ্গে কি সব লিখেছে। আমার সব ভালোমত বোধগম্য হল না।—দেখো পাছে তোমার চোখে না পড়ে তাই লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছে—আঘাত করার আনন্দেই এরা প্রমত্ত।—

সজনীকান্তের সহযোগী কি করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তা আজও বুঝতে পারি নি। কারণ ঐ পত্রিকা রামানন্দকেও অকথ্য গালিগালাজ করত। এমন সব ভাষা ব্যবহার করেছে যা উদ্ধৃত করে আমি কলমকে কলঙ্কিত করতে চাই না। সুভাষচন্দ্রকেও ছেড়ে কথা বলে নি—তাঁর রাজনীতি নয়, চরিত্র ছিল এদের বিষাক্ত শরের লক্ষ্য।

শনিবারের চিঠির উৎপাত প্রসঙ্গে আর একটি দিনের কথা বলছি। ১৯২৮ সালে কলকাতায় ২৫শে বৈশাখে জন্মদিনের উৎসব হয়, সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁর জন্মোৎসব দেখলাম। বিচিত্রা ঘরে মাটিতে আলপনা দিয়ে একটি কোণ সাজান হয়েছিল একটি তুলাদণ্ডও সেখানে ছিল—অতিথিরা সকলেই ফরাসে বসেছিলেন, গিয়ে দেখি পশ্চিমদিকের ছোট ঘরটিতে কবি বসে আছেন প্রস্তুত হয়ে। সেখানে তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলাম। তখন রাণু মুখার্জীকে প্রথম দেখলাম। বড় লোকের গৃহিণী হীরামুক্তায় ঝলমল করছেন। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে এঁকে খুব বেশি দেখি নি। সেদিন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল তুলাদণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বরচিত বই দিয়ে ওজন করা ও তারপর সেই বইগুলি বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরীকে দান করা। মালাচন্দন ভূষিত রবীন্দ্রনাথের তুলাদণ্ডে বসা কোনো ছবি তো থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সে রকম তো দেখি না, তখন হয়ত ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ছিল না। সেদিনের আর একটি বিশিষ্টতা ছিল ঝুনু দেবীর গান। ঝুনু অর্থাৎ সাহানা দেবী। তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি উজ্জ্বল তারকার নামই ঝুনু—একজন সাহানাদেবী আর অন্যজন নির্মল সিদ্ধান্তের স্ত্রী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত এঁদের

গানের খ্যাতি খুব শুনেছি—কিন্তু গান শুনবার সুযোগ কই? সাহানা দেবী ও দিলীপ রায় দুজনেই সেদিন গান গাইলেন। দিলীপ রায় গাইছিলেন "ভালবাসি ভালবাসি এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি"। কিন্তু সেদিন তাঁর গায়কী ঢংটি বড় বেশি প্রকট হয়েছিল। তিনি হারমোনিয়ামের একদিক থেকে অন্যদিকে প্রায় শুয়ে পড়ছিলেন। গানের মাধুর্য ছাপিয়ে তাঁর অঙ্গসঞ্চালন যে শ্রোতাদের হাস্যোদ্রেক করেনি তা নয় কিন্তু তা নিয়ে শনিবারের চিঠি যে বেত্রাঘাত করলে তার থেকে সাহানা দেবীও ছাড়া পেলেন না। দুজনের নাম জোড়া করে নিন্দা মন্দ ও ব্যঙ্গ পরিবেশন করল।

শনিবারের চিঠি ছিদ্র খুঁজে ফিরত, কটু তিক্ত তীব্র এবং বিষাক্ত সমালোচনার তীর ছুঁড়ত। সমালোচনা নয় নিন্দা, এই কারণে বাবা যদিও আমার বই প্রকাশ করতে খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ হন নি। তাঁর মনে হচ্ছিল এই রকম পরুষ নিষ্করুণ আঘাতে কোমল মনের ক্ষতি হতে পারে।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তথাস্তু, সকন্যক সশিষ্য এসো—কোন্ গাড়িতে কখন আসবে বিজ্ঞাপন দিয়ো। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে চিঠি পেলুম কাল প্রশান্ত এখানে আসবে। কাজের কথা বিস্তর জমেচে—অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে—উদ্বৃত্ত সময় পাওয়া যাবে না। তোমরা পরবর্তী শনিবারে এসো। সেদিন বর্ষাউৎসব। সেটা হয়ত উপভোগ্য হতে পারে। ইতি ১০ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

আমার আশীর্বাদ

ইতি ২৮ ভাদ্র ১৩৩৬, শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা।

আমার বইয়ের ভূমিকায় শনিবারের চিঠির প্রতি যে ইঙ্গিত রয়েছে সেই

অংশটুকু বাবা কবিকে বলে বাদ করে নিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা জন্মেছিল কবি যে বিপদের ভয় করেছেন এ সব লিখলে তাকেই ডাক দিয়ে আনা হবে।

ভূমিকা

"কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশী নয়। কিন্তু তাঁর লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনী চালানোর পক্ষে আরো অল্প। পড়ে মনে হল বয়সের চাইতে লেখা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের পক্ষে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কাঁচা। আমার মতে সেটা দোষের নয়, কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড়বার বয়স থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম। সেটা কঠিন হলে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্প বয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়।

আমাকে তার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল আমি খুব বেশি ইস্কুল মাষ্টারী করি নি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেইগুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখন লক্ষ করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাবগুলো মুকুলিত হয়ে উঠেছে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।

অল্পবয়সে মন বাইরের জিনিস ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকে। তখন খাপছাড়া অভিজ্ঞতাগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে রূপদান করবার মত ধ্যান শক্তি থাকে না, কারো কারো যদি বা থাকে কিন্তু সেটাকে আবার বাইরেকার উপকরণে প্রতিফলিত করবার প্রবর্তনা দৈবাৎ দেখা যায়।

মৈত্রেয়ীর সেই প্রথম খাতা দেখার পর মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রে তার কবিতা আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে যে পরিণতির চেহারা দেখেছি সেটা আমি প্রত্যাশা করিনি। এর পরে আরো দুই একবার তার খাতা আমার হাতে এসেছে। কিন্তু এখন থেকে তার লেখা নিয়ে তাকে অধিক কিছু বলিনি। দেখলুম লেখিকার মন কাব্যের পথে চলতে শুরু করেছে, চলতে চলতে সে আপনার বিশেষ পথ আপনিই তৈরী করবে এই আমার বিশ্বাস।

বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা যেন সদ্য উন্মুখ অঙ্কুরকে ক্ষণে ক্ষণে শিকড় নাড়া দিয়ে উৎপাত করা। যা প্রাণের নিয়মে আপনি বেড়ে উঠছে

তাকে বাইরে থেকে তাড়া দেওয়া ভুল। কিছুকাল থেকে তার লেখায় একটি যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেটা তার এ বয়সের পক্ষে একেবারেই অনপেক্ষিত। ভাবের ছবি মনে অল্প বয়সেও রচিত হতে পারে কিন্তু তত্ত্বের গাঁথুনী তো তেমন সহজ নয়। কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের উঁকি ঝুঁকি চলে কিন্তু তাকে ডাক দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। যদি বা এমন ঘটে মৈত্রেয়ীর বয়সে সেটা আশ্চর্যের কথা। জ্ঞানের পথে যে উপলব্ধি সেটা পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে বলেই জানি। শুধু চিন্তা করা নয় চিন্তা করতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আনন্দই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্বতা বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিতে পারবে।" (এ পর্যন্ত উদিতার ভূমিকায় ছিল।)

"পূর্বেই বলেছি রচনার প্রথম অবস্থায় বাইরের দৃষ্টি বাইরের নিন্দা প্রশংসা থেকে তাকে রক্ষা করা রচয়িতার মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলে বিশ্বাস করি। যখন কালক্রমে রচনার স্বকীয় সহজ ধারায় লেখকের চিত্ত নিঃসংশয়ে প্রবৃত্ত হয় তারপরে তার উপর নিজের চিন্তা ও পরের চিন্তার আঘাত তাকে আর বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যগুলিকে এখনই সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত করা ভালো হলো কি না জানিনে; একথা আমি তাঁর কাব্যের দিক থেকে বলছি না তাঁর নিজের দিক থেকে বলছি।

আমার মুখে এমন কথা সঙ্গত হল কিনা এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। আমিও কাঁচা লেখা কাঁচা বয়সেই প্রকাশ করেছি; প্রকৃতি কাঁচা ফলকে শক্ত করে রাখেন। কৌতূহলের চঞ্চু তাকে ভেদ করতে বাধা পায়। কিন্তু সাহিত্যের আমদরবারের দিনে ছাপাখানার দৌত্য গুণে আজকাল কোনো লেখাকেই উপযুক্ত লগ্নের অপেক্ষা করতে হয় না। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়া চলে, পরিচয়ের টিকিট দেখাতে হয় না। সে কালে বাংলা সাহিত্যের আসরে এত ভিড় ছিল না। জায়গা ছিল ফাঁকা। কিন্তু তবু বাইরে নিষেধ না থাকলেও ভিতরে কালের পাহারা একটা থাকে। সেই মহাকালের নন্দী নিশ্চয়ই তর্জনী তুলেছিলেন। ভাগ্যক্রমে তখনকার বিচারকদের কাছে আমি প্রশ্রয় পাই নি আমার লেখার অস্পষ্টতা অপরিণতি নানা দোষ নিয়ে আমাকে লাষ্ট বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, বিচারে ভুল হয়েছিল একথা আমি বলিনে। লাষ্ট বেঞ্চিতে অবহেলা রচিত অবকাশের অভাব থাকে না। সেইখানে বসে বসে আমি আপন লেখার ছাঁদ আপনি

বানিয়েছি। কিন্তু মনে আজও অনুশোচনা আছে যে যার নেপথ্য বিধান সারা হয় নি তাকে রঙ্গমঞ্চের হাজার আলোর সামনে দাঁড় করানো হল, ভালো হল না। সে আজ শুভ্র কাগজের উপরে কালির নৃত্যে যোগ দিয়েছে তাকে থামানো যায় না, আড়াল করা অসম্ভব।

লোকের সামনে বসে লেখাও চলে লোককে যদি একেবারে ভুলে থাকবার ক্ষমতা থাকে। আমাদের বাল্যকালে সেটা তত দুরূহ ছিল না। তখন বিচারকদের রায় বেরুত উদার খাগড়া কলমের মুখে। তার রক্তপাত করবার মতো ধার ছিল না। আর রচনার ত্রুটি যে অক্ষমতার ত্রুটি সেটা যে নৈতিক অপবাধ নয় এই মত বোধ করি তখনকার ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। মূল্য বিচার দেওয়ানি আদালতে আর অপরাধ বিচার ফৌজদারিতে। একটাতে সম্পত্তিগত অধিকার নির্ণয় অন্যটাতে ব্যক্তিগত চরিত্র নির্ণয়। সাহিত্যে আজকাল সিভিল কোড্ প্রায় ব্যবহারে আসে না সমস্তই দেখি পুলিস কেস।

যাদের হাড় পাকা লাল পাগড়ি কনিষ্ঠবলদের অপমান তারাই সইতে পারে। সাহিত্য রচনায় যারা প্রথম প্রবৃত্ত, যাদের বয়স নিতান্তই অল্প সেই সুকুমার জীবদের কি এমন ক্ষেত্রে উপস্থিত করা ভালো যেখানে অনুচিত অসম্মান করবার রূঢ় প্রবৃত্তি নিঃসঙ্কোচ এমন কি সাধারণের রুচিকর? যেখানে নন্ ভায়োলেন্সের নীতি উপহাসিত? আজকের দিনের এই নৃশংস সাহিত্য বিচারের এলাকায় আমি যদি রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হতুম তাহলে সে রচনার অপঘাত মৃত্যু হতে বিলম্ব হত না এই আমার বিশ্বাস। ষোল বছর বয়সের অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠিব সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, এটি অবিবেচনার কাজ হয়েছিল তা সপ্রমাণ হয়েছে। আমার সেই কথাই মনে পড়ছে যখন দেখছি বাণ বর্ষণমুখর সাহিত্য ক্ষেত্রে বালিকার রচনাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে রচনায় শক্তির লক্ষণ যতই থাক।

২৬শে নভেম্বর ১৯২৯

শান্তিনিকেতন —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাদের ছোট আমি জন্মমৃত্যুর স্রোতে প্রবহমান, সুখদুঃখের তরঙ্গে দোলায়িত। আমাদের অন্তরতম নিত্য-আমির সঙ্গে তাকে অভিন্ন করে

কল্পনা করি বলেই আমরা বদ্ধ হই পীড়িত হই মলিন হই এই কথা আমাদের শাস্ত্রে বলে এবং আমি এই কথা মানি। সংসারে আমাদের আত্মা কেবলি অপমানিত হতে থাকে এই ছোটটার সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি যাত্রা করে বেরিয়েছি সেই ক্ষুদ্রটার থেকে বহুদূরে যেতে— এই কথা আমি সেদিন সকালে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। সেই দূরত্ব থেকেই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার লাভ করি আত্মার মধ্যে যে সত্যকে পাবার জন্য আমরা এই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করি, অসতো মা সদ্গময়, সেই সত্য তোমার জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠুক এই আমার কামনা। ইতি ১১ নভেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন সকালে ডকবাক্স খুলে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আমি এই চিঠিখানি পেয়ে গেলাম। অন্যসব চিঠির চেয়ে এই চিঠিখানি আমার কাছে বহুমূল্য বোধ হল কারণ এ চিঠি আমার কোনো চিঠির উত্তরে লেখা নয়। সাধারণত চিঠি লিখলেই তার জবাব আসত শুধু আমার কাছে নয় সকলের কাছেই। যতই লিখুন চিঠির উত্তর দিতে সময় পাচ্ছেন না, 'উত্তরে বাতাসে পত্র ঝরে যাচ্ছে'—কিন্তু তাঁর সারাজীবন ধরে দক্ষিণে বাতাসেরই ছিল প্রাধান্য। মানুষের প্রতি গভীর করুণা ও স্নেহ, ছোটখাট আব্দারের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে বাধ্য করত। আমি নিজে অবশ্য চিঠি পেলেই উত্তর দিতাম তা নয় তারিখগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে আমি অনেক দিন পর পর চিঠি লিখতাম, বছরে ৩/৪ খানা চিঠির বেশী লেখা হত না।

কয়েক দিন উনি কলকাতায় ছিলেন, ইদানীং কলকাতায় এলে চিঠিতে বা টেলিফোনে খবর দিতেন বেশির ভাগ টেলিফোনে কথা বলতেন ম্যানেজার গোপালবাবু—আগে ২ একটি চিঠিতে যেমন লিখেছেন, 'সময় পেলে তোমাকে গিয়ে দেখে আসবার ইচ্ছে আছে,' গোপালবাবুও বলতেন, 'বাবা ম'শায় আজ এসে পৌঁছেছেন, আপনাকে দেখতে একদিন যাবেন বললেন।' আমি সেই একদিনের অপেক্ষায় থাকতুম না, সুযোগ পেলে নিজেই চলে যেতাম, সুযোগ অর্থ চলনদার।

কবি কলকাতায় এসেছেন খবর পেয়েছি, পরদিন ভোর বেলা যথারীতি কবি সন্দর্শনে যাব স্থির করেছি এমন সময় সন্ধ্যায় আমার বাল্যবন্ধু ও আত্মীয় প্রসাদ রায় আমাকে বললেন, "কবি কলকাতায় এলেই তুমি যাও

কেন? কী এত দাড়ি তোমার ভাল লাগে?" আমি রাগ করে বললাম, "কেন তোমার তাতে কিছু ক্ষতি হয়?"

প্রসাদের দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। প্রসাদ তার উল্লেখ করে বল্‌লে অমুক বাবু দাদাকে বলেছেন, ঐ তোমার ভাগ্নী মৈত্রেয়ী কেন অনবরত কবির কাছে যায়, উনি তো সহজে কারুকে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু ওঁর কাজের ক্ষতি হয়, বিরক্ত বোধ করেন।"

কথাটা একেবারেই অসম্ভব নয় সেজন্য আমি বিশ্বাস করলাম এবং লজ্জায় দুঃখে আমার আসন্ন সন্দর্শনের আশায় উৎফুল্ল মন একেবারে শুকিয়ে কুঁকড়ে গেল। রবীন্দ্রভক্ত সেই ভদ্রলোকের পরিশীলিত মুখচ্ছবি মনে পড়ল। তাঁরা কত আত্মপ্রতিষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের কত ঘনিষ্ঠ, প্রায় আত্মীয়ের মত। তিনি যা বলেছেন অবশ্যই সত্য। মনে মনে আমি দগ্ধ হতে লাগলাম। সে যে কী কষ্ট আজও যেন অনুমান করতে পারি। সারারাত ঘুম হল না প্রভাতের অপেক্ষায় জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। ঐ বয়সে প্রথম অন্তরের মানসিক যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘটল। কেন যে এত কষ্ট পাচ্ছি তা নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। অমুক ব্যক্তির কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল কারণ আমার মনে হচ্ছিল এ তো ঠিক কথাই। শুধু আমার ক্ষোভ কেন তিনি আমাকে না বলে বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তিকে বললেন, অথচ উনি আমাকে বলার অসুবিধা কোথায়। ভদ্রতাই তো ঠাকুর বাড়ির বিশেষ পরিচয়। বাবাকে কিন্তু বললাম না।

শেষরাতে কাকার ঘুম ভাঙ্গালাম তারপর ঘোড়ার গাড়ি করে রওনা দিলাম। কাকা বেচারা বুঝতে পারছে না এত তাড়া কি অথচ আমার একটি মুহূর্ত কাটছে না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে কাকাকে গোপালবাবুর হাতে সমর্পণ করে আমি তেতলায় পৌঁছলাম। সুদর্শন বলে জোড়াসাঁকোয় একজন ভৃত্য ছিল। নাম শুনে ভাবতাম ঐ বাড়িতেই বোধহয় এর নামকরণ হয়ে থাকবে আমি তখন জানতুম না উড়িষ্যায় এ নাম প্রচলিত। সুদর্শন বল্‌লে বাবামশায় তৈরী হয়েছেন আপনি যান। সে চায়ের ট্রে নিয়ে চলে গেল। কবি মাঝখানের ঘরে লেখবার টেবিলে বসেছিলেন বল্‌লেন বুলা আশ্চর্য সব কথা লিখেছে বাঃ— কিন্তু আমার সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল হল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপস্থিতির সৌরভে আমোদিত আমার মন একদিকে সব কষ্ট ভুলে গেল

কিন্তু অন্যদিকে উদ্গত অশ্রুও রোধ করা অসম্ভব হতে লাগল কবি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "চল পাশের ঘরে বসি, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।" তখনও তিনি সামনের দিকে নুয়ে পড়েন নি, দুটি হাত পিছনের দিকে সংবদ্ধ, দ্রুত সামনের ঘরে এগিয়ে গেলেন—আমি অনুসরণ করলুম, পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে অনেক মজার গল্প সুরু করলেন। সেদিনই আমায় বলেছিলেন ওঁর সোমদাদার কথা। এক সঙ্গে স্কুলে যেতেন ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ সোমদাদা ও ছোট ভাই রবি। ঘোড়ার গাড়ি করে চিৎপুর রোড দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে একটা কোনো নাম ধরে ডেকে উঠতেন সোমদাদা—"কানাই" তারপর বলতেন—দেখি এ রাস্তায় ক'জন কানাই চলছে। এই সোমদাদার বিয়ে হল না। খুব দুঃখ করে বললেন, আমি পাগল বলে বাবা আমার বিয়ে দিচ্ছেন না তবে রবির কেন দিলেন—আমি না হয় বদ্ধ ও যে অর্দ্ধ। —এইসব বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর খেয়াল হল যে আমি নীরব। মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছি। আমার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। আমার মাথায় একটু নাড়া দিয়ে বললেন, "কী গো আজ এত নীরব কেন? নূতন কী কবিতা লিখলে"—এই স্নেহস্পর্শে আমার অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠল, আমি মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলাম। উনি খুব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কী হয়েছে। তখন আমি বলতে লাগলাম, "আমি বুঝতে পারি যে আমি এসে সময়ে এবং অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করি, আপনার সময় নষ্ট করি—কিন্তু সে কথা আমাকে না বলে আমাকে প্রশ্রয় দেন কেন? তারপর অন্যকে বলেন কেন? এতো খুবই স্বাভাবিক যে আপনি বিরক্ত হন—এতো হতেই পারে………"

কবি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এ সংবাদ আমাকে কে দিয়েছে—তখন আমি প্রসাদের দাদার নাম বললাম, উনি খুব বিস্মিত হয়ে বললেন, "প্রমোদ? তার সঙ্গে তো আমার বহুদিন দেখাই হয় না। তাকে আমি কখন বললুম?" "না না আপনি তাঁকে বলেন নি, তাঁকে আর একজন বলেছেন যিনি আপনার আত্মীয়।" "আমার কোন আত্মীয়?" উনি কিছুই ভেবে পেলেন না ওঁর কোন্ আত্মীয় প্রসাদ রায়কে এ সংবাদটি দিতে পারে। তখন আমাকে ঈষৎ বকুনি দিয়ে বলতে লাগলেন—"এ কথা আমাকে স্পষ্ট করে না বলে তুমি আজ যেতে পারবে না। তুমি জান না কী রকম কল্পনাপ্রবণ আমার মন— তুমি যদি না বলে চলে যাও তাতে আমার কত কথা যে মনে হবে—নানা রকম কথা মনে হয়ে আমার কতখানি যে

কষ্ট হবে তা তুমি বুঝতে পারছ না মৈত্রেয়ী, অমূলক কল্পনা সত্য দুঃখের চেয়ে তীব্র কষ্ট দিতে পারে।" এদিকে নামটি বলতে আমার বিশেষ দ্বিধা ছিল কারণ আমার ধারণা জন্মেছিল যে ঐ পরিবারের রবীন্দ্রনাথের উপর এমন প্রভাব আছে যে তাঁদের অনিচ্ছা বা আপত্তিতে আমার পক্ষে এ বাড়ির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। স্পষ্ট করে এত কথা না ভাবলেও আমি মনে মনে ভীত ত্রস্ত ও তাঁদের সম্বন্ধে হীনমন্যতায় ক্লিষ্ট ছিলাম, নামটা শুনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চমকে গেলেন না, খুব সহজভাবে বল্লেন, "ওঃ! তা ওরা আমার আত্মীয় তো নয়।" উনি চেষ্টা করলেন প্রমোদ রায় ও অন্য ব্যক্তিটিকে টেলিফোন করে ডাকবার কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। আমিও বার বার বারণ করতে লাগলাম, আমার যা জানবার ছিল জানা হয়ে গেছে। কিন্তু পরে উনি আমায় বলেছিলেন যে, আমি অমুককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এরকম কথা কেন বলেছ?' 'কি উত্তর দিলেন তিনি?' '—এই এমন তেমন একটা জবাব দিলে।'

সেদিনকার কথাবার্তা সম্পূর্ণ আমার স্মরণ নেই। একটা খাতায় লেখা ছিল সে খাতা কালের প্রকোপে কোথায় ভেসে গেছে! শুধু মনে আছে, সেদিন ফেরার পথে মনে হচ্ছিল আগের দিনের দুঃখটা বিফল হয়নি তার পুরো দাম পেয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ কথাগুলি উদ্ধৃতিতে বলতে পারব না তবে যতদূর মনে আছে লিখছি। সেদিন একটু বিশেষভাবে স্নেহ জানিয়ে আমায় বলেছিলেন, "তোমাদের ভক্তির অর্ঘ্য যদি আমাকেও পূর্ণ না করত তবে আমি সময় নষ্ট করতে দিতাম কেন? যেমন ফুলের সুগন্ধ, পরিচ্ছন্ন বাতাস, ঈশ্বরের দান তেমনি তাঁর দান মানুষের ভালবাসা স্নেহ ও ভক্তি। আলো বাতাসের মতই এই দান আমি অজস্র পেয়েছি কিন্তু তা অবহেলা ভরে নয়, কৃতাঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করেছি। যে প্রীতি যে শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর সমস্ত কালের সীমা সে অতিক্রম করে। স্থায়ীকালের মধ্যে চিরকালের সম্পদ দেয়। ভালোবাসা প্রীতি ও ভক্তি প্রাণ সঞ্চারক—এবং একজন কবির পক্ষে এর উত্তাপ না পেলে তার কাব্য সমৃদ্ধ হতে পারে না শুকিয়ে যায়।" ....

এই ক্ষণকাল ও চিরকালের কথাতেই উনি চলে গেলেন সেই কথায়—যা বারবার লিখেছেন নানা স্থানে, নানা পরিপ্রেক্ষিতে। একজনের মধ্যে যে দুই সত্তা বাস করে তার কথা। সেই উপলব্ধি যাতে ক্ষণিককে অনন্ত থেকে পৃথক করা যায়, যে উপলব্ধি ঘটলে মানুষ তার দ্বৈত সত্তায় ক্ষুদ্রকে অবদমিত করে শান্তকে অনুভব করতে পারে হয়ত তার কথাই

আমাকে বলে চলেছিলেন আমাকে সান্ত্বনার জন্ম, আমি তাঁর চেয়ারের সামনে মাটিতে বসে চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। আমার ডান কাঁধের উপর রাখা তাঁর দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ যেন সোনার কাঠির মতন আমার মনের ভিতর এক সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। তিনি কথাগুলো বলছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করে বলা হলেও সে যেন নিজেকেই বলা—আমার অশ্রুধৌত মুগ্ধ মনের উপর দিয়ে তা জলস্রোতের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে বুদ্‌বুদের শ্বেত ফেনা তুলে ভেসে যাচ্ছিল আর জলধারা যেমন তপ্ত মাটিকে স্নিগ্ধ করে দেয়, দ্রব করে দেয়, তেমনি আমার মনের ভিতরটা শান্ত হয়ে গেল, ক্ষোভের দাহ জুড়িয়ে গেল। ভোরবেলার ভেজা ফুলের সুগন্ধের আভাসে যে পুজা ও আনন্দের মেশামেশি আমি যেন তারই স্পর্শ পেলাম, কিন্তু আমি কবির বক্তব্য আজ যেমন এ চিঠি পড়ে বুঝছি তেমন বুঝতে পারলাম না। বয়স্ক হয়ে সেদিনের কথা যখন মনে পড়ে তখনই মনে হয় বোঝবার কত পথই না আছে। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় তা সীমাবদ্ধ আর হৃদয়মন দিয়ে যা বোঝা যায় কী অসীম তার সংবেদনা।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ছোটদের জন্ম কোনো সত্যকে তার উপযুক্ত ভাষায় সরলীকৃত করে বলা সত্যকেই ছোট করা, সবটা যদি তখনই বুঝতেও না পারে তবু যে বোঝাটা সুরু হয় সেটা সত্য। 'গুহাতীত' প্রবন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে এই কথাই বলেছেন।

সেই দিনই তাঁর শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার কথা, ফিরে গিয়েই আমাকে এই চিঠি লিখেছিলেন, এ চিঠি পাবার আমার প্রত্যাশাই ছিল না, কারণ যেমন করে সেদিন আমার অঞ্জলি তিনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তা আমি আশাও করতে পারিনি তাই একভাবে যে ব্যক্তির ব্যবহারের কারণে এটা সম্ভব হল তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম, এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হল আঘাত কি করে আনন্দ হয়ে ফিরে আসতে পারে।

চিঠিখানি নিয়ে আমি বাবার কাছে গেলাম, পূর্বাপর কিছু না বলে শুধু পড়তে দিলাম, বাবা সেদিন আমাকে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" শ্লোকটি শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ থেকে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। একটি ডালে যে দুটি পাখী বসে আছে একটি খাচ্ছে আর একটি দেখছে······কিন্তু চিঠি এবং ঋষিবাক্য দুইই আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল শুধু 'অসতো মা সদ্‌গময়' মন্ত্রটি বুঝতে পারলাম। আর কী এক অজ্ঞাত ব্যাকুলতায় বাবার কোলে মাথা রেখে আমি কাঁদতে লাগলাম—সারা মন দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম এই

গুরুবাক্য যেন সফল হয় আমার জীবনে, যেন অসত্য থেকে সত্যে প্রবেশ কোনো লোভে দ্বিধা সংশয়ে বিচলিত না হয়। হায় তখন জানতাম না বার বার কত পতন না ঘটবে। কতবার অন্ধকার নামবে সত্যের জ্যোতিকে আড়াল করে। কতবার ক্ষুদ্র আমির স্পর্ধিত বিস্তার আমার অজ্ঞাতসারেই আমাকে খণ্ডিত করবে, কী কঠিন ক্ষুদ্রের নিবিড় আলিঙ্গন থেকে বের হয়ে অনন্তবোধে মুক্ত হওয়া।

একটি অস্তিত্বের মধ্যে নিবিড় বন্ধনে যে দুই সত্তা বাঁধা তার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলেছেন, এবং ভোরবেলায় সূর্যাভিমুখী হয়ে বসে সেই ক্ষুদ্র আমির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ সত্তার স্পর্শলাভের চেষ্টাই তার প্রতিদিনের উপাসনা।

বাবা ঐ চিঠিটা ভুলতে পারলেন না বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রের কথা থাকায় তিনি নানা ভাবে আমাকে বোঝালেন এই চিঠির উত্তর এবং একটি দীর্ঘ উত্তর কবির কাছে গেল—সে আমার নামে গেলেও বাবারই লেখা। আমার আর কোনো চিঠি লেখার দরকারই ছিল না। শাস্ত্র আলোচনার তো নয়ই। উত্তরে অবশ্য একটি দীর্ঘ চিঠি পেলুম।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

যে জিনিষটা বিশেষ অবস্থায় অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি সেটা তর্কের বিষয় নয়। সেটাকে যে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারব এমন আশা করিনে। বুঝিয়ে দিলেও সেটা ব্যবহারে আসতে পারবে কিনা তাও জানিনে। তবু তুমি প্রশ্ন করেচ বলে কথাটা বলে নিই।

পৃথিবীর একটা গতি আছে সূর্যের চারিদিকে, সেই গতিতে সে সমস্ত সৌর গ্রহের সঙ্গে এক মহা প্রদক্ষিণে মিলিত, আর একটি গতি আছে সেটি তার নিজের চারিদিকে সেইটিতে তার নিজেরই দিন রাত্রির আলো ও অন্ধকারের আবর্তন চলচে। তার ছোট গতিটাও তার বড় গতির সঙ্গেই সঙ্গত। তার কক্ষ কেন্দ্রস্থিত মহা জ্যোতিষ্কেরই আকর্ষণে। বস্তুত সে যেন তার আত্মপ্রদক্ষিণকেই উৎসর্গ করচে তার বড়ো প্রদক্ষিণের কাছে। তার বড়ো প্রদক্ষিণেরই অক্ষমালার ৩৬৫ গুটি হচ্চে তার ছোট আবর্তন। পৃথিবীর এই দুই গতির সামঞ্জস্য প্রকৃতির সনাতন নিয়মে বাঁধা হয়ে গেছে। কিন্তু

মানুষকে নিজের ইচ্ছাকৃত সাধনায় বেঁধে নিতে হয়। যখন সে আপন দুঃখ সুখের, আলো অন্ধকারের দোলাকেই একান্ত করে জানে তখন তার সেই সঙ্কীর্ণ জীবন যাত্রার লাভ ক্ষতি উৎকট হয়ে উঠে সত্যের ছন্দকে হারায়। এই জন্যেই নিজের যাত্রাপথের কেন্দ্রস্থলে নিরন্তর নিজেকেই না দেখে মানুষ যদি পরম জ্যোতিকে দেখতে পায়, তাহলে তার আত্ম আবর্তন প্রতিদিনই নিজেকে অতিক্রম করে চলতে পারে। তারই মধ্যে বদ্ধ হয়ে সে নিরর্থক হয় না।

আমাদের ছোটটিই যে আমাদের একমাত্র সত্য এই বিশ্বাস প্রতিদিন জীবনে সঞ্চীয়মান হয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এই কঠিন জড় বিশ্বাসকে ক্ষয় করতে হয় প্রতিদিন নিজের ক্ষুদ্র আবেষ্টন থেকে নিজেকে দূরে এনে বড়োকে উপলব্ধির সাধনায়।

দূরে আনার মানে বর্জন করা নয়। আমার মনে বিশুদ্ধ সুরের একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শটি না থাকলে আমার পক্ষে সঙ্গীতের কোনো অর্থই থাকে না। কিন্তু সেই আদর্শ যদি কেবল মনেই থাকে তাহলেও তাকে সঙ্গীত বলা চলে না। এই জন্যে বীণার তারে যখন সুর নেমে যায় তখন বীণাকে বর্জন করার দ্বারাই আমরা সঙ্গীতের বিশুদ্ধি লাভ করবার আশা করিনে—ধ্যানস্থিত সুরের বিশুদ্ধ আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে বীণার সুর বাঁধলে তবেই সঙ্গীত সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই আদর্শ সুর সঙ্গীতের ধ্রুব সত্যে আশ্রিত, তাকে শিক্ষায় সাধনায় আমরা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখি। কিন্তু তারপরে সেই উপলব্ধিকে গান গাওয়া দ্বারা প্রকাশ করতে থাকলে তবেই দুইয়ের যোগে সঙ্গীতের সৃষ্টি হতে থাকে। অন্তরে যদি উপলব্ধি বিশুদ্ধ না হয় তবে বেসুরের বন্ধনজাল বিভীষিকা হয়ে ওঠে। বীণার তারে বন্ধনকে স্বীকার করি। কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আবির্ভাব হয় বিশুদ্ধ সুরের আনন্দে। জীবনে যখন দেখি কর্কশতা তখন পালিয়ে সেটাকে পরিহার করবারে ইচ্ছা বারে বারে নিষ্ফল হয় তখন অন্তরের মধ্যে সেই সত্যকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে হয় যার মধ্যে শান্তি যার মধ্যে কল্যাণ। বাইরের বেসুর থেকে অন্তরের মধ্যে দূরে আসতে হয় কিন্তু বাইরের সুরকেই মেলাবার জন্য সেই সুর যখন মেলে তখন একই কালে দূর ও নিকটের সামঞ্জস্য ঘটে তখন তন্দ্‌্রে তদিহন্তিকে চ।

সব কথা বোঝাবার শক্তি নেই, বোঝবার শক্তিও যে আছে তাও নয়। মনে হচ্ছে তোমাকে লিখেছিলুম আমি আপনার থেকে দূরে যাবার পথে

যাত্রা করেছি ; সেই কথাটাকে দুর্ব্বোধ করে রাখব না বলে এই চিঠিখানা লিখলুম। কিন্তু এই আলোচনা অনুসরণ করে আরো অনেক চিঠি লিখতে পারব এমন আশা করি নে—কেন না কাজ বিস্তর। অথচ নানা ব্যাঘাতে কোনো কাজই যেন শেষ হতে চায় না। নানা প্রকার আশপাশের কাজের সূত্রে নিরবকাশের জাল অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠলে আসল কাজগুলো ক্লিষ্ট হয়ে পিষ্ট হয়ে বিকৃত হবার আশঙ্কা ঘটে। ই.তি ১৬ নভেম্বর ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠির মধ্যে দুটি আশ্চর্য ও সুন্দর উপমা আমার কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিজের অন্তরের কেন্দ্রস্থলে পরম জ্যোতিকে দেখা কি, তা সাধক ছাড়া হয়ত কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকের অন্তরে নিজস্ব জ্যোতির্মণ্ডল হয়ত সামান্য মানুষও সৃষ্টি করতে পারে। আমার মনে হচ্ছিল আমি তার আস্বাদ পাচ্ছি কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপে আমার মনে সেই জ্যোতিই বিকীর্ণ করছিলেন যা জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত হয়ে অপার আলোকসাগরে আমাকে ভাসমান রেখেছিল। এর কিছুদিন পরে আমার অদৃষ্টে খানিকটা দুঃখভোগ ঘটেছিল তখনও আমি এই উৎস থেকেই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছি। যতবারই কোনো বঞ্চনা সত্য বা কল্পিত, কোনো লাঞ্ছনা কারণে বা অকারণে ঘটেছে সেই অন্তরস্থ কেন্দ্রবিন্দু থেকে জ্যোতির উৎসরণ জীবনকে মলিন হতে দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে যে সুধার স্বাদ ছিল আজ তা তাঁর গানের ধারায় অনেকের জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে অনেককেই জীবনের ছন্দপতন থেকে রক্ষা করেছে কিন্তু তখন আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন সেই জ্যোতির্ময় বিগ্রহ। তাঁর অস্তিত্বের মাধুর্যে পূর্ণ আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রেম পবিত্র, পূজা নিষ্কলুষ এবং পৃথিবী অর্থময়ী হচ্ছিল। ছোট ছোট লাভ ক্ষতি দুঃখ সুখের ঘটনার মধ্যে নিরন্তর এক আনন্দ রাগিণী বাজতে সুরু করেছিল। তবু এই অনুভূতির মধ্যে একটা কষ্টকর কিছু ছিল। একটা বেদনা ও মাধুর্যের মেশামেশি অবোধ্য কোনো ভাব আমাকে মথিত করত—সেটা কি তা আমি বুঝতে পারতাম না। এর পরের চিঠিটা আমি নিজেই লিখেছিলাম। কোনো দর্শন তত্ত্ব ছাড়া সহজ ও সরলভাবে। কিন্তু কি লিখেছিলাম আজ কিছুই মনে পড়ে না। উত্তরটা পেলাম দুদিন পরই। সেটা এই—
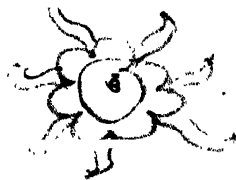
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েচি। চিরদিনই আমার মনটা পথিক। এই পথিকবৃত্তিটা হয়তো আমার স্বভাব। চলাতেই ধ্বনি। বাঁশির বাধার ভিতর দিয়ে বাতাস যখন চলে তখন ধ্বনি জাগে। তটের সীমার ভিতর দিয়ে জল যখন চলে তখন তার কলগান—চিরদিন বাধার মাঝখান দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে, সেই চলাতেই আমার সুর। চলতে গিয়ে ভুলও হয় রাস্তা যায় বেঁকে, ঝড়ে আলো যায় নিবে খরতাপে পথের পথ্য যায় শুকিয়ে। ধাক্কা যখন খাই, তাপ যখন অসহ্য হয়, তখনি খুঁজতে বের হই অন্তরের মধ্যে। বারে বারে দেখা যায় সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে অন্ন আছে, আরোগ্য আছে, শান্তি আছে। সেই শান্তির মধ্যে নিবিষ্ট হতে হতে এক সময়ে বাইরেকার কুৎসা পারুষ্য পঙ্কিলতা আর নাগাল পায় না কিন্তু এই না-এর কোঠায় গিয়েই বিশেষ লাভ নেই। নিজের ভিতর সে অভিমান যে রাগদ্বেষের চাঞ্চল্য আছে সেটাকে অতিক্রম করে একটি সহজ আনন্দ আসে। সেটা কেবল মুক্তির নয়। সেটা সত্য উপলব্ধি সেটা বিশুদ্ধ প্রীতির। এইটেতে উত্তীর্ণ হয়ে এইখানেই স্থিতি পাওয়া দুঃসাধ্য। এইটেকেই যে চাইতে হবে পেতে হবে থেকে থেকে মন সেটা ভুলেই যায়। পূর্ব সংস্কার আচ্ছন্ন করে দেয় সাধনার সংকল্পকে। তাহলেও এটা নিশ্চিন্ত জানতে পারাতেও শক্তি পাওয়া যায়—সেই জানাটা হচ্ছে এই যে, অন্তরের স্তব্ধতার সঙ্গে বাইরের চলাকে মেলালে তবে সার্থকতা। যেমন স্তব্ধ বীণার সঙ্গে গতিশীল গানের সম্বন্ধ। আমার কাছ থেকে শক্তি পাবে এমন আশা করচ। কিন্তু সেই রকম গুরুর অধিকার ত আমার নয়। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু কল্যাণ বিধান করব এমন ঐশ্বর্য কি আমার আছে? ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটা যেদিন পেলাম সেদিনের কথা আমার মনে আছে। সারাদিন নানা কাজের মধ্যে চিঠিটা মনে মনে গুঞ্জরণ করে ফিরতে লাগল। রাত্রি গভীর হয়ে এলে ম্বাইরের স্তব্ধতার মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভবানীপুরের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটা একটা

বাঁকে মোড় নিয়েছে। সামনে একলা দাঁড়িয়ে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ অন্ধকার ঘন করে আছে। আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক সব মিলিয়ে যেন এক গভীর রহস্যের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কি সম্বন্ধ এই বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ মানুষে মানুষে? কোথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কোথায় এই ক্ষুদ্র আমি—কি নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন আমি অনুভব করছি। এর অর্থই বা কি? সেদিন একটা কবিতা লিখেছিলাম। পরের দিন বাবাকে কবিতাটা পড়তে দিলাম। কবিতাটা যে ঠিক আমার মনের তখনকার ভাব সুস্পষ্ট করেছে তাও নয় কিন্তু বাবার খুব ভালো লাগল। তাঁর পকেটে পকেটে ঘুরতে লাগল। এমন কি শুনলাম ইউনিভার্সিটির এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের তিনি শুনিয়ে অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে তাঁর এই উৎসাহের জন্য কেউ তাঁকে নিন্দা করেনি। পরিহাস করেনি। তার কারণ বোধহয় তখনকার মানুষরা অনেক সরল ছিল। এবং অকপট মনের প্রকাশে অভ্যস্ত ছিল। আমাদের সময়ে যখন কবিতা লেখা হত তখন যতদূর মনে পড়ে আমরা নূতন শব্দ চয়ন রচনাশৈলী বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ল কিনা—নজরুলের ঢঙ-এ লেখা কিনা, তাছাড়া কবিতার আয়তন অর্থাৎ কত লাইন হলে একটি পত্রিকার এক পৃষ্টায় এক চতুর্থভাগ হবে এসব চিন্তা করতাম না। মনে যদি কোনো কথা কবিতা হয়ে আসত তাই লিখতাম। সেজন্য আমাদের ফর্মে নূতনত্ব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বারবার নূতন নূতন ফর্মের পরীক্ষা করেছেন—প্রতি বইতে তাঁর রচনাশৈলী বদলেছে। সেটা কলাকৌশলের কারণে নয় ভাবের পরিবর্তনের জন্য। যাই হোক সেই কবিতাটা আমার পিতার এত প্রিয় ছিল যে রবিদীপিকা গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করেছিলেন, তাঁর প্রীত্যার্থে সেই বালিকা বয়সে লেখা কবিতাটি সাহস করে এখানে উদ্ধৃত করছি—

রিক্ত ও মুক্ত

সে কোন রাতে ভেবেছিলাম
একলা বাহির হব
সঙ্গে আমার সঙ্গী নাহি লব,
শয্যা ছেড়ে উঠে এসে খুলে দিলেম দ্বার
সম্মুখেতে শুদ্ধ আকাশ গভীর অন্ধকার
পৃথ্বী যেন সর্বহারা মন্ত্রছায়া মগ্ন
আজ আমারে বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মনে হয়

পথের পাশে বাঁশের ঝোপে কৃষ্ণচূড়ার গাছে
আমার পরম শূন্যতা যে নিবিড় হয়ে আছে
সম্মুখের মোর চলেছে পথ কোথায় নাহি জানি
মৃত্যু যেন মূর্ত হয়ে ফেলেছে জাল খানি
সেথায় এলেন নেমে
ক্ষণেক আমার মুক্ত দুটি দ্বারের পাশে থেমে
অন্তবিহীন অন্তরেতে চিন্তা নাহি জাগে
আপনারে ভিন্ন বলে মুক্ত বলে লাগে
কখন দেখি সম্মুখে মোর আঁধার গেছে টুটে
রক্ত উষার ওষ্ঠ পুটে হাস্য ফুটে উঠে
রাতের মায়া পড়ল ছিঁড়ে দীর্ঘপথ মাঝে
হৃদয়ে মোর এমন করে দৈন্য কেন বাজে।
পুষ্প মেলে মুগ্ধ আঁখি পক্ষী ওঠে জেগে
উচ্ছ্বসিত পূর্বাকাশের রশ্মি রেখা লেগে।
রাত্রি ভরা স্বপ্ন মাঝে গর্বে ছিনু ভরি
আপনারে রিক্ত হেরি মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয় এ রিক্ততায় শূন্য হওয়া
মুক্ত হওয়া নয়।

প্রগতি সংহার

এরই কাছাকাছি সময়ে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাকে কবির লেখা একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। উনি মাঝে মাঝে দুএকটি চিঠি ও প্রুফ দিয়ে যেতেন। প্রায় প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি ভ্রমণে বেরিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রাতঃরাশের টেবিলে আমায় এই চিঠিখানি দিয়ে বললেন রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রত্যেকটি লাইন যত্ন করে রাখা উচিত। আমারই অনেক হারিয়ে গেছে তোমার কাছে তাই এটি রেখে দিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ সেই গল্পটা আর একবার পড়ে মনে হল যেমন আছে তেমনই চলতে পারবে। আরো ভালো করবার প্রলোভনে অনেক সময় কিছুই করা হয় না। তাই অমিয়কে কপি করতে দিয়েছি—লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব কাল সকালে এই চিঠি পাওয়ার পূর্বেই পাবেন। এই সহজ বুদ্ধির

কথাটা যথাসময়ে যদি মনে উদয় হতো তাহলে এই বিলম্ব ঘটত না। যাই হোক নিতান্ত অসময়ে পৌঁছবে না আশা করি। আজকাল ব্যস্ততার অন্ত নেই—তাই মাথাও ঘুলিয়ে গেছে। যা স্মর্তব্য এবং কর্তব্য তা আমল পায় না। তাই অনেক অপরাধ জমা হচ্ছে। ইতি ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে যে গল্পটির উল্লেখ আছে যতদূর মনে হয় সেটি 'প্রগতি সংহার'। এই গল্পটি সম্বন্ধে মুখেও অনেক কথা শুনেছি। সেই সময়ে দেশে স্বাদেশিকতার যে উন্মাদনায় বহু মানুষের মন উত্তাল হয়েছিল তার জোয়ার আমাদের মনকেও মাতিয়ে তুলত এবং দুঃখ হত যে প্রত্যক্ষভাবে আমরা যোগ দিতে পারছি না। এ বিষয়ে আমার পিতা সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে নারাজ। পড়াশুনো ছাড়া অন্য কর্তব্য তখন একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু সে সময়ে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমাদের উচ্ছ্বাসের সমর্থন পাইনি। অনেকবার দুঃখ পেয়েছি যখন খুব উচ্ছ্বসিতভাবে কোনো একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ঠোকর খেয়েছি। আমার মনে সন্দেহ এসেছে, যে সন্দেহে আমি দিশাহারা হয়েছি তা এই যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে অগ্নিযজ্ঞ সুরু হয়েছে তা যেন তাঁর সমর্থন পাচ্ছে না। সে সময়ে বিপ্লবীদের কীর্তিকলাপের গৌরবে সারা দেশ টগবগ করে ফুটছে তার নানা শৌর্যবীর্যপূর্ণ কাহিনী যা শুনতাম তা পল্লবিত করে কিছুবা কল্পনার তুলি বুলিয়ে ওঁর কাছে গল্প করতে বেশ লাগত—তিনি নিশ্চয় সেই রোমাঞ্চ সিরিজের সত্য ও কল্পনাকে পৃথক করতে পারতেন তবু গল্প শুনতেন কিন্তু মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারতাম দেশব্যাপী এরকম উত্তেজনার মূল্য সম্বন্ধে উনি সন্দিহান, সত্যি বলতে কি তাতে আমি পীড়িত হতাম। এর কয়েক বছর পরে শান্তি সুনীতি নামে দুটি বালিকা যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে খেলার রিপোর্ট দেখাবার ছলে কাছে গিয়ে পেটে গুলি করে, তখন তার মেমসাহেব কী রকম খাটের তলায় লুকিয়েছিল ভয়ে এই গল্প একজন হেসে হেসে যখন শোনাচ্ছিল তখন তাঁকে উত্তেজিত হয়ে দারুণ ধিক্কার দিতে শুনেছিলাম। ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যক্তিগত ভাবে উনি চিনতেন এবং একটি সৎ মানুষ বলে জানতেন। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই নিষ্ঠুর গুপ্তহত্যার অমানবিকতা এবং তাই নিয়ে সভ্য মানুষের উল্লাস ওঁকে বিচলিত করেছিল এবং আমার বেশ মনে আছে এক মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে যেন চিন্তার বাধা ছাড়িয়ে একটা direct communi-

cation হল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম কবি কি বলছেন। 'চার অধ্যায়' নিয়ে তাই আমায় কোনো মুস্কিলে পড়তে হয় নি। এবং টেররিজমকে সমর্থন করায় কি সর্বনাশ এগিয়ে আসে তা চিরদিনের জন্য মনে গেঁথে গেল।

'প্রগতি সংহার' গল্পটি খুব প্রচলিত নয়। জানি না আমার বর্তমান পাঠকদের তা স্মরণ হবে কি না, এই গল্প ও নামঞ্জুর গল্পর বক্তব্য প্রায় একই।

নামঞ্জুর গল্পের অমিয়া 'দেশাত্মবাদিনী' তার ভক্ত ছেলেটিও দেশপ্রেমের জোয়ারে এত উচ্ছ্বসিত যে সে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল কিন্তু যেই শুনল অমিয়া নীচবংশোদ্ভব অর্থাৎ কাহার রমণীর কন্যা অমনি তার সব ভক্তি উধাও। সে প্রস্থান করল ও সদ্বংশে বিবাহ করল। প্রগতি সংহার গল্পটিও এই রকম। এই গল্প লেখার অব্যবহিত পূর্বে একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা কলকাতায় মেথর ধর্মঘটের আন্দোলন করে কৃতকার্য হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে সে সময়ে ধর্মঘট এত সহজ ছিল না। কথায় কথায় কোনো একটি গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য সমস্ত সমাজকে বিপদগ্রস্থ করার নীতি সকলের অনুমোদন লাভ করে নি। অন্যদিকে নিরস্ত্র ভারতের ধর্মঘটই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। যাই হোক, কোনো একজন নারী যে সমস্ত কলকাতা সহরকে জঞ্জালে ডুবিয়ে দেবার জন্য উগ্রভাবে চেষ্টিত হয়েছেন এটা কবির মনোমত হয় নি। কথাচ্ছলে পরে একদিন আমায় বলেছিলেন, এসব দরদ কতটা নির্ভেজাল তার প্রমাণ হয় যখন নিজে কতটা ত্যাগ করতে পারে তা দেখি। প্রগতি সংহারের নায়িকা বিপন্ন মেথরকে গাড়িতে নিজের পাশে বসাতে পারল না। যে সব গোঁড়ামি কুসংস্কার ভিতর থেকে সংশোধন না হলে স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন দেশ, তৈরী হয় না, কবির মনে হচ্ছিল বাহ্যাড়ম্বরে সেই ভিতর থেকে গড়ে তোলার সহিষ্ণু সাধনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

আগেই লিখেছি কলকাতায় এলে কবি আমাকে খবর দিতেন। আর বিচিত্রাঘরে মাঝে মাঝে যখন কোনো নূতন বা পুরাতন রচনা পাঠ করে, শোনাতেন তখন বিচিত্রা ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে আমিও একপাশে স্থান পেতাম। বাবাও কখনো কখনো যেতেন। তখনকার জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশে সুসজ্জিত বিচিত্রা ঘর মহাভারতে বর্ণিত দেবসভার মত মনে হত। একবার অচলায়তন গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পড়েছিলেন। হাসিয়ে হাসিয়ে রসিয়ে রসিয়ে গান গেয়ে গেয়ে। সেদিন ঐ গানটি ওঁর মুখে শুনেছিলাম "ও অকূলের

কূল, ও অগতির গতি ও অনাথের নাথ ও পতিতের পতি” আমাদের চোখে জল এসে ছিল। বাবা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যে এই রকম সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করতে পারেন এমন Complete Surrender—তাই তাঁর এত বিদ্যা ও প্রতিভা সত্ত্বেও এত কোমলতা। মনে আছে সেদিন রামানন্দবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পরে বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে ওঁরা দুজনে আলাপ করছেন আমি সেখানে গিয়ে প্রণাম করলাম। রামানন্দবাবু কবিকে বললেন, “মৈত্রেয়ী আপনার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে আর আমাকেও যে একটুকু স্নেহ করে সে আমি আপনার গল্প বলি বলে।” পরে এই কথা তিনি 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন। কথাটা খুব সত্য। রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমার ভাব ঐ কারণেই। আমরা সমমর্মী। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা শুনলে আমরা উভয়েই সমান মর্মাহত হতাম। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ি যখন আমার কাছে প্রায় অপরিচিত তখন রামানন্দবাবুর কাছেই গল্প শুনে শুনে সে বাড়ির একটা উজ্জ্বল ছবি আমার মনে আঁকা পড়েছিল। শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরোস্ক পুরুষ, অপরূপ সব নারী মূর্তি রূপে গুণে অতুলনীয়া অভাবনীয় তাদের শিল্পরুচি অভিনয়ে নাটকে সঙ্গীতে ঝলমল এক পারিবারিক সমারোহ যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সেই গল্প শিশু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁকে পিঁড়িতে বসিয়ে তাঁর পিতা যে বলেছিলেন, এই জাতকের যশ এই আলোকশিখার মত ছড়িয়ে পড়বে। কি সুন্দর ভবিষ্যৎ বাণী। রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনতে স্কুল পালিয়ে রামানন্দবাবুর বাড়ি হাজির হতাম। সেখানে কালিদাস নাগ ও শান্তাদেবীর ঘরে আশ্রয় মিলত। জলখাবারও নিয়মিত বরাদ্দ ছিল। শান্তাদেবী আমার কবিতা শুনতেন ও রবীন্দ্রনাথের গল্প শোনাতেন। পরে শুনেছি একবার নাকি তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মৈত্রেয়ী আপনার গল্প শুনতে ভালোবাসে। ও কবিতাও ভালো লেখে তবে একটু ক্ষ্যাপাটে।'

উত্তরে কবি নাকি বলেন, “ক্ষ্যাপা তো নিশ্চয়ই নৈলে কবিতা লিখবে কেন!”

অচলায়তন পাঠের দিনের তারিখ সাল আমি মনে করতে পারছি না তবে সেদিন আমার আর একটি অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, আমি রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে দেখেছিলাম। সে সময়ে পরিচিত মহলে নগেন্দ্রনাথ খুবই নিন্দিত হচ্ছিলেন কারণ রবীন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের গুজব গুঞ্জরিত হচ্ছিল। যদিও আমার সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে

আলোচনা হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ আমার বয়স খুবই সামান্য। তাছাড়া তিনি পারিবারিক বিষয়ে সহজে কারু সঙ্গেই আলোচনা করতেন না।

অচলায়তন পড়বার আগে বিচিত্রায় যখন জনসমাগম হচ্ছে তখন আমি তিনতলায় কবির ঘরে দেখা করতে যাচ্ছি—তখন তাঁর বিকালের জলখাবার সময়। মনে হল ঘরে কেউ আছেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম যিনি এসেছিলেন তিনি বেরিয়ে গেলে ঢুকব। নিম্নস্বরে কথা হচ্ছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আগন্তুকের কিছু টাকা পয়সার দরকার রবীন্দ্রনাথ তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। ইনিই নগেন্দ্রনাথ। আমার বাবা মা এই কথা শুনে শ্রদ্ধানত ও অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উদারতায়। এই রকম একটি অভিজ্ঞতা অমল হোমের হয়েছিল। পুলিন বাবুর কাছে শুনেছি। একদিন তিনিও পাশের ঘর থেকে শোনেন নগেন গাঙ্গুলী জুতো ঠুকে ঠুকে স্পর্ধিত ও রাগতভাবে বলে যাচ্ছে। পরে একথা তুলে অমলবাবু যখন অভিযোগ করেন বা নিন্দা করেন তখন কবি বলেন, 'তা ওরও তো কিছু বলবার থাকতে পারে।'

অচলায়তন পড়া শেষ হবার পর সিঁড়ির কাছে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল। সুপুরুষ মিষ্টভাষী ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সুরেন দাশগুপ্তের মেয়ে? আমার চেহারা এতই বাবার মত ছিল যে কাউকে বলে দিতে হত না। রামমোহনের জন্মজয়ন্তী উৎসব খুব ঘটা করে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম—প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে পথ করে তাঁকে ডায়াসে নিয়ে যাওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে দীন যথা রাজেন্দ্রসঙ্গমে আমিও উচ্চাসনে উন্নীত হলাম। নিচে তিলার্ধ স্থান নেই। ডায়াসে কয়েকখানি চেয়ার ছিল। পাগড়ী বাঁধা উজ্জ্বল মুখশ্রী একজন ভদ্রলোক আমার পাশের চেয়ারে বসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি দাশগুপ্তের কন্যা?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী করে বুঝলেন?' "তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।" তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন, "আমি রাধাকৃষ্ণন।"

চিত্রকর

১৯২৯ সালে আমি রবীন্দ্রকাব্য অনেকটাই পড়ে ফেলেছি। কবিতার ছন্দে ও ভাবতরঙ্গে ভেসে আমার ক্ষুদ্র জীবনের প্রতিটি দিন নূতন নূতন জগতে প্রবেশ করছে, বিচিত্রায় প্রকাশিত কবিতাগুলি পড়ছি—মন যেন স্বপ্নে বিভোর। বলাকা পড়া হয়েছে। তাজমহলের কবিতা পড়া হচ্ছে. খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানে

বোঝা হচ্ছে—"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি ভারমুক্ত সে এখানে নাই।" এই আমি কে? তাজমহল না কবি নিজে? এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় পিন্তা কন্যার দিনগুলি পরিপূর্ণ। কিন্তু কবির একটা দিক তখন আমাদের কাছে দুর্বোধ্য সে হচ্ছে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের। এই সময়ে রঙের উৎস ঝরে পড়ছে পাতায় পাতায় যে কাগজ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ভরা তার উপর, ভেসে উঠছে নানা অবয়ব, নানা মূর্তি। এক এক দিন সারা দিন ধরে এঁকেই চলেছেন এঁকেই চলেছেন। এমন সব ছবি তৈরী হয়েছে যা আমাদের কাছে অদৃষ্টপূর্ব। তখন ইয়োরোপের শিল্প বিবর্তনের খবর আমাদের কিছুই জানা ছিল না। পল গগাঁ বা ভ্যান গগ প্রভৃতি শিল্পীরা ভারতের চিত্র জগতে উদয় হন নি। কিছুদিন আগে থেকে ভারতীয় চিত্রকলার পুনর্জীবন লাভ হচ্ছিল অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ইচ্ছায়। ওকাকুরা এসে চোখ খুলে দিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দিকে, কিন্তু দুচার জন রসিক ছাড়া সকলেই অবাস্তব মানুষ্যাকৃতি, অসম্ভব ফল, অসম্ভব পাখী দেখতে রাজী ছিল না। লোকশিল্পে পটে মাটির পাত্রে মন্দিরের গায়ে সে সব রূপচ্ছায়া আজ আমাদের এত মন ভোলায় তা তখন কারু লক্ষ্য হত না। বিলিতি ছবির নকলে আঁকা বিবস্ত্রা নারীমূর্তি তখন বেশির ভাগ ধনীগৃহে টাঙ্গান থাকত। ছবি হবে সৃষ্টিকর্তার হাতের কাজের অবিকল নকল—খুব অবিকল নয়, কারণ প্রত্যেকটা ছবির মানুষ হবে অপূর্ব রূপ লাবণ্যবতী—ঈশ্বর অবশ্য ঠিক সে রকমটা করেন না।

মানুষের অন্তরের ভাবরূপকে প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ, তাতে তার ছবি প্রকৃতির সঠিক অনুকরণ হোক বা না হোক। চীন ও জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলোও এই রকম শিল্পীর ভাবরসে সিক্ত। কিন্তু তখন ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় শিল্পকলার প্রভাবে আমাদের দৃষ্টি ছিল এক মুখী। অবনীন্দ্রনাথের ছবির লম্বা লম্বা আঙ্গুল দেখিয়ে অনেকেই বলতেন, ও রকম কখনো মানুষের আঙ্গুল হয়। অনেক ক্যারিকেচারও আঁকা হত—লম্বা লম্বা আঙ্গুল পটলচেরা চোখ ইত্যাদির। অনেকেই তখন ভুলে গিয়েছিলেন সাহিত্যেও এরকম অত্যুক্তি আছে। 'করকমল' সত্যই পদ্মের মত নয়। 'মৃগপতি জিনি মধ্যদেশও'-ও হতেই পারে না। এমন কি নুরজাহানের ওজনও সত্যি সত্যি চৌদ্দ সের ছিল না।

যখন ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা দেখতেই কেউ অভ্যস্ত নয় তখন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ চিত্রকলার যে নিবিড় লোকোত্তর ভাব তা লৌকিক চোখকে এড়িয়ে যাবেই।

কবি বলতেন, "দেখতে দেখতে চোখ তৈরী হবে। যখন তুমি আমার ছবি দেখতে পাবে, তখন আমি থাকব না। এখন তুমি চেয়ে আছ বটে কিন্তু দেখছ না কারণ চোখ তো দেখে না, দেখে মন"—বলা নিষ্প্রয়োজন সে সময়ে আমি তাঁর ছবি দেখতে পাইনি। এবং শঠতা করবার ইচ্ছা কোনো দিনই আমার ছিল না বলে সে কথা বারবার বলে তাঁকে দুঃখিত করেছি।

এখন দেখতে পেয়েছি—এখন বুঝতে পারি ছবির জগতেও তিনি এ যুগের একচ্ছত্র সম্রাট।

······এখানে মনে পড়ছে একটি দিনের কথা সন তারিখ ঠিক মনে নেই তবে প্যারিসে চিত্র প্রদর্শনীর কিছু আগে কারণ সে দিন তিন তলার ঘরে ছবি স্তূপাকৃতি হয়ে ছিল। কবি মাটিতে জাপানী ধরনের বিছানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন। মনে হয় তখনকার বয়স্ক মানুষদের মধ্যে জাতীয় অভ্যাসগুলো অবশিষ্ট ছিল এখনকার দিনে ঐ বয়সের ও ঐ রকম অবস্থার মানুষরা অত সহজে মাটিতে বসা ওঠা করতে পারেন না। যা হোক কবি ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন আমি তাঁকে একটি স্বরচিত দার্শনিক কবিতা পিতৃ নির্দেশে শোনাচ্ছিলাম। বাবা তখন আমার বই ছাপাবেন বলে কবিতা বাছাই করছিলেন। কোনো কবিতা পছন্দ না হলে আবার লেখাচ্ছিলেন, যে কবিতাটি শোনাতে বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেটার সমস্ত চিন্তা যুক্তি ও ব্যাখ্যা বাবার, আমি খালি ওঁর বক্তব্যকে ছন্দোবদ্ধ করেছি। আমার একেবারে ইচ্ছা নেই যে শোনাই কিন্তু ফিরে গিয়ে বাবাকে মিছে কথা বলবারও ইচ্ছা নেই। যাই হোক সেদিনের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে—আমি মাটিতে বসে তাতামির উপর খাতা বিছিয়ে পড়ছি আর উনি মন দিয়ে শুনছেন তারপর আমার মাথায় একটু নাড়া দিয়ে বললেন। "তোমার ডালিম গাছের কবিতাটা তো খুব ভালো হয়েছিল কারণ ওটা তোমার নিজের উপলব্ধির বিষয়। ঐ রকম যে কয়েকটা পাঠিয়েছ আমার ভালো লেগেছে—যেগুলো নিজের মনের কবিতা লেখ ভালো হয় কিন্তু এ কবিতার তত্ত্ব তোমার অন্তরের জিনিষ নয়। ভোগ আর ত্যাগের তুমি জান কি সীমন্তিনী যে 'ভোগপাত্র' কবিতা লিখেছ।"

এমন সময় সুদর্শন খবর দিল অসিত হালদার এসেছেন—সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী অসিত হালদার ঢুকলেন। এমন লোকের নাম অসিত কি করে হল জানি না। তাঁর রঙ গৌরবর্ণ আগুনের মত জ্বলছে। কোঁচান ধুতি চাদরে দীর্ঘদেহ —অতি সুন্দর করে সাজানো। কবি ছবিগুলির দিকে নির্দেশ করলেন, "এসো

ঐ ছবিগুলি দেখা যাক।" প্যারিসে প্রদর্শনীর জন্য ছবি বাছা হতে লাগল—একটার পর একটা ছবি তুলছেন আর আলোচনা হচ্ছে সে সব কথা আজ আর মনে করতে পারি না শুধু মনে আছে আর্টিস্টের লম্বা দীর্ঘ শুভ্র আঙ্গুলের উপর একটা বড় লাল পাথরে আলো ঠিকরে পড়ছিল। ছবি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লান্তভাবে ছবিগুলোর আলোচনা হচ্ছিল কিন্তু কি নিরিখে ছবি নির্বাচিত হচ্ছিল তা আমি মনে করতে পারছি না। ছবি সম্বন্ধে আমার তৎকালীন অনভিজ্ঞতাই এর কারণ।

সাহিত্য সম্মেলন

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ইতিমধ্যে আবার কলকাতায় যাবার কথা ছিল, মনে করেছিলুম তখন তোমার সঙ্গে দেখা হলে কিছু কথাবার্ত্তা কব। সে আর ঘটে উঠল না। বরোদায় শীঘ্রই যেতে হবে অথচ শরীর কিছু অসুস্থ আছে এ অবস্থায় পথ যাত্রার পরিমাণ ও দুঃখ আর বাড়াতে সাহস হয় না। তোমার অল্প বয়স, সর্বদা নিজের মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। চারিদিকের সঙ্গে বেশ সহজভাবে যোগরক্ষা করে নির্মল প্রসন্নতা নিয়ে দিন কাটানোর মতো সাধনা আর কী আছে। অসামান্য কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করা দুর্ব্বলতা। নিজেকে অনায়াসে ও অবাধে দানের শক্তিকে প্রতিদিনের সহস্র সামান্য উপলক্ষ্য নিয়েই চর্চ্চা করতে হবে। বাইরের সাধারণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যখন স্নিগ্ধ এবং অক্ষুব্ধ হয় তখনই বুঝতে পারি ভিতরের দিকে আমরা সিদ্ধি লাভ করেছি। অহমিকা কাটিয়ে ওঠার মত এমন দুরূহ অধ্যবসায় আর কিছু নেই—তাকেই ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা আমাদের চিরাভ্যাস—সকল কিছুতেই নানা আকারে সে নিজের দাবী উপস্থিত করে, স্বনামে বিনামে, সব সময় তাকে চিনতেই পারিনে। তার একটু আঘাত একটু ক্ষতিতে চারিদিক আলোড়িত করে সে ধূলা উড়িয়ে দেয়, তখন তাকে ভর্ৎসনা করে তাকে থামিয়ে দেবার কথা মনেই থাকে না, কেন না চিরকাল তাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি এতেই যত অশান্তি যত দুর্যোগ ঘটে। যখন মনে করে বসে আছি এই দুর্দ্ধর্ষটাকে নিরস্ত পরাহত করেচি এমন সময়ে কোথা থেকে সামান্য একটু নাড়া পেয়েই সে উদ্যত হয়ে ওঠে, ভুলে যাই।

নিজের পরাভব। তবু হাল ছাড়লে চলবে না—এই চঞ্চলটাকে বাইরে সরিয়ে নিজের থেকে একে পৃথক করে দেখতে হবে। কাজটা একেবারেই সহজ নয় ক্ষণে ক্ষণে পরাভব ঘটলে অবসাদগ্রস্ত হোয়ো না। একটি অভ্যাস নিত্যই করতে হবে, যারা তোমার চারদিকে আছে তাদের প্রতি সহিষ্ণু হোয়ো, প্রসন্ন হয়ো—একটি প্রফুল্লতার আলোক তোমার অন্তর থেকে বিকীর্ণ হতে যাতে বাধা না পায় এইটি কোরো, তুমি আছ বলেই সংসারে একটু মাধুর্য আছে, সংসার যাত্রার কর্কশতা একটু দূর হয়েছে এর মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই। চারদিককে যতই তুমি আনন্দিত করবে ততই আনন্দ স্বরূপের আবির্ভাব তোমার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হবে। নিরন্তর নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নিজেকে ক্লান্ত কোরো না—হাসিমুখে সহজ আনন্দে দিনগুলিকে অনুকূল স্রোতের নৌকোয় মত ভাসিয়ে দিয়ো। বার বার মনকে বলিয়ে নিয়ো—আনন্দং পরমানন্দং পরম সুখং পরমাতৃপ্তিঃ। ইতি ৮ জানুয়ারী ১৯৩০।

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য সম্মেলন

কোন ব্যক্তিগত কারণে এই সময়ে আমার মনে যে সব উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, চিঠিতে তাঁকে আমি কি লিখেছিলাম মনে করতে পারি না। সে সময়ে আমি চঞ্চল, তপ্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম কেন তা সম্পূর্ণ বোঝবার আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে আমার ভিতরের দুর্দশা হয়ত তিনি অনুভব করেছিলেন।

কবি বরোদায় যাবার কথা লিখেছেন, বরোদায় যাবেন বক্তৃতা করতে, এদিকে প্রায় সেই একই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার কথাও আছে। এত কাছাকাছি সময়ে কি করে দু জায়গায় উপস্থিত থাকবেন সে কথা তাঁর পার্শ্বচরেরা কেন খেয়াল করলেন না কে জানে—তাঁরা বোধহয় সেই সহজ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন যে একই মুহূর্তে একজনের দুইস্থানে উপস্থিতি সম্ভব নয়, ফলে যা কাণ্ডটা হল তা দুঃখকর। আমরা অনেকদিন থেকে শুনছি কবি সাহিত্য সম্মেলনে আসবেন। বাবা দর্শন শাখার সভাপতি। তিনি স্থির করেছেন এই সুযোগে আমার সাহিত্য-প্রতিভা আরো প্রকাশ করবেন। আমাকে একটা কঠিন দার্শনিক বিষয় দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধ লিখবার জন্য। প্রবন্ধটি নিয়ে পরিশ্রম করতে হবে—লেখা ভাল হলে রবীন্দ্রনাথের সামনে সম্মেলনে পড়া

হবে। একদিকে উৎসাহ অন্যদিকে ভয় এই দুইয়ে মিলে আমার অবস্থা সঙ্কট-জনক। প্রবন্ধটা লেখা হলে বাবা শোনাতে নিয়ে গেলেন দার্শনিকপ্রবর বিশ্রুত-কীর্তি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে। বাবা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বাবা নিজে এত বিষয় জানতেন, এত অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য যে অন্য লোকের দুর্বলতা সহজে তাঁর চোখে পড়ত। অন্যপক্ষে তাঁর মনটা ছিল এযুগের অর্থাৎ বয়স খ্যাতি ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত হবার পাত্র নন। কিন্তু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ছিল অকৃপণ শ্রদ্ধা। প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, কিছু লিখে রেখে গেলেন না, এত অগাধ পাণ্ডিত্য মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে। যদিবা কখনো কিছু লেখেন, তা এত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ যে সাধারণ লোকে দন্তস্ফুট করতে পারবেন না।—কথাটি যে সত্য তা Golden Book Of Tagore-এ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখাটি পড়লে বোঝা যাবে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তখন ল্যান্সডাউন রোডে তাঁর বিধবা কন্যা সরযূবালার বাড়িতে থাকতেন। বুক জোড়া সাদা দাড়ি নিয়ে তিনিও পায়ের উপর একটি চাদর চাপিয়ে আরাম কেদারায় বসে থাকতেন। এই সময় রামানন্দবাবুর সঙ্গেও আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব, তাই আমার সমবয়সী বন্ধু প্রসাদ বলত আমার 'দাড়িপ্রীতি' অসাধারণ।

যা হোক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গুরুগম্ভীর লোক ছিলেন না, ছোটদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতেন—তাঁর কন্যা সরযূদেবীও খুব আলাপী ছিলেন। সরযূদেবী খ্যাতিসম্পন্না, তাঁর কথা অনেকদিন থেকে মহিলা মহলে বিশেষভাবে আলোচিত। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি একখানা বই লিখেছিলেন 'বসন্ত প্রয়াণ'—একই বিষয়ে লেখা আর একটি বইও ছিল বহু আলোচিত, তার নাম 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম'—এটি স্ত্রী বিয়োগে স্বামীর লেখা। তার মধ্যে বিরহের মর্মন্তুদ হাহাকার তখনকার পাঠককে মুগ্ধ করেছিল—কিন্তু এই অমর বিরহ কাহিনী যখন বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছে তখন ভদ্রলোক আর একটি বিবাহ করায় করুণরস পরিহাসরসে পৌঁছয়। সরযূবালা দেবীর বিবাহ হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত কুমারের সঙ্গে। বিবাহের বছর দুয়ের মধ্যেই তিনি মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর সরযূবালা 'বসন্ত প্রয়াণ' নামে একটি সন্দর্ভ লেখেন—দার্শনিকতা ও কবিত্বে মেশামেশি সে বই তখনকার রসিক ও পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। কোনো মহিলার কলমে বাংলা ভাষায় ওরকম বই আগে লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এ-বইয়ের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। তবে সরযূবালাও পুনর্বিবাহ করে-ছিলেন এবং আবার বিধবা হন এই রকম শুনেছি। আমাদের দেশের সংস্কার-বশতঃ বইটি তাই ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত উল্লেখিত হত, এবং ক্রমে লোকচক্ষুর

আড়ালে চলে গেল। সরযূবালা তাঁর বাবার সেবা করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুনেছি শেষ বয়সে দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন—কিন্তু আমি তখন তাঁকে খুব আনন্দে থাকতে দেখেছি। প্রবন্ধটি শুনিয়ে আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক সাধুবাদ পুরস্কার পেয়েছিলাম।

এ সময়ে আমরা বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম—তখনকার দিনে এত সভা, এত উৎসব ছিল না, কাজেই সম্মিলনের খবর সমস্ত সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করেছিল—তার মধ্যে মহাপ্রার্থিত সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আসবেন।

ইতিমধ্যে কম্পিত হস্তাক্ষরে একটা চিঠি পেলাম—

ওঁ

আমেদাবাদ

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছি, তাই দুর্ব্বল। আজ বরোদায় যাচ্ছি।

পথে থামতে থামতে ফিরতে হবে। একটানা অতদূর যেতে পারব না। হয়ত ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পৌছব। তোমার জন্য উদ্বিগ্ন রইলুম। শরীরকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রেখো।

সাহিত্য সম্মেলনের পূর্ব্বে ফেরা অসম্ভব। বক্তৃতাটা লেখা হয়েছে—পাঠিয়ে দেব। ২৪ জানুয়ারি ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তখন বোধকরি রোগে আক্রান্ত। মনও অশান্ত। কিন্তু চিঠির শেষ লাইনটি বাবাকেও অশান্ত করে তুলল। বাবা বললেন, উনি যদি সাহিত্য সম্মেলনে না আসেন, কথা দিয়ে কথা না রাখেন ভীষণ কাণ্ড হবে। সকলে অপেক্ষা করে আছে কেউ ছেড়ে দেবে না। কথার খেলাপ করবেন কেন রবি-বাবু! বাবা আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিলেন, সকলকে দেখাবেন, দুর্বল হস্তাক্ষর দেখে যদি সকলের মায়া হয়।

সেদিনের সাহিত্য সম্মেলন একটি স্মরণীয় সভা। রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ পড়লেন তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। অপরূপ স্বর্ণকুমারী আশী বছরেও অনিন্দ্যা। তাঁর ঋজু দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে একটু ন্যুব্জ ছিল না। তাঁকে আমি দুবার স্টেজের উপর দেখেছি।

সেদিন আমি আমার বহু প্রতীক্ষিত সৌভাগ্য লাভ করলাম—প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করলাম—যাকে লিখিত ভাষণ বলা হয়।

কিন্তু আমার সুখ ছিল না। আশেপাশে চাপা গুঞ্জরণ আক্ষেপ ও নিন্দা। আমাদের গাড়ি চেপে বাড়ি পর্যন্তও অনেকে এলেন নিন্দা করতে করতে। বাবাও দিবা যোগ দিচ্ছেন—না দিয়েই বা করেন কি? সত্যিই তো কথার খেলাপ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ একদিকে যেমন প্রবল, আবার দেখি বিকর্ষণও কম নয়। এত লোক তাঁর সঙ্গের জন্য ব্যাকুল, তারাই আবার নিন্দা করতে পঞ্চমুখ। এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয়, এখন যেমন নির্বিকারচিত্তে লিখে যাচ্ছি তখন তা পারতাম না, কষ্টে চোখের জলে ভাসতুম।

আরো একটা প্রচণ্ড নিন্দা চলছিল। রবীন্দ্রনাথ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে প্রেমের উপন্যাস 'শেষের কবিতা' লিখলেন কেন! এবং মহুয়াতে এত প্রেমের ফুলই বা ফুটল কি করে? এই কি প্রেমের কবিতা লেখার বয়স!

মহুয়া ও শেষের কবিতা মিলে প্রেমের যে বিচিত্র ছবি রূপে রসে ললিতভঙ্গে ঢেউ তুলে এসে আমার ব্যাকুল অশান্ত মনের উপর তরঙ্গাঘাত করছিল তা কোন্ বয়সের লেখকের লেখা তা দিয়ে পাঠকের দরকার কি এ আমি বুঝতে পারতাম না। বাবা অবশ্য বললেন, শেষের কবিতার শেষ কবিতাটি যে গভীর জীবনবোধ থেকে লেখা তা কোন সদ্য গোঁফ গজানো তরুণ প্রেমিকের কলমে বের হবে না, তা অভিজ্ঞতার বস্তু। 'ধাবমান কাল' আমাদের ক্রমাগত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবাহিত করছে। আমরা আমাদের জীবনের খণ্ড খণ্ড টুকরো গেঁথে অখণ্ডর মালা তৈরী করে বলি "আমি"—কিন্তু সেই আমি একটি নিরেট বস্তু নয়—সে নিরবধি কালের মধ্যে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্। প্রেম পড়ে রইল, জীবন এগিয়ে গেল, 'শা-জাহান' কবিতার বিষয়বস্তুও এই।" আমি আবৃত্তি করতে লাগলুম, "জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে, তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে···"। তারপর যে দার্শনিক তত্ত্ব বাবা আমাকে বোঝালেন তা আজ আর মনে করতে পারি না। কিন্তু আলোচনা করে, যুক্তি দিয়ে বোঝা বা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝার চেয়ে মহুয়া আমি অন্তরভাবে বুঝেছিলাম। মহুয়া কাব্য আমার জীবনবায়ুতে প্রবিষ্ট হচ্ছিল। কোনো বিনিদ্র রাতে আধখানা বাঁকা চাঁদ যেন আমারি সঙ্গে কথা বলত—

সুন্দরী তুমি শুকতারা
  সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
  দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

চন্দ্র আস্তে আস্তে এগিয়ে যেত অস্তাচলের দিকে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।...

এই নৈসর্গের বর্ণনা আমার অস্ফুট হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অনাস্বাদিত আনন্দধারা বইয়ে দিত। গভীর রহস্যঘন যবনিকার আড়াল থেকে যৌবনোন্মেষের বেদনায় মন্থিত হয়ে এক অজ্ঞাতলোকের অনির্বচনীয় আভাস আসত। তখন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে একজন অভাবনীয় মানুষ মাত্র নয়। তিনিই তাঁর কবিতার মূর্তি, তিনিই সেই চন্দ্র যাঁর কবিতা জ্যোৎস্নাধারার মতই অবিরাম আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যেন রূপকথার মায়ালোক সৃষ্টি করছিল। এই রবীন্দ্রনাথ বার বার যে-সে লোকের নিন্দাবাণে বিদ্ধ হবেন—এ আমার সহ্য করা কঠিন হত।

আমেদাবাদ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে লিখলেন—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শরীর এখনও কাজের বার। কক্ষ কোণের গবাক্ষে চক্ষু মেলে পর্য্যঙ্ক অঙ্কাশ্রিত হয়ে নিষ্কর্মা বসে আছি। এ অবস্থায় শীঘ্র এখান থেকে নড়চড় হবার সম্ভাবনা দেখিনে। মার্চ মাসে ইয়োরোপে যাওয়ার একটা জনরব উঠেছে কিন্তু এখনও তার আয়োজন বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। গ্রহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন—আমেদাবাদে পড়লুম রোগশয্যায়—ডাক্তারের হাতে পড়ে সাহিত্য সম্মেলনের লগ্ন পার হয়ে গেল—প্রত্যক্ষে ওষুধ খাচ্ছি পরোক্ষে গাল খাচ্ছি—এইভাবে আমার শুভ মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। একেবারে নাড়ী না ছাড়লে দেশের লোক ক্ষমা করেন না; কিন্তু এমনি ভাগ্য, যমের দূত আসে, তবু রথ আসে না—তাই স্মরণসভায় যারা বিলাপ করতেন সাহিত্যসভায় তাঁরা কটূক্তি করচেন।

তুমি দিল্লী চলেছ কিসের প্রত্যাশায় বুঝতে পারলুম না। আমার আশীর্বাদ। ইতি ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতই চেষ্টা করুন নিন্দার শর তাঁকে বিদ্ধ করে ক্ষত করত কিন্তু খুব দ্রুত আরোগ্য হবার মনোবল তাঁর ছিল। কেউ কোন অন্যায় আক্রমণ করলে সর্বদাই শুনতাম—"ওদের যা বলবার আছে, যা করবার আছে সেগুলো হয়ে গেলেই আর ওদের কিছু করার থাকবে না, তখন আমি মুক্ত।"

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে যে অসৌজন্য, অন্যায় অবিচার প্রশ্রয় পাচ্ছে সাধারণভাবে তোমার কাব্যের ভূমিকায় তার উল্লেখ করেছি। এজন্য তোমাকে যে কেউ ক্ষমা করবে এমন আশা করিনে—তবু বলা ভালো। বিশ্রাম সাধনায় ব্যস্ত আছি অতএব আর নয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারাসান

অল্প বয়সে দেখা শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছবি বার বার মনে আসছে—অবশ্য সন তারিখ ঠিক মেলাতে পারব না। উদয়ন বাড়ি তখন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে—উপরে একখানি বড় ঘর হয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ আছেন। প্রতিমাদেবীর সুন্দর পরিপাটি সংসারের আতিথ্যে আরামে শরীর জুড়িয়ে দেয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে প্রতিমাদেবী নিপুণভাবে ভাঁড়ার গুছিয়ে খাতায় লিখিয়ে দিচ্ছেন চার বেলা কী কী পদ রান্না হবে। খাবার ঘরের পাশে যে নিচু একতালা ঘর, যাকে পরে বলা হত 'চারুবাবুর ঘর' (চারু দত্ত) ওটাই ব্লাড়ি বড় হবার আগে ছিল প্রতিমাদেবীর ঘর। নিচু একটি বড় খাট ও একটি লেখবার টেবিল ছাড়া ছোটখাট দু'একটি আসবাব। কিন্তু তার নক্সার সৌন্দর্যে আমার চোখের পলক পড়ে না। মনুষ্যাকৃতি দুটি ইজিপ্সিয়ান কাজের এপলিকো দেওয়ালের একপাশে ঝুলছে। আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরে তখনকার শিল্পকার্যের নমুনা ছিল তুলোর কাকাতুয়া কাঁচের বাক্সে বন্দী হয়ে দেওয়ালে লম্বমান ; এম্ব্রয়ডারি করা ফুল ফল, মাছের আঁশের তৈরী ঘটি বাটি, রেশমে লেখা ফ্রেমে বাঁধান আপ্তবাক্য ইত্যাদি। প্রতিমাদেবীর বসবার ঘরে নানা প্রদেশের সুন্দর জিনিস, সবই ভারতীয় নক্সা। কুশনটি ঠিক করে রাখা, রোদ থেকে ঘুরে এলে ভৃত্য ঠাণ্ডা শরবৎ এগিয়ে দেয়। আগেই বলেছি ভৃত্যকুল পরিমার্জিত তবে প্রায় সবাই জাতিতে ডোম। বোলপুরে রাজবংশীদের বসতি ছিল। আজ থেকে

প্রায় ষাট বছর কি তারও আগে থেকে ঠাকুর পরিবার শান্তিনিকেতনে এই বৈপ্লবিক কর্মটি কি সহজে ও অনায়াসে করেছিলেন, তখন হরিজন আন্দোলনের নামও শোনা যায়নি। বিকেলে প্রতিমাদি আমার চুল বেঁধে দিতেন নিজের হাতে, খোঁপায় মাদ্রাজী ধরনের ফুলের মালা পরিয়ে দিতেন। খুব সুন্দর করে সাজাতে পারতেন প্রতিমাদি। তাঁর কাছ থেকে এই আদর লাভ করবার সুযোগ হয় যখন তখন আমার বয়স চোদ্দ, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নেহযত্ন পেয়ে এসেছি, যতদিন না তাঁর এই স্বর্গের সংসার লোভের দৈত্যের মুগুরে চুরমার হয়ে যায়, যতদিন না স্বর্ণপুরী লুণ্ঠিত হয়।

সন্তানহীনা প্রতিমাদেবীর অন্তর বাৎসল্যরসে পূর্ণ ছিল, যে মেয়েটিকে তিনি মানুষ করেছিলেন সে তখন ৫।৭ বছরের—কোঁকড়া চুলের পাতায় ঘেরা গোলাপের মত সুন্দর মুখ পুপে সত্যিই একটি পুতুল। একদিন খেলতে খেলতে সে বললে, মৈত্রেয়ীদি তুমি আমায় একটা টর্চ দেবে!

আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল, এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ আমার কাছে রবি কিরণে ধৌত উজ্জ্বল—আর পুপের তো কথাই নেই সে তো নাতনী, তাকে নিয়ে তো পূরবীর 'তিন বছরের প্রিয়া' কবিতা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঝগড় কে ঈর্ষা করছেন এরই প্রণয় দরবারে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঝগড়ু কে পুপে'?—'তাও জানো না, জোড়াসাঁকোর জমাদার!' সেই মেয়েটিকে একটা খেলনা দিতে পারব, কী আনন্দ। কিন্তু বাধ সাধল ওর মুসলমান আয়াটি! পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনলাম প্রতিমাদি বলছেন, পুপে তুমি এত জিনিস নাও আবার তুমি চাও কেন? সে ঘটনাটা আজও আমার মনে বেশ স্পষ্ট, আমি যে তুচ্ছ খেলনাটা দেবার সুযোগ পাচ্ছিলাম সে তো ঐ ছোট মেয়েটিকে দেওয়া একটা মাত্র টর্চ নয় সেটা যেন দীপ হয়ে ভেসে চলেছিল রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে অর্ঘ্যের মত—মাঝপথে তার আলোটি নিবে গেল।

শান্তিনিকেতনে যতদূর মনে হয় ১৯২৯ সালে আমি একটি জাপানী মেয়েকে দেখেছিলাম তার নাম বোধ হয় হারাসান—কানাডা থেকে ফেরবার পথে যখন কবি জাপান যান তখন তার শান্তিনিকেতনে আসার কথা ঠিক হয় সে যে ঠিক কবে এসেছিল তা মনে নেই। রোজ সকালে উত্তরায়ণের বারান্দায় বসে সে কুড়ি-পঁচিশটি ফুলদানীতে জাপানী ঢঙে ফুল সাজাতো। তখনকার দিনে এ সব কেউ আমরা দেখিনি। এখন তো ইকেবানা একটি পরিচিত সখ। জাপানী পোশাক পরা মেয়েও আমি সেই প্রথম দেখি। সেই ফুলের মত নরম মেয়েটি পরে যক্ষারোগাক্রান্ত হয়ে, কীটদংষ্ট শুষ্ক বিশীর্ণ হয়ে, জোড়াসাঁকোয় কয়েকদিন

ছিল। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে মারা যায়। তখনকার দিনে নিপীড়িত জাপানী নারীর সমস্ত পেলব কারুণ্য যেন তার মুখে মাখান ছিল। রবীন্দ্রনাথের গৃহের বিস্তার খুব বিচার করে না বুঝেও আমাকে অভিভূত করেছিল। এ দিকে ডোম পাচক রান্না করছে, মুচীর ছেলে পরিবেশন করছে, মুসলমান আয়া তদারক করছে, আমাদের সামাজিক প্রথা-সংস্কারের গণ্ডীগুলো ভেঙে চুরমার! এসব কথা লিখছি এ কারণে যে ভবিষ্যতে অনেকেই জানবে না যে রবীন্দ্রনাথ যা প্রচার করতেন জীবনে তা অভ্যাস করতেন, 'সবার পরশে পবিত্র' কথাটা কথার কথা মাত্র নয়। অন্যদিকে নানা দেশের লোক ভারতীয় পোশাক পরে বা না পরে ঘুরছে। এক হাঙ্গেরীয়ান মাতাপুত্রী (মিসেস্ ও মিস্ ব্রুনার) একটি ছোট বাড়িতে বাস করত। তারা খুব স্বল্প বাস পরিধান করে একটি বাগানে শাক-সব্জী লাগাত, তারা দুজনেই আর্টিস্ট—কোথা থেকে এসেছিল জানি না। আবার কোনো কোনো শ্বেতাঙ্গিনী শাখা সিঁদুরে সজ্জিত হয়েবাংলা গান করে বেড়াচ্ছে ঘরের মেয়ের মতো—এই সমস্ত মিলে যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া তা তৎকালীন জাতপাত ও সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার বদ্ধ বাতাসে এক মুক্তির আস্বাদ নিয়ে আসত। শুধু আমরা নয়, সে সময়ে যে কোনো মানুষই শান্তিনিকেতনে এলে অনুভব করত—'এলেম নতুন দেশে!'

এই নতুন দেশের যে সব আশ্চর্য পুরুষদের কথা মনে পড়ে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ একজন। উত্তরায়ণের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি দোতালা বাড়িতে তিনি ও তাঁর হাস্যমুখী সুন্দরী স্ত্রী কমল বৌঠান থাকতেন। ইনিও নিঃসন্তান। একদিন একটি গানের 'কথা' রবীন্দ্রনাথ আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। গানটি দিনেন্দ্রনাথ আগেই শিখেছেন। আমি সেই সুযোগে তাঁর বৈঠকখানায় বসে গান শোনাবার আব্দার পেশ করলাম। প্রথমেই নূতন গানটি গাইলেন—

'জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে'

একটা মস্ত তক্তপোষ, তাতে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ আর পানের বাটা নিয়ে সুন্দরী কমল বৌঠান। তাঁর আদরযত্ন অনেব পেয়েছি। দিনেন্দ্রনাথ গান করে চলেছেন একটার পর একটা, গীতিমাল্য গীতাঞ্জলি বইগুলি সামনেই ছিল আমি একটি একটি করে এগিয়ে দিচ্ছি পাত খুলে আর দিনুদা গান গাইছেন—এমনি করে কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেল—শেষ পর্যন্ত কমল বৌঠান এসে আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিলেন যে আহারে

সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কী অবিশ্বাস্য রকম সরল মানুষ ছিলেন তখনকার দিনের এইসব খ্যাতনামা পুরুষরা! কী সহজলভ্য ছিলেন তাঁরা! এখনকার এক হাজারি দু হাজারি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়েদের কাছে কি এ প্রত্যাশা করা যায়?

আমি যে সময়ের কথা লিখছি তখন দেশে নানারকম রাজনৈতিক আন্দোলন চলেছে। হিজলীর ব্যাপারও এই সময়ের কাছাকাছি। তারপর লবণ আইন অমান্য এবং কিছু পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ওদিকে যতীন দাসের অনশন ও মৃত্যু—দেশ যেন টগবগ করে ফুটছে। এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথ অবিরত চিন্তা করছেন। বহু লোকজন নানা মত বলছেন কিন্তু আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ্য করতাম, বাইরে যে সব কথায় আমরা উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে ভাবে ভাবছেন না। এ কথাটা আমার মনে পড়ছে জাপানী মেয়েটির প্রসঙ্গে। কারণ এই সময়ে এখানে একটি জাপানী জুজুৎসু শিক্ষকও এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কবি আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা যে এত স্বাধীনতার জন্য উচ্ছ্বাস করছ, এদেশ থেকে সমস্ত ইংরেজ চলে গেলেও তোমরা মেয়েরা কতটুকু স্বাধীন হবে? তোমাদের শরীরে জোর নেই, মনে জোর নেই, সেইজন্য তো আমি জুজুৎসু শেখাবার ব্যবস্থা করেছি।" অনেক খরচ করে জাপানী শিক্ষক তাকাগাকিকে আনা হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু দুঃখ ছিল যে মেয়েরা ভালো করে শেখেনি। কিন্তু আমার মনে পড়ে উনিশশ তেত্রিশ সাল নাগাদ একটি জার্মান সার্কাস পার্টি এসেছিল। তারা একটি খাঁচায় দুজন আফ্রিকার পিগ্‌মি মানুষকে নরজন্তুর নমুনা হিসাবে রেখে তাদের চাবুক মেরে সার্কাসের খেলা দেখাত। শ্বেতাঙ্গদের এই দুঃসহ স্পর্ধায় বাঙালীরা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম ঐ সার্কাস বয়কট করবার জন্য ছেলেমেয়েরা পিকেটিং করছিল। দুজন মেয়েকে জার্মান দ্বাররক্ষীরা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় তখনই সেই মেয়ে দুটি ঐ জার্মানদের জুজুৎসুর ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে। ওরা তাকাগাকির কাছে নাকি জুজুৎসু শিখেছিল। গল্পটা সত্য কিনা জানি না মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে বাঙ্গালীর গর্ব বৃদ্ধি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে এই সূত্রে বলে রাখি, আমার এই রচনার মধ্যে তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়ার খবর কমই পাওয়া যাবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কতভাবে দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলছিলেন, কত দিকের দরজা খুলে দিচ্ছিলেন তা কতকটা বোঝা যাবে।

মেয়েদের জুজুৎসু শেখাবার প্রসঙ্গেই 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটি লেখা! আমার নিজের মনে হয় এত বড় স্বাধীনতার উদ্বোধক গান আর

নেই। আমরা তো শুধু রাজনৈতিক অধীনতায় ভুগছিলাম না। আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল কত শত্রু—ছোঁয়াছুঁয়ি, গুরু-পুরুত, অশ্লেষা-মঘা, সহস্র রকম বিধি-নিষেধ। এছাড়া মেয়েদের শত্রু ছিল মেয়েরা নিজেরাই। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মুক্তি দিচ্ছিলেন, 'রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধা'র ঘূর্ণ্যমান চক্র থেকে—তারপর কত দিক থেকেই জোয়ার আনলেন এ সমাজের দেহে মনে। কোনো বন্দুকধারী প্রাণ দিয়ে বা নিয়ে তা হঠাৎ ঘটিয়ে উঠতে পারবে না।

বিধুশেখর

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

তোমার হারা চিঠির রহস্য বোঝা গেল না। আমি পাইনি এটা নিশ্চিত—আর কে পেয়েছে সেটা সংশয়াপন্ন। শাস্ত্রী মশায়ের পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তান্ত গোপনে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। গোপনতা বশত পথটা সহজ বোধ হচ্ছে না।

তোমাকে নিষেধ করার পরে প্রশান্তর টেলিগ্রামে জানা গেল হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর রোগের উপসর্গ বেড়ে ওঠাতে তিনি আসতে পারলেন না। মাঝের থেকে তোমার যাত্রায় বাধা পড়ল। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধে আগামী শনিবারটাকেও বঞ্চিত কোরো না। এখানকার প্রান্তরে শ্রাবণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়ো। ইতি—১৩ শ্রাবণ ১৩৩৩

তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই শনিবারে যাওয়া হল আর কবি 'উদিতা' প্রকাশে বাবার অনুরোধে মত দিলেন।

এই চিঠিতে সুরেন্দ্রনাথকে লিখছেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবেন—'গোপনীয়তা বশতঃ ব্যাপারটা সহজ হবে না।' এই সময় সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন এবং উপাধি প্রদান তাঁর একটি আনন্দের কাজ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সরকারী উপাধি দেওয়া ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানেরই কাজ। পণ্ডিত বিধুশেখরকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া প্রসঙ্গেই এই খোঁজ খবর।

শান্তিনিকেতনে যে কটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন তার মধ্যে বিধুশেখর একজন—

রবীন্দ্রনাথ এঁদের উপযুক্ত অর্থ দিতে পারেন নি কিন্তু স্নেহ শ্রদ্ধার অকৃপণ ধারায় অভিনন্দিত করে এঁদের যোগ্যস্থান অবশ্যই করে দিয়েছিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন নি। যতদূর জানি তিনি প্রাচীন পন্থীই ছিলেন কিন্তু বিদ্যাবত্তার জন্য, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার জন্য, যে সম্মান প্রাপ্য তা সমস্ত দেশ থেকেই লাভ করেছেন শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর কারণেই। পূর্বোক্ত চিঠি লেখার বছর তিন চারেক পর বিধুশেখর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে এলেন। তিনি চলে আসায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে কবিতায় একটি চিঠি লেখেন—রামানন্দবাবু আবার সেটি ছাপিয়ে দেন। এই কবিতা সম্ভবত কোনো বইয়ে নেই সেজন্যই যে এটি উদ্ধৃত করছি তা নয়, এর মধ্যে তাঁর ছেলেমানুষের মত অভিমান ঝরে পড়েছে—শান্তিনিকেতন যে তাঁর এত প্রিয় —সেই শান্তিনিকেতনের আকাশ থেকে একটি তারা খসে পড়ল এতে কী পর্যন্ত মর্মাহত তিনি। অনেক সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর কবিতার নিন্দা তাঁকে তত বাজত না যত দুঃখ পেতেন শান্তিনিকেতনের নিন্দায়—

শান্তিনিকেতন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য

সুহৃদবরেষু—

বিদ্যার তপস্বী তুমি। আজ তুমি যশস্বী ভারতে,
কবি তব জয়মাল্য সঁপি দিলে তব জয় রথে।
এই আশীর্বাদ করি তব যাত্রা হোক অগ্রসর
অপূর্ব কীর্তির পথে উত্তরিয়া দেশ দেশান্তর
দূর হতে দূরে। একদিন যবে অখ্যাত নিভৃতে
স্তব্ধ ছিলে; অন্তর্লীন আনন্দের অদৃশ্য রশ্মিতে
সিদ্ধি ছিল মহিয়সী ভারতীর প্রসাদ বৃষ্টিতে
ছিল তব পুরস্কৃতি। ছিল না তা লোকের দৃষ্টিতে।
জ্ঞানের প্রদীপ তব দীপ্ত ছিল ধ্যানের আড়ালে
নিষ্কম্প আলোকে, আজ জনারণ্যে চরণ বাড়ালে
সেথা পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা
সেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা
চিহ্ন না রহিতে তবু তোমারে চিনিয়াছিল যারা
তাদের সম্মানমাল্য জনতার কাছে মূল্য হারা।

যেথা যাহা প্রয়োজন তাই দিন সৌভাগ্য বিধাতা
পদবীর পরিমাপে হয় যদি হোক উচ্চ মাথা।
বিশ্বে তুমি দৃশ্য হও ভালে বহি রাজদত্ত টীকা
বন্ধুচিত্তে থাকো লয়ে নির্লাঞ্ছন আত্মলোক শিখা।

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১ই মাঘ ১৩৪২

কবি পরিচিতি

আমার বইয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে ১১ই মাঘ যে চিঠিখানি লিখলেন তারপর পুরো একবছর কবি ইয়োরোপে ছিলেন। এই সময় প্যারিসে চিত্রপ্রদর্শনী, হিবার্ট লেকচার দেওয়া, জার্মানীতে চিত্রপ্রদর্শনী তারপর যান সোভিয়েট রাশিয়া। আমার কাছে সে সময়ের কোনো চিঠিপত্র নেই।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্র পরিষদ থেকে একটি সঙ্কলন ছাপা হবার উদ্যোগ চলছিল। তারই মুখবন্ধের জন্য একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ছিল আমি সেটা কপি করে প্রেসে দেবার জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখি একটি মিলের লাইন ছুট আছে, সেটা লিখে পাঠাতে উত্তরে লেখেন—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু, শান্তিনিকেতন

আমার এ বয়সে ভুল করলে লোকে বুঝে নেয় যে সেটা ভুল, তোমাদের বয়সে যদি ভুল করতুম তবে লোকে ধরে নিত সেটা অক্ষমতা। অতএব আমার অনুকরণ কোরোনা। সাবধানে লাইন গুনে আর মিলিয়ে কবিতা লিখো। আর ১লা বয়সে (বৈশাখে) রামানন্দবাবুর সঙ্গ ধরে যদি এখানে আসতে পারো তবে মনে কোরো না সেটা অত্যন্ত দুঃসহ হবে। ইতি ২৮শে চৈত্র ১৩৩৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি পরিচিতি' গ্রন্থে আছে।

অর্থ কিছু বুঝি নাই কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি
যাত্রাপথে। ইত্যাদি

ছুট লাইনটি ছিল এই স্তবকের তৃতীয় লাইনের পরে—

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা দিকে দিকে কলরোল রোলে
উঠে রনরনি, আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা।

এর মধ্যে 'কলরোল রোলের' সঙ্গে মিলের লাইনটি পাওয়া গেল না—সেই কথা লেখায় ঐ চিঠির সঙ্গে সংশোধনী পেলাম—"উঠে রনরনি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে অশ্রান্ত উল্লোলে।"

এই 'কবি পরিচিতি' বইয়ের শেষ কবিতাটি আমার রচনা। কবিতাটিতে আমার বক্তব্য ভালো করে বলা হয়নি বলে আমি কিছুতেই স্বাক্ষর করতে রাজি হইনি।

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা—

কল্যাণীয়েষু

আমার সে লেখাটি তোমাদের সংকলনের মধ্যে দেবে এতে লেশমাত্র আপত্তির কারণ নেই। আমার মন এখনো ভাগ্যক্রমে সচল আছে কিন্তু দেহের সম্পূর্ণ ঝোঁক স্থৈর্য অবলম্বনের দিকে। তাই কলকাতায় যাওয়ার সঙ্কল্প মনে নেই। যদি কখনো যাই তবে দেখা হবে।

আজ বসন্ত উৎসবের কথা ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে বৃষ্টি বাদল চলছে—দেবতাদের বিরুদ্ধে উৎসব জমাবার সাধ্য নেই তাই পঞ্জিকার অনুসরণ না করে উপরওয়ালাদের প্রসন্নতার প্রতীক্ষা করব। অবাধ্যতা নীতির দ্বারা জয়লাভের আশা নেই। ইতি ৪ মার্চ ১৯৩১

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'কবি পরিচিতি' বইখানা বাবার উপহার স্বরূপ নিয়ে রবীন্দ্র পরিষদের একজন উদ্যোগী কর্মী ২৫শে বৈশাখে শান্তিনিকেতনে গেলেন। আমার ধারণা ছিল তিনি প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু সম্প্রতি তিনি আমাকে বললেন যে না 'অমিয়'

নিয়ে গিয়েছিল। যাহোক সেই সঙ্গে আমিও একটি উপহার পাঠালাম। সোয়েডে বাঁধান একখানি খাতা রূপার নক্সা করা জালে বন্দী করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে রূপা বাঁধিয়ে উজ্জ্বলতর করা যাবে না সেটা বোঝবার বুদ্ধি তখন ছিল না তাই আমি 'লছমীবাবুকা আস্‌লি সোনে চাঁদিকা' দোকানে ঘুরে ঘুরে একটা অভিনব কিছু করবার জন্য বহু পরিশ্রম করলাম।

কল্যাণীয়াসু,

জন্মদিনের উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেছে খবর বোধহয় শুনেচ। আর সমস্তই ভালো কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে সহজ হয়নি। আজও তার উপসংহার ভাগে যথেষ্ট হাঙ্গামা জমে উঠেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি। তোমরা আসতে পারলে খুব খুসি হতুম। তোমাদের প্রদত্ত উপহার ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, ভালো লাগল। আমার আশীর্বাদ। ইতি—২৬শে বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

উৎসবে তোমরা আসতে পারলে আনন্দ সম্পূর্ণ হোত। তোমাদের প্রতিনিধি বইখানি দিয়ে গেলেন। আমার কবিতায় দুইটি গুরুতর ভুল রয়ে গেছে। জন্মদিনের আলোড়ন আমার পক্ষে দুঃসহ হয়েছে—আজও বিশ্রাম করবার একটু সময় পেলুম না।

তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে?

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা—

কল্যাণীয়েষু

কবি পরিচিতিতে ভুল ত্রুটি আছে সেটা বাংলা দেশের ছাপাখানায় অনিবার্য —না থাকলে স্বদেশী লক্ষণে দোষ পড়ত—বইখানি এতদিন পড়বার সময় পাইনি

—অসুস্থ হয়ে পড়াতে সম্প্রতি পড়বার সুযোগ হয়েছে। প্রায় সব লেখাই উচ্চ-দরের; এতটা আশা করিনি। আমার নিজের লেখায় আজকাল কতই স্খলন হয় তার পরিচয় পেয়েচ, বানান ভুল অক্ষরচ্যুতি পদচ্যুতি প্রভৃতি মনোযোগ শৈথিল্যের নানা উপসর্গ পদে পদে দেখা যাচ্ছে। কলমটাকে মাড়োয়ারীদের স্থাপিত উত্তর গোষ্ঠে পাঠাবার সময় এলো। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ শুনে আনন্দিত হলুম। এখানে তুমি তোমার উপযুক্ত সৃষ্টি ক্ষেত্র পেয়েছ বলে আশা করি। যদিও এখনো রোগশয্যায় সংসক্ত আছি তবুও ভালই আছি—আকাশ মেঘে মেদুর, বাতাস সুখস্পর্শ, ধরণী সরস শ্যামল, অবকাশ জনতাবিহীন। মৈত্রেয়ীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু বিষয়ে

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বুলা একেবারেই নেই এই কথাটা যখন তোমার মন কোনোমতেই স্বীকার করতে চাচ্ছে না তখন তাকে স্বীকার করবার দরকার কি? থাকা ব্যাপারটার কত বৈচিত্র্যই আছে। কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখনো জেগে থাকি—কখনো কাছে থাকি কখনো দূরে থাকি কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য—তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করে দিতে দোষ কি—অর্থাৎ কখনো এ-লোকে কখনো অন্যলোকে—কখনো মর্ত্ত্য শরীরের অবস্থায় কখনো এ শরীরের অতীত অবস্থায়। তুমি বলবে, নিশ্চিত জানিনে যে—সেই জন্যেই ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই বলবান না করে আকাঙ্ক্ষার প্রমাণকেই তো মানা ভালো। পৃথিবীতে সব আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা ঘটে না একথা সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য, যে সব সত্যের যুক্তি আমাদের হাতে নেই, তাই যাকে নিশ্চিত বলে জানি সেও ভ্রান্ত হতে পারে। মৃত্যুকে বিলয় বলে মনে করচি খুবই সম্ভব তার কারণ এই যে সে যে বিলোপ নয় তার প্রমাণগুলো আমাদের হাতের কাছে নেই—হয়তো কেবল বৃথা বিলাপ করেই মরচি। মা পাশের ঘরে গেলে শিশু যেমন মায়ের অবলুপ্তি কল্পনা করে এও হয়ত তেমনি। আমি এই কথা বলি যখন দ্বন্দ্বের মধ্যেই আছি তখন না-য়ের চেয়ে হাঁ-কে মানাই

ভালো। মৃত্যু যদি চরম সত্যই হয় তাহলে আক্ষেপ করা বৃথা, যদি সত্য না হয় তাহলে ততোধিক বৃথা—অতএব মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক তারপর হয় এপক্ষে নয় ওপক্ষে তর্কের সমাধান হবে—আমি নিজে শান্ত মনে তারি অপেক্ষা করচি এবং ততক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রেখেচি যে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হাঁ করে নেই। ইতি—২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুলা অর্থাৎ কবি উমা দেবী মোহিতকুমার সেনের কনিষ্ঠা কন্যা। এঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর কবিতার বই 'বাতায়ন' ও আমার 'উদিতা' আগের বছর এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বইতেই রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডলে যে কয়েকটি মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিল তার মধ্যে বুলা অন্যতমা—আমার থেকে সে ছিল বছর ৭/৮ এর বড়। কবিত্বে ভরা সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখে সে আমাকে মোহিত করে দিয়েছিল। চরিত্র মাধুর্যে অসামান্যা এই নারীর হঠাৎ মৃত্যুতে আমি খুব কাতর হয়েছিলাম। আর আমার এই ধারণা জন্মেছিল যে তার মাত্র কয়েকদিন আগে সে যে প্ল্যানচেট সুরু করেছে তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগ আছে। কেনই বা সে হঠাৎ প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করল। কেনই বা অমন সুন্দর প্রাণবন্ত মানুষটি তেমনি হঠাৎ সুগন্ধির মত উড়ে গেল! যদিও তার মৃত্যুর কারণ ডাক্তারি মতে একটুও অস্পষ্ট ছিল না, তবু সে কথায় আমার মন মানছিল না। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। উমার প্ল্যানচেট্ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের কথার উপর নির্ভর করে, রবীন্দ্রনাথকে প্রেত-লোকে বিশ্বাসী প্রমাণ করে বই পর্যন্ত লেখা হয়েছে। আসলে কৌতূহলী অনু-সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের সে ছিল একটা খেলা মাত্র। আমার ধারণা আমার কাছে লেখা উদ্ধৃত চিঠিখানিতে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর যে মত প্রকাশ পেয়েছে নীতুর মৃত্যুর পর মীরা দেবীকে লেখা পত্রখানির সঙ্গে তা অসঙ্গত নয়। এবং এই চিঠি দুটির বক্তব্য অন্যান্য কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর একটা পূর্ণতার অনুভব ছিল এবং শূন্যতার চেয়ে তারই উপর তিনি নির্ভর করতেন। মীরা দেবীকে লেখা চিঠিখানি যদিও বহু পঠিত তবু তার অল্প একটু অংশ উদ্ধৃত করছি আমার বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য—"যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধগতি হোক।

আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা শুনলুম তখন অনেক দিন ধরে বার বার করে বলেছি আর তো কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এরপরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌছয় না কিন্তু হয়ত ভালোবাসা পৌছয় নৈলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?"

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক নন। পেসিমিস্টও নন। নাস্তিক কথাটি আমরা প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণায় অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করি কিন্তু তার চেয়ে একটু বিস্তার করে ভাবলে বলা যায়, যিনি যা কিছুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই তাতেই আস্থাহারান, যা ধরাছোঁয়া যায় না, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত তার অস্তিত্ব মানেন না তিনিই নাস্তিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর সদর্থক দিকটি দেখেন নঞর্থক নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বা মৃত্যু পরবর্তী কোনো অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই বলেই যে সে এক পরম শূন্যতা তা তিনি মনে করেন না। তাছাড়া তিনি পেসিমিস্ট নন। তিনি আশা রাখেন, হয়ত উপনিষদের কবির মতই তাঁর বক্তব্য পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে।

এই চিঠিতে 'আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ' বলে একটি কথা আছে। প্রমাণের বিভিন্ন রূপ তিনি জানেন—'ধরা ছোঁয়ার প্রমাণে'র অতিরিক্ত, প্রমাণের বিভিন্ন রূপ তিনি অনুভব করেন। এখানে 'আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ' কথাটি আছে। এই কথাটি জীবনে অনেকবার ভেবেছি। প্রমাণের যে এই আর একটি পথ আছে সে আমরা যুক্তি তর্কের দেওয়াল গেঁথেও রুদ্ধ করতে পারি না। 'আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ' অর্থ ভালো-বাসার প্রমাণ, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ভালোবাসা "বলে মৃত্যু তুমি নাই"—এইজোর সে পায় কোথা থেকে? কোথা থেকে অমরত্বের বোধ জন্মায়? কবি স্বচ্ছন্দে বলেন "আমারে তুমি অশেষ করেছ"—এই আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই সেই কবিতা, "এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মতো। এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল নহিলে নিখিল এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা এতকাল হাসি মুখে কিছুতে সহিতে পারিত না।"...

প্রিয় বিচ্ছেদের নিদারুণ দুঃখ কত অনায়াসে মানুষ সহ্য করে, তার দাহ জুড়িয়ে যায়। এ অসম্ভব সম্ভব হয় কি করে? অন্তরে অন্তরে কি তার এই বোধ জন্মায় যে "ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে।"

ঠিক প্রমাণ কথাটি এখানে খাটে কি না জানি না। সত্য মিথ্যার প্রমাণ আমরা ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাবলীর বাইরে বা একে

অতিক্রম করে অন্য কোনো সত্য থাকতে পারে যার সংবাদ পঞ্চেন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে মানুষের অন্তর্লোকের আলোতে, বিশেষ করে ভালোবাসার আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারে—একথা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বিষয় কিনা তা আমার অনেকবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু করা হয় নি। তবে তাঁর গানগুলি বলে এই তাঁর অভিজ্ঞতা। মীরাদেবীর কাছে লেখা এই চিঠিটাও তাই বলে—"সেখানে আর কিছু পৌছায় না ভালোবাসা হয়ত পৌছয়।"

মনে পড়ে এর বহুদিন পরে মংপুতে একবার আমাকে বলেছিলেন—"কোনো ভয় নেই, ভালোবাসা অমর"—কথাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি অবশ্য এসব কথা খুব স্পষ্ট হবারও নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্যও নয়। মনের এ অতি সূক্ষ্ম সংবেদনা যা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য তরঙ্গে অবিরাম প্রবাহিত প্লাবিত হতে থাকে। সেটাই আকাক্ষার প্রমাণ। তারই উপর বিশ্বাস রেখে কবির গান—"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?" উদ্ধৃত চিঠির শেষ লাইনে রয়েছে, "এই বিশ্বাস ধরে রেখেছি যে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হা করে .নই"—এই লাইনটি খুব স্পষ্ট করে 'পুনশ্চ'র মৃত্যু কবিতাতে রয়েছে।—

অসীমের অসংখ্য যা কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই
একি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অনুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে
সে ছিদ্র কি এতদিনে ডুবাত না নিখিল তরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত, হত যদি মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

একটি চিঠির বিষয়ে এতখানি লিখলাম, কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধারণা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিশেষত উমার প্ল্যাঞ্চেট বিষয়ে তাঁর কৌতূহল অনেকের কাছে দুর্বোধ্য।

ছবির প্রদর্শনী

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু—

মৈত্রেয়ী, চিত্রশালায় বিচিত্র জীবের উপদ্রবে হঠাৎ শরীরটা ভেঙে পড়ল তাই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারতে হল। টেবিলের উপর একরাশ অটোগ্রাফ বই জমেছিল। তাড়াতাড়ি নাম সই করেই রথে চড়ে বসলুম। কোনটা কার তা বাছাই করা অসাধ্য—নাম প্রায়ই নেই। যা হোক চিত্রশালার অধ্যক্ষের হাতে সেগুলো পড়ে আছে বলে আশা করি। তোমার সোদরা ছবির বইখানাও সেখানেই বিশ্রাম করছে। মুকুলকে লিখে দেব। আনিয়ে নিয়ো। আমার কাছে কোনো জিনিষ ফেলে রাখা নিরাপদ নয়। আমি অপক্ষপাত ভাবে নিজের জিনিষও হারিয়ে থাকি। হারাধন খুঁজে খুঁজে আমার দিনের অনেক অংশ কাটে। পারস্য যাত্রার আয়োজন চলছে। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩০ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে—জার্মানীতেও হয়েছে। প্যারিসে চিত্র প্রদর্শনীর সময়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং প্রিনসেস ডি নোয়ালিশ কি রকম পরিশ্রম করেছেন সে কথা অনেক জায়গায় লিখেছেন। ডি নোয়ালিশের একটি প্রবন্ধ সে সময় ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি আমি 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে অনুবাদ করেছি।

বিদেশে ছবির প্রদর্শনী করে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি পেলেন। তাঁর তখন বিশ্বাস হল যে বিলাতের ছাড়পত্র যখন পাওয়া গেছে এইবারে তাঁর ছবি হয়ত এদেশেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। ছবি সম্বন্ধে তখন তাঁর আগ্রহ কবিতার চেয়েও বেশী।

সরকারী আর্টকলেজের মুকুল দে'র বিশেষ আগ্রহে ঐ বাড়িতেই প্রদর্শনী করা হল। মুকুল দে'র সরকারী কোয়ার্টার্সে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত দুবার থেকেছেন। প্রথমবার Miss Van Pot বলে একজন মহিলা মূর্তি তৈরী করতে এলেন। এঁর

লেখা হচ্ছে তাকে খুশী করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে রক্তমাংসের মানুষ এতেই তার প্রমাণ হয়। যাই হোক Miss Potকে আমার খুবই ভালো লাগত। ইনি পরে আমার বাবারও একটি Bust তৈরী করেন। মিস্ পট আমার কাছে রবীন্দ্র-নাথের কবিতা পড়তেন। কবি আমাকে বলেছিলেন, 'Miss Pot তোমার কথা খুব বলে, আমাকে বলেছে She is very devoted to you'—এই ছোট্ট কথাটির জন্য আমি Miss Pot-এর কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম যদিও এমন কোনো অজ্ঞাত খবর নয় এটা।

এই সময়ে একদিন দেখি মুকুল দে'র বাড়িতে একটা আয়নার সামনে বসে পিছনের চুল ছোট করে কাটছেন। রেশমের মত সাদা চুল কালোর রেখায় উজ্জ্বল—থোপা থোপা ফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আমি এক গোছা তুলে নিলাম—"কি ওটা সংগ্রহ করছ নাকি! এখবর রটে গেলে আমার মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, একজন সেদিন খানিকটা নিয়ে গেছে।" "কে?" "রানু"—সেই চুলের গুচ্ছ একাদেমী অফ ফাইন আর্টসের উপরের তলায় সাজানো আছে।

মুকুল দে'র বাড়িতে তখন গ্রাম থেকে তাঁর দুই ভগ্নী এসেছেন রাণী ও বুড়ি—আমারই কাছাকাছি বয়সী। ওদের কাছে গ্রামের গল্প শুনতাম, ওরা খুব সুন্দর সাজতো চন্দনের টিপ ও কাজল পরে। আমাদের সে সময়ে বড় মেয়েরা কাজল পরত না। কাজল পরত শিশুরা। রাণী ও বুড়িকে আমি ঈর্ষা করতাম। ওদের কী সৌভাগ্য ওরা কবির সঙ্গে এক বাড়িতে রয়েছে তাঁর দেখাশুনো করছে—আর সবচেয়ে বিস্ময়কর তিনি ওদের ইংরেজী পড়াচ্ছেন First Reader! ওদের কোনো সংকোচ নেই ওঁর কাছে পড়তে আর কবির হাতে অজস্র সময়, দুটি ছোট ছোট মেয়ে যাদের পড়াশুনোর সুযোগ হয়নি তাদের প্রথম পাঠ দিচ্ছেন! সময়ের এই অফুরান উৎসের সন্ধান কবি কোথায় পেয়েছিলেন জানি না—তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, কবিতা ঝরনার মত ঝরে পড়ছে। আবার ছবিও অজস্র আঁকা হচ্ছে—জনসমাগমের বিরাম নেই। আমার মত একটি অর্বাচীন বালিকাকে কবিতা শোনান হচ্ছে আবার ফার্স্ট রীডারেও ক্লান্তি নেই!

একজিবিশনের সময় একটি কাণ্ড হল যা সকলেরই খারাপ লেগেছিল। মুকুল দে সরকারী কলেজে চাকরী করেন। তিনি খুব রাজভক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কাউকে কিছু না বলে বাইরে লিখে দিলেন "Sir Rabindranath"-এর চিত্র প্রদর্শনী। যে উপাধি তিনি দশ বছর আগে "ছার" (ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী) বলে ত্যাগ করেছেন! রবীন্দ্রনাথ থাকেন ঘরের ভিতরে—বাইরের দরজায় যে এরকম একটি 'নিশান' উড়ছে তা তিনি জানতেও পারেন নি। অবশ্য জানাবার

লোকের অভাব হল না। কবি ক্ষুণ্ণ হলেন, তবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন না। চিত্রলিপির ক্যাটালগেও 'Sir' কথাটা রয়ে গেল এতেই ওঁর মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। অনেকেই বললে এখানে প্রদর্শনী করা উচিত হয়নি এবং কবির তদ্দণ্ডেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। উপরের চিঠিতে অটোগ্রাফের খাতার স্তূপের মধ্যে আমার সোদরা ছবির খাতাটির উল্লেখ আছে সেটা ঐ চিত্রশালায়। তখন ছবির প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম চলছিল।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিতে যে বেদনা প্রকাশ পেয়েচে তাতে আমি অত্যন্ত পীড়া বোধ করলুম। জীবনের সঙ্গে সংসারের যদি অসামঞ্জস্য ঘটে তবে সেটা সহজে সহ্য করে ধীরে ধীরে সুর বেঁধে তোলা তোমার বয়সে ও তোমার অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তোমাকে কি পরামর্শ দেব ভেবে পাইনে। নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে—তীব্র দুঃখে যখন দিনগুলো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল তখন কোনো-মতে সেগুলো উত্তীর্ণ হয়ে যাবার রাস্তা পাইনি, মনে করছিলুম অন্তহীন এই দুর্গমতা। কিন্তু জীবনের পরিণতি একান্ত বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বোধনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে ললিতে, অম্লতাকে মাধুর্য্যে, পরিপক্ক করে তোলাই হচ্ছে পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে না তা আমি মনে করিনে —কেননা তোমার কল্পনা শক্তি আছে, এই শক্তিই সৃষ্টিশক্তি! অবস্থার হাতে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না—নিজেকে পূর্ণতর করে তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে উদার শক্তিতে আত্ম বিকাশ সহজ নয়—বাইরের দিকে প্রসারতার ক্ষেত্র তাদের অবরুদ্ধ—অন্তর্লোকের প্রবেশের যে সাধনা সে সম্বন্ধেও আনুকূল্য তাদের পক্ষে দুর্লভ। তবু তুমি হতাশ হোয়ো না—নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখো—চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ কর, যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকেও অতিক্রম করে। তোমার পীড়িত চিত্তকে যদি সান্ত্বনা দেবার শক্তি আমার থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম—কিন্তু একান্ত মনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। যদি বাহিরের কোনো

ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো। ইতি—১৪ শ্রাবণ ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠির মধ্যে দুটি অংশ আমি অনেক দিন পর্যন্ত মনে মনে নাড়াচাড়া করেছি। একটি লাইন "নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে তীব্র দুঃখে যখন দিনগুলো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল"—আমাকে খুব ভাবিয়েছিল—কি সেই দুঃখ রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের? কৈ জীবনস্মৃতির কৌতুকোজ্জ্বল রচনায় সেই "তীব্র বেদনায় কণ্টকিত" দিনগুলির কোনো চিহ্ন তো নেই! তবে কিসের মর্মপীড়া ছিল তাঁর? অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ কি চেয়েছেন কি পাননি—কি করে জানব আমি? আমি জানি রবীন্দ্রনাথ অনেক পারিবারিক দুঃখ ভোগ করেছেন, অনেক মৃত্যু শোক—কিন্তু সে তো অল্প বয়সে নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম এ সে দুঃখের স্মৃতি নয়। এ অন্য কিছু। চাওয়া পাওয়ার অসামঞ্জস্য, যৌবনের ব্যাকুলতার কথা একটি কবিতায় খুব স্পষ্ট—"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম—" বাবা বলেছিলেন প্রকাশের পূর্বে এ বেদনা রামের বিরহের মত—পুটপাক প্রতিকাশঃ রামস্য করুণ রস। কোনো পাত্রের মুখ বন্ধ করে পাক করলে যেমন হয় তেমনি হয়েছে রামের অন্তর্দাহ। মৃগ যেমন তার কস্তুরীর গন্ধে ভরপুর হয়েও জানেনা তার অর্থ কি, তেমনি প্রতিভাধরও তাঁর নিজের সত্তাকে পূর্ণভাবে জানে না, অসহ তার সেই নিজের সঙ্গে নিজের বিরহ। "অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেয় তা'র বক্ষে বেদনা অপার"—আমি ভাবছিলাম এ সেইরকম বেদনা কি? না তাও নয়। এ অন্য কোনো বেদন। সাধারণ মানুষের অদৃষ্টে যা ঘটে কবিরও কি তাই ঘটেছিল? প্রেম কি পরাভূত—প্রত্যাখাত হয়েছিল? না সে অসম্ভব। ভেবেছিলাম কোনো এক সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, কি বেদনায় কণ্টকিত ছিল আপনার অল্প বয়সের দিন? কিন্তু তা করা হয়নি।

"বেদনাকে বোধনায়" "কঠোরকে ললিতে" পরিণত করবার রসায়ন কি তাও তখন বোঝবার সময় হয়নি পরে বুঝেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সুখেরই হোক দুঃখেরই হোক, তা যখন সাহিত্যে রূপ নেয়, তখনই কঠোর ললিত হয়ে ওঠে, দগ্ধ ধূপের দাহ থাকে না থাকে সুগন্ধ।

এই চিঠিতে আমার সম্বন্ধে যে আশা প্রকাশ করেছেন সেটাই আমার বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। অন্য দুএকটি চিঠিতে পরেও একথা লিখেছেন

তখনও আমি কেবলই ভেবেছি কিন্তু কল্পনাশক্তি কি করে মানুষকে দুঃখ বেদনা থেকে উদ্ধার করতে পারে সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

এই চিঠি পেয়ে অভিমানের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল আমার মন। যে যন্ত্রণায় বাণবিদ্ধ হয়ে আমি ছটফট করছিলাম এ চিঠি সেই মুহূর্তে আমাকে তার থেকে উদ্ধার করতে পারল না। আমি ভাবলাম গুরু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমারি উপর ভার দিয়েছেন নিজেকে উদ্ধার করবার। পরিতাপে পাপবোধে যে চিত্তদাহে আমি কাতর আমার কল্পনাশক্তি কি করে আমাকে রক্ষা করবে তার থেকে? কল্পনাশক্তি দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করা যায়, তা আমি যদি কয়েকটি কবিতা লিখি তাহলেই কি এ যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে? জীবনের পথে চলতে চলতে ক্রমে এই কথার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কল্পনাশক্তিই মানুষকে ক্রমাগত নূতন নূতন পথের সন্ধান দেয়। তাই কোনো বিফলতাই চূড়ান্ত হয়ে ওঠে না। একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেলে অন্য দরজা খোলবার সোনার চাবি তারই হাতে আছে। তারই হাতে আলো আছে পথ দেখাবার। মংপুর গভীর নির্জনতা, কর্মহীন দিনের অবসাদ যখন অসীম শূন্যতায় ভরিয়ে দিত তখন পরক্ষণেই নূতন নূতন সম্ভব অসম্ভব কাজের কল্পনা আমাকে মাতিয়ে তুলত। অবস্থার প্রতিকূলতাই এক এক সময় নিত্য আবর্তিত পথ থেকে চালিয়ে নিয়েছে নূতন নূতন পথে ও কাজের সন্ধানে। প্রতিকূলতা কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করবার রসায়ন। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার ফলে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ায় আমার বহু ইপ্সিত সাহিত্য জগতে ঢোকবার পথ যখন পেলাম না তখনও মন অবসাদে ভরে ছিল কিন্তু বার বার নূতন নূতন পথের সন্ধান পেয়েছি এবং অনেকদূর চলে আজ 'খেলাঘর'-এর প্রাঙ্গণে বসে যখন শুনি অতিথিরা ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলে "এ যে দেখি মিনি শান্তি-নিকেতন" তখন ভাবি আমি অবশ্যই আমার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পেরেছি —আমার পরাভব হয়নি।

গুরুর শুভকামনা বার বার আমার শূন্য হাত তাঁরই 'অসীম ধনে' পূর্ণ করেছে।

কবি সার্বভৌম

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসার পর আমার পিতা সংস্কৃতের পণ্ডিতদের উপাধি দিয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর ইচ্ছা হল রবীন্দ্রনাথকে একটি উপযুক্ত

উপাধি দিয়ে নিজেরা সম্মানিত হবেন। পরে সি. ভি. রামনকেও উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

Visva Bharati
Shantiniketan, Bengal

July 30/1931

To

The Principal Sanskrit College
Calcutta.

Dear Mr. Dasgupta,

I thank you and the staff of the Sanskrit college for the felicitations sent to me on the occasion of my birthday. I am also glad to accept your kind offer to confer on me a title as a mark of appreciation. I would request however that in view of the birth day celebrations that the Calcutta citizens are arranging in my honour in December next your ceremony be postponed till that date. This will spare me from the strain of travel which I cannot risk now in my present condition of health.

Yours sincerely
Rabindranath Tagore

এই প্রসঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলতে লাগল।

কল্যাণীয়েষু,

শরীর আবার দুর্বল হওয়ায় দ্বিধা বোধ করছি। তবু আশা করি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হয়ত যেতে পারব। এখনই নিশ্চিন্ত বলা চলবে না। তবে একথা বলে রাখছি চেষ্টার ত্রুটি হবে না। দেহটা Glass with care ছাপ মারা অবস্থায় আছে। চুপচাপ থাকলে কোনো আশঙ্কা থাকে না। ইতি ৮ ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক ভেবেও একটি উপযুক্ত কথায় রবীন্দ্রনাথকে 'চিহ্নিত'—সংস্কৃত ভাষায়

যাকে বলা হয় 'লাঞ্ছিত' করা মুস্কিল। বহু দিক প্রসারী তাঁর চিন্তা ও কর্ম। সম্যকভাবে তাঁর গুণাবলী ও মহিমা একটি শব্দে প্রকাশ করা কঠিন কর্ম। অনেক ভেবে বাবা 'কবি সার্বভৌম' কথাটি পেলেন, রামানন্দবাবুও পছন্দ করলেন। এই সময় বিচিত্রার হাট প্রায় ভেঙ্গে গেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির জমজমাট ভাব ক্ষুণ্ণ, চিৎপুর রোডের ভীড় ও কোলাহল বাড়ছে। কলকাতায় থাকতে কবির একেবারেই ভালো লাগত না। তাই একবার এলে একই সঙ্গে অনেক কাজ সেরে যেতেন। এই উপাধি প্রদানে কলকাতায় আগমন প্রসঙ্গে পরের চিঠি-গুলি লেখা—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পূজার ছুটির পূর্বে যাবার চেষ্টা করব তবু ঠিক কোন সময়ে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করতে ইচ্ছা করো জানিয়ো। তাহলে মনটাকে পূর্ব হতে তদনুবর্তী করতে পারি। খুব ধূমধাম ব্যাপার আজকাল আমার পক্ষে পথ্য নয়, সেটা আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভালো। ডিসেম্বর মাসে আমার ফাঁড়া পাঁজিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সময়ে শাস্ত্র চিহ্নিত সকরুণতার সঙ্গে এক কোপেই বলির কাজটা সারা হতে পারবে আশা করে সেই তারিখটার কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। যদি তোমাদের পঞ্জিকার সঙ্গে তার তিথির মিল না হয় তাহলে গোটা কয়েক শুভলগ্ন আমাকে জানিয়ে রেখো আমি বেছে নেব। ইতি ১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

এখানে ডিসেম্বর মাসে যে 'ফাঁড়া'র কথা লেখা হয়েছে সে হচ্ছে সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব। টাউন হলে মহা সমারোহে এই উৎসব হয়। তখন 'Golden Book of Tagore' নামে একটি বহুমূল্য সচিত্র পুস্তকে দেশ বিদেশের জ্ঞানীগুণী রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানান।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অনেকগুলো উপসর্গ একসঙ্গে এসে জুটেছিল, নন্দিনী অসুস্থ হয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল কাজে পড়েছিল জট। আমার শরীর দুর্বল ক্লান্ত—এর উপরে লেখার

দায় ছিল তাই চিঠি লেখার সময় পাইনি। কর্ত্তব্যের তৎপরতা এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কলকাতায় যাতায়াত সইবে না—অক্টোবরের দিকে দিন স্থির করতে হবে।

মৈত্রেয়ী তিনখানি চিঠির কথা লিখেছে একখানির বেশি পাইনি। শরীরের অবসাদে তার সম্বন্ধেও যথোচিত ব্যবহারের ত্রুটি ঘটেছে—মৈত্রেয়ী কিছু যেন মনে না করে। দেখা যদি হোত আমার অবস্থা বুঝতে পারত। ইতি ২৭শে শ্রাবণ ১৩৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণীয়েষু,

ক্লান্ত শরীর কোনো দাবীতেই সাড়া দিতে চায় না, তাকে কেবলি তাড়া লাগিয়ে ঠেলে ঠুলে নিষ্ঠুরভাবে কাজ আদায় করতে হয়। কোনো একটা জবর-দস্ত কর্তব্য অদূরে অপেক্ষা করে আছে মনে করলেই হৃৎকম্প ঘটে। বন্যা পীড়িতদের জন্য কিছু করতেই হবে বলতে পারব না শরীর অপটু। সেই আগামী কাজে খাড়া হবার জন্যে এখন থেকে শুয়ে দিন কাটাচ্চি। ঠিক যেই ডাক পড়বে ধড়ফড়িয়ে উঠে কর্মস্থানে ছুট্‌ব—তারপরে কপালে যা থাকে এই আমার অবস্থা। ১৫ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে কিছুকাল অবকাশ পাওয়া যাবে—সেই সময়টাতে তোমাদের কাজ সেরে নিয়ো কিন্তু আমার কাছে অধিক কিছু প্রত্যাশা করো না। তোমাদের দত্ত সম্মান মাথায় করে নেবো—আমার পক্ষ থেকে তার প্রতিদান যথোচিত হতে পারবে না। ইচ্ছার অভাবে নয়, শক্তির অভাবে।

সংসারের সমস্ত দায় পশ্চাতে রেখে আজ আমার বনে চলে যাওয়া উচিৎ ছিল—ভয় এই দায়ও পিছু পিছু চলবে, এবং বনের ভিতর দিয়ে চিৎপুর রোডের বিস্তার কোথাও প্রতিহত হবে না। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তথাস্তু। ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যদি টিঁকে থাকি তবে শুভাগমনের আশা রইল। ষ্টেজের উপর আমার কর্তব্যের মেয়াদ ১৮ই পর্যন্ত। তার পূর্বেই তোমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ হতে পারবে—অতএব আমি যদি ভুলি তোমরা

ভুলতে দেবে না সন্দেহ নেই। এ বৎসরের রবীন্দ্রমেধ যজ্ঞের উপক্রমণিকাটা তোমাদের হাত দিয়েই চুকে যাক। ইতি ২২শে ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

আমার কাছে লেখা এই প্রসঙ্গে চিঠি—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে আমাকে খুব সম্ভবত কলকাতায় যেতেই হবে। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে কিছু করা চাই। এই বন্যায় আমরাও নিঃস্ব অতএব একটা কোনো অভিনয় আশ্রয় করে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে—নতুবা বুভুক্ষু প্রজাদের আর কোনো উপায়ে বাঁচাতে পারবো না। এখান থেকে কিছু কিছু অর্থ আমরা সংগ্রহ করেচি। তোমার বাবাকে এই সংবাদ দিয়ো তিনি সেপ্টেম্বরের আরম্ভে অভিনয়ের দিনগুলো বাদ দিয়ে কোনো একদিন যদি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তাহলে অসুবিধা হবে না।

এই কাজের ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত শরীর আমার নয় কিন্তু উপায় নেই সম্প্রতি কোমরে ব্যথা হয়ে আমার দেহটাকে আরো অচলতর করেচে। আজ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে, তার কোনো কোনো অংশে আমাকেও যোগ দিতে হবে।

তোমার দেহ মন সুস্থ আছে এই আশা করি। ইতি ৬ই ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ঠিক কবে রাজধানীতে পদার্পণ করব নিশ্চিত বলতে ভরসা পাচ্চিনে। অল্প বয়সে মনের উপর নির্ভর করা দুঃসাধ্য ছিল এখন দেহটাকে বিশ্বাস করা চলে না। তার মন্ত্রণা না নিয়েই কর্তব্য সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু সময়ে সময়ে সে এমনতর কড়া রকমের 'সত্যাগ্রহ' করে বসে যে তাকে লঙ্ঘন করতে পারিনে।

আপাতত ঠিক করেছি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা তার কিঞ্চিৎ পূর্বেই এখান থেকে নড়ব। তোমার বাবাকে বোলো এই বেলা মালাচন্দন শার্দ্দূল

বিক্রীড়িত ছন্দ এবং অনুঃস্বর বিসর্গের আয়োজন করে রেখে দিন। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দ ও অনুঃস্বর বিসর্গের আয়োজন' অর্থাৎ 'কবি সার্বভৌম' উপাধিদানের ব্যবস্থা।

এবার কলকাতায় তিনটি কৃত্য ছিল, সংস্কৃত কলেজে উপাধি গ্রহণ ও ম্যাডান থিয়েটারে দু দিন নৃত্যগীতোৎসব। 'ম্যাডান থিয়েটার' অর্থ অধুনা যাকে 'এলিট' সিনেমা বলা হয়। এই সময় শিশুতীর্থ কবিতাটিকে আবৃত্তি সহযোগে নৃত্যরূপ দেওয়া হয়। এই স্টেজে শান্তিদেবকে আমরা নৃত্য করতে দেখেছি।

এতদিনে অর্থাৎ ৪।৫ বছরে শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা অনেকটা এগিয়ে গেছে। নানা দেশের প্রচলিত নৃত্যকলা থেকে সঞ্চয়নে একটি বিশেষ ভঙ্গিমা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা অল্প বয়স থেকেই বহুদিন পর্যন্ত শান্তিদেবের খ্যাতি নর্তক হিসাবেই জানতাম—অনেক পরে তিনি গায়করূপে আবির্ভূত হন।

চিঠিতে যা আছে এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তোলা। কিন্তু উপলক্ষ যাই হোক আমরা যা পেলাম তা অতুলনীয়। আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য এর আগে কেউ দেখে নি—ভারতের অন্যত্র আছে কিনা জানি না—অন্যদেশে হয় কি না শুনিনি। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যের দুটি দৃশ্য আমার মনে আঁকা হয়ে আছে একটি 'ঝুলন' ও অন্যটি 'তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া'। ঝুলন কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীমতী হাথি সিং কালো কাপড়ের আচ্ছাদনের ভিতর থেকে তার কোমল পুষ্পনিভ মুখখানি তুলে একেবারে ঝড়ের বেগে স্টেজে এসে ঢুকলেন। কবিতার সঙ্গে তাঁর নৃত্যের বেগ মিলেমিশে এক নূতন সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। 'তোমার কটি তটের ধটি' দুটি ছোট ছোট মেয়ে নেচেছিল তার মধ্যে একজন নন্দিনী বা পুপে—মোমের পুতুলের মত ছোট ছোট মেয়ে দুটির নাচ সেদিনের বাংলাদেশের সকলকে ভারি আশ্চর্য করেছিল—এত ছোট শিশুদের নাচ শেখান হল কি করে —আর আজ? এই নৃত্যশিল্প যা রবীন্দ্রনাথ বহু প্রতিকূলতা নিন্দা অপবাদ সহ্য করে সুরু করেছিলেন তা তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া যে হাঙ্গেরিয়ান মাতাপুত্রীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ কন্যাটি একটি সর্পনৃত্য করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে

এই নৃত্যটি তিনি যে গানের সঙ্গে করেন তার মধ্যে 'সাপের নাচন' কথাটি ছিল কিন্তু গানটির প্রথম পদটি আমার মনে নেই। স্টেজের উপর লাফ দিয়ে দীর্ঘাঙ্গী তন্বী কন্যাটি সাপেরই মতন লিক্ লিক করতে লাগল, তার সোজা সোজা দীর্ঘ কেশভার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এই নৃত্যোৎসব ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আর একবার হয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য তখন প্রচণ্ড ভীড় হত। ভীড়ের অত্যাচারে কবি হয়রান হয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে যারা ঢুকতে পেল না একদিন তারা খুব হল্লা করেছিল।

আমি পূর্বেও লিখেছি আবারও বলছি আজকের বাঙালী বুঝতেই পারবেন না সেদিনের জীবনে একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষুদ্র পরিবেশ ছাড়া গানের কোনো স্থান ছিল না। আর নৃত্য তো ভদ্রসমাজে কোথাও চলতে পারত না। আজকাল রেডিও টেলিভিশন গানের জলসা ও নানা সঙ্গীতায়তনের প্রভাবে যে রকম প্রভূত সঙ্গীতচর্চায়, গীতরসে দেশের মর্ম সিক্ত হচ্ছে, নানা দেশের নৃত্যকলা বিচিত্র লীলায় মনোহরণ করছে, এরকম একটা অবস্থা তখন কল্পনাতীত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যগীতের ও উৎসবের আয়োজন সুরু করে ছিলেন তা যেমনই অভুতপুর্ব তেমনি মনোহরণ। তারপরে স্টেজে তাঁর উপস্থিতি সমগ্র উৎসবটিকে উজ্জ্বল করে তুলত। যে সব অভিনয়ে তাঁর নিজের কোনো অংশ ছিল না সেখানেও একপাশে একটু নিচু আসনে বসে তিনি সমগ্র অভিনয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত এই রকম নাচ গান নাটকের দৃশ্য তখনকার বিদগ্ধ সমাজকে রসোল্লাসে ভরে রাখত আর অন্যদিকে নিন্দুকের রসনা চলত বিরামহীন।

অবশ্য শিশুতীর্থ কবিতাটি নৃত্যগীত সহযোগে অভিনীত হবে শুনে আমার পিতা বলেছিলেন, 'এবার আমার History of Indian Philosophy-ও নৃত্যনাট্য হবে।' পরে অবশ্য তাও হয়েছে অর্থাৎ জওহরলালের Discovery of India-র নৃত্যরূপ দেখান হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবিকে গান শেখাতে যে কয়েকবার দেখেছি সেকথা। তাঁর কাছে যাঁরা শিখেছেন তাঁদের সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা তাঁরা অনেক ভালো করে লিখতে পারবেন, আমার একদিনের কথা মনে পড়ছে—তখন কবি উদয়ন গৃহের দোতালায় বড় ঘরে থাকেন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছি, দরজার কাছে পৌছবার আগেই দ্বৈতকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল। কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছেন একটি মেয়ে—কখনো বা কবি এক লাইন গাইছেন,

মেয়েটি তার পুনরাবৃত্তি করছেন, আমি দরজার পাশে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালাম—কবি একটি ইজিচেয়ারে বসেছিলেন পূর্বাস্য হয়ে, আর একটি মোড়ায় একজন মহিলা বসে আছেন তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং সূক্ষ্ম—আড়াল থেকে শুনে মনে হচ্ছিল যেন কোন্ দূর স্বর্গলোক থেকে ভেসে আসছে—ঘরের সামনে এসে দেখলাম ঠিক তা নয়—একজন সাদাসিদে ঈষৎ ভারি চেহারা একটি ঘরোয়া বাঙালীর মেয়ে—পরে শুনেছিলাম তার নাম হুটু—রবীন্দ্রনাথের বন্ধুকন্যা ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের হুটুদি। এঁরই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ একটি অপরূপ কবিতাতে যে বেদনা প্রকাশ করেছিলেন সে রকম তাঁর আত্মীয়স্বজনের জন্যও করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন, চেয়ারের হাতলের উপর তাঁর কনুই দুটি রাখা, হাত দুটি উপরের দিকে তোলা, ঐ রকম তাঁর বসার স্বাভাবিক ভঙ্গি—যেমন সোজা হয়ে দাঁড়ালে দুটি হাতই পিছন দিকে নিয়ে দুটি করতল সন্নদ্ধ করে দাঁড়ান তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি—গান করছিলেন 'জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়'—উন্মাদিনীর জায়গায় স্বর ঈষৎ উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে তখন তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত চোখ বোজা—পরেও লক্ষ্য করেছি যখনই স্বর উঁচু গ্রামের দিকে যেত কিংবা কোনো মীড়ের জায়গায়—যেমন মেঘের পরে মেঘ জমেছে—তখন তাঁর গায়কী ঢঙ-এ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, অর্ধ মুদিত চোখ, মাথা পিছন দিকে সামান্য হেলান এছাড়া কোনো আতিশয্য থাকত না। আমি এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করছি এজন্য যে কবির কথা মনে পড়লে তিনি খুব জীবন্তভাবে যেন সশরীরে তাঁর সমস্ত ভাবভঙ্গি গলার স্বর নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু আমার সেই মানস দৃশ্যের তো ফটোগ্রাফ হয় না সেইজন্য লিখে রাখছি। এ লেখা যাঁরা স্মৃতির সঙ্গে মেলাতে পারবেন সে রকম লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং অচিরেই আর থাকবে না। তবু আমি লিখছি এই জন্য যে ভবিষ্যতে যখন কেউ নাটক করবেন রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে—এসব বর্ণনা হয়ত তাঁর কাজে লাগবে। ভাস্করেরও লাগতে পারে। যদি অবশ্য সে ভাস্কর্য আকৃতির পরোয়া করে।

আমি লাল আলমারীটির সামনে পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—রবীন্দ্রনাথ এক লাইন গাইছেন আর হুটুদি অনুবর্তন করছেন, চলেছে—চলেইছে, একেবারে নিখুঁত না করে ছাড়বেন না। অনেকদিন পরে আর একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে—তখন উত্তরায়ণের পশ্চিমের বারান্দা তৈরী হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে কাঠের কারুকার্য খচিত থাম—বাগানের দিকে বড় বড় খোলা জানলায় অর্ধমুক্ত

কোথাও দেখিনি। পরে যখন নানা দেশ ঘুরেছি তখন বুঝতে পেরেছি ওর মধ্যে চীনা প্রভাব আছে। ঐ বারান্দায় রিহার্সাল হত। ঐখানে তখনকার খ্যাত-নাম্নী নাচিয়ে যমুনাকে নাচতে দেখেছি। শাপমোচনের মহড়ায়। হৈমন্তীকে স্বর্গে তাল ভঙ্গ করতে দেখেছি উর্বশীরূপে, শান্তিদেবকে দেখেছি—'অহো কী দুঃসহ স্পর্দ্ধা' বলে উল্লম্ফিত হতে আর জাপানী ছেলেকে দেখেছি 'বসন্তে ফুল গাত্‌লো' বলে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নাচতে। চিত্রাঙ্গদার গান 'অশান্তি আজ হানলো' একই সুর—এটি শান্তিদেব নাচতেন। একই সুর কিন্তু নাচে এত পার্থক্য—দুটো দুরকম নাচ এবং বাণীর সঙ্গে সঙ্গত।

দু একবার আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি অপেক্ষাকৃত সুন্দর চেহারার মানুষদের কেন রঙ্গমঞ্চে আনেন না। কবি হাসতেন, বলতেন প্রথম কারণ শান্তিনিকেতনে ভর্তি হবার সময় চেহারার কথা তো গুণাবলীর মধ্যে ধরা হয় না। তাহলে শান্তিনিকেতন জনশূন্য হত। দ্বিতীয়ত চেহারা যেমনই হোক নাচটা তার নিজের সৃষ্টি সেটা সুন্দর হচ্ছে কিনা তাই দেখ—মানুষ যখন সুন্দরকে সৃষ্টি করে তুলছে তখনই তো সে শিল্পী—সেই শিল্পটা কেমন হয়েছে বিচার করতে হবে। নাচের বিচারে চেহারার স্থান নেই—একথা অবশ্য ছবি সম্বন্ধেও সত্য। সুন্দরী নারীর ছবি আঁকলেই যে সেটা বেশি ছবি হবে তা নয়।

যা হোক মায়ার খেলার গানের রিহার্সেল মনে পড়ে—অমিতা সেনের (খুকু) গান। কবি সঙ্গে গাইছেন—"অলি বার বার ফিরে আসে অলি বারবার ফিরে যায়,···কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না।" অমিতা একবার গাইছে, কবি আবার তাকে সংশোধন করছেন। অলির মত একই গানের কলি ফিরে ফিরে আসছে—কথাটা এখানেও অন্য অর্থে সত্য হচ্ছে—গানের কলি তার পূর্ণরূপে বিকাশ হচ্ছে না—আমার অশিক্ষিত কান বুঝতেই পারছে না কোথায় পার্থক্য বা ত্রুটি হচ্ছে—কিন্তু কবি সেই একটি লাইন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছেন, বলছেন, 'কর্ আমার সঙ্গে কর্'—সেদিন আমি কবির ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত সহিষ্ণু শিক্ষক আমি আর দেখিনি।

এরপর কলকাতায় 'কবি সার্বভৌম' উপাধি প্রদানের উৎসবের কথা—আমার যতদূর মনে পড়ে, বাবা একটি দিনই পেয়েছিলেন তাই প্রথমে রবীন্দ্র-পরিষদ হয়ে তারপর সংস্কৃত কলেজে আসেন।

আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবিকে আনতে গেলাম। আমাদের গাড়িটা

তলার ঘরে এসে দেখি একটা ওভাল টেবিলকে ঘিরে তিন চারজন বসে আছেন, তার মধ্যে একজন প্রশান্তচন্দ্র ও অন্যজন অমল হোম। কবি গরদের ধুতি-চাদর পরে তৈরী। আমি ঘরে ঢুকতেই খুব নির্বিকারভাবে বললেন, "তুমি হঠাৎ অসময়ে ?" আমি বললাম, "আপনাকে নিতে এসেছি।" কবি যেন কোন বিস্মৃত কথা মনে পড়ে চমকে উঠলেন—"ওহোঃ আজকে তো সংস্কৃত কলেজে যাবার দিন।" তারপর খুব বিপন্ন মুখে—"তাই তো আমি তো একেবারে ভুলে গেছি, এই এঁরা সব এসেছেন আমাকে নিয়ে যাবেন চন্দননগর।" আমার তো মাথা ঘুরে গেল—রবীন্দ্র-পরিষদের অপেক্ষমান জনতার কথা মনে পড়ল, বাবার মুখ মনে পড়ল। হৃদকম্প হতে লাগল—সর্বনাশ! কী সমূহ সর্বনাশ! প্রশান্তচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখি মুচকি হাসি—অমল হোমও মৃদু মৃদু হাসছেন—আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে, চোখে জল আসছে—আমি ভাবছি কী হবে! অমল হোম হেসে উঠলেন, কবি বললেন, "তোমাকে ঠকানো বড় সোজা, ঠকিয়ে মজা নেই, দেখছ না তোমার অপেক্ষায় কীরকম সেজেগুজে বসে আছি"—এই ছিলেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কথায় কথায় মজা করা, ঠকানো, ধাঁধায় ফেলা, ভূতের ভয় দেখানো—এসবে অল্পবয়সীদের হার মানিয়ে দিতেন।

গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন রবীন্দ্র পরিষদের কোনো প্রতিনিধি। আমি রবীন্দ্রনাথের পিছন পিছন নেমে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়ালাম। কবি গাড়ি দেখে পিছিয়ে গেলেন। "এই তোমাদের গাড়ি ? এ গাড়িতে তো আমি যাব না।" আমি তো অবাক, গাড়ির দোষ হল কি ? গোপালবাবু ছিলেন জোড়াসাঁকোর খবরদারি করতেন, তিনি বললেন, উনি তো হুড খোলা গাড়িতে যাবেন না। তখন সিডান গাড়ি বেশি ছিল না। আমাদের হুডখোলা গাড়িই ভালো লাগত। আমাদের বরং মনে হত সিডান গাড়িতে আরাম নেই, খোলা হাওয়া নেই। তখন ওঁদের কালো সিডান গাড়িটি বার করা হল। গাড়িতে চড়ে আমি সুখে ভরপুর। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতার পথে বেরুবার অভিজ্ঞতা। কিন্তু লক্ষ্য করিনি ট্রাম থেকে লোক ঝুঁকে পড়ে দেখছে—রাস্তায় ভীড় জমবার উপক্রম। কবি খুব মৃদুস্বরে কথা বলছেন। পরেও আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিন প্রথম অবাক হয়ে ভাবছিলাম এত নীচু গলায় কথা বলছেন কেন ? আমাকে বললেন, "এখন বুঝতে পারছ কেন হুড খোলা গাড়িতে চড়া অসম্ভব ?" সত্যি সিডান গাড়িতে চড়েই যখন এই তখন খোলা গাড়িতে না জানি কি হবে। ভীড়ের আক্রমণ তাঁর একেবারেই ভালো লাগত না। কিন্তু উপায় কী ? এরকম মানুষকে দেখতে ভীড় তো জমবেই। সাধারণের চলাচলের জায়গায়, সভায় বা

মৈত্রেয়ী দেবী—১৯৩১

৺সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—১৯২৩

মানপত্র   ৩০ ১।৬১

জনসমাগমে কবি মনে করতেন জোরে কথা বলা অভদ্রতা—ট্রামে বাসে যে উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলা হয় আজকাল, সেটা দেখলে তাঁর কী মনে হত জানি না। অনেকে তো বুঝতেই পারে না সেটা অভদ্রতা বা অন্যের উপর অত্যাচার। এই সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ সে সময়ে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও নিন্দাজনক মনে হতো অর্থাৎ গ্যাকামী!

প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ শেষ করে সংস্কৃত কলেজে যাওয়া হল—সেখানে সকলে অপেক্ষা করছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে ভীড়ের অত্যাচারে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হয়েছিলেন বলে বাবা খুব সাবধানে ছিলেন, অধ্যাপকরা গেটে পাহারা দিচ্ছিলেন। ভিতরে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অপেক্ষা করছিলেন—দোতলায় উঠেই যে বড় হল ঘর সেখানে মাটিতে ফরাস বিছানো ছিল ও পাদ্য অর্ঘ্যের উপচার। সাজানো একটি বেদীতে রবীন্দ্রনাথ বসলেন। ফরাসের উপর বসে দুজন ওস্তাদ দুটি বৃহৎ বাদ্যযন্ত্রের কান মোচড়াচ্ছিলেন। আর একজন তবলচি তবলায় সুর বাঁধছিলেন—হাতুড়ির ঠুক ঠাক শব্দ ও কানে মোচড় আর তারে টুংটাং করে পরীক্ষা চলতেই লাগল। সভাস্থ সকলে অপেক্ষা করে বসে আছে কিন্তু কান মোচড়ানো আর থামেই না। রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, এতটুকু অস্থিরতার চিহ্ন নেই। বাবাই বা কি করেন, বড় বড় ওস্তাদ ডেকে এনেছেন, তাঁরা যে বাজনা না বাজিয়ে কান মোচড়াতেই থাকবেন তা কী করে জানবেন? যা হোক সব দুঃখেরই যেমন অন্ত আছে তেমনি এ দুঃখেরও হল। একটি রৌপ্যাধারে মানপত্র দিয়ে কবিকে উপহার দেওয়া হল। আর একটি সংস্কৃত কবিতায় বন্দনা লেখা ছিল। সেই সচিত্র কবিতাটি দেবনাগরী হরফে লেখা এখানে বাংলা লিপিতে উদ্ধৃত করলাম। হলদে তুলট কাগজে লেখা এই মানপত্রের চারিদিকে অজন্তার নক্শাটি রমেন চক্রবর্তীর আঁকা।

কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথেভ্যঃ

সবহুমানং দীয়মানং

মানপত্রম্

মানসনন্দন গন্ধসমীরণ সঞ্চর দিশি দিশি মন্দং
হে চারণায় বীণাং বাদয় সাধয় হৃদয়ানন্দম্।
লীলা সংকুল কলকোকিলকুল শীলয় মধুময়-গানং
কবি বসুধাপতিরেতি শুভায়তি ভারতি কুরু বহুমানম্।
এহি সুকোমল ভাব সমুজ্জ্বল রসময় দৈবত সিন্ধোঃ

বাণীভবনে বিদ্যাশরণে কৃপয়া কোবিদবন্দে।।
সংগতি মংগল—লাভ কুতূহল-বিবশা তব সুরভাষা
স্বাগত লপিতং পৃচ্ছতি ললিতং ভবতো নর বিশেষা।
বল্লীপুঞ্জে পুষ্প নিকুঞ্জে মঞ্জুল গুঞ্জিত-ভৃঙ্গে
নীলিম গহনে নীরদ সদনে গগনে ভূধর-শৃঙ্গে।
লোল সমীরে তটিনী তীরে শ্যামলশান্তি সুতন্ত্রে
তব নব কবিতামৃত রসতুলিতা ললিতা কম্রকদম্বে
তত্ত্ববিচারে নয়সম্ভারে রূপক চরিতে রম্যে
কৌশল সংস্কৃত ভক্তিরসাঙ্কিত কাব্যে সহৃদয় গম্যে
সুরসারাবে সদুপাখ্যানে গীতাঞ্জলি গীত-গীতে
দীব্যসি পদ্যে ভুবি নিবন্ধে কস্তু নির্মলনীতে
বোধ বিভাকর মোহতমোহর শান্তিনিকেতন নাত
বিশ্বমুদারং শিক্ষণসারং লম্ভয়সে শুভ-দাত
নাকং ভাগে রোচিতরাগে রবিরপি দীপিতকান্তিঃ
কস্তুম কস্মাত্ত্বদিতঃ কস্মাদিহ ভুবি ভবিত শান্তিঃ

অন্বয় শুদ্ধ ভাবসমৃদ্ধা কোমলগুণ পরিবীতা
দোষ বিমুক্তা সম্পদ যুক্তা শোভন রীতিবিনীতা
ধ্বনি পরিবারালঙ্কৃত সারা সাহিত্যচন্দ্রিকারা
দীব্যতি দিব্যা বনিতা নব্যা তাবককবিতা বারা
নন্দন সারে সুরমন্দারে কৃত্বা সরসবিহারং
বিশ্রুত বঙ্গো দৈবত ভৃঙ্গো ভূম্যৈ দধদর তাবম্
দিব্যমশেষং কবিতাবেশং বিতরসি মধু বহুধারং
লোকাতীতং সুখমুপনতং যেন হি বাত বিকারম।
শিক্ষণ শাস্ত্রো মুনিনিবদাস্ত্রো ভকবির বিদ্যাশুদ্ধঃ
স্পষ্টো বিধিনা নবনিবরবিনা দেশো গুণগণলব্ধ!
লোক বিনীতং শাশ্বতনীতিং স্বয়মিহন চরতিধাতা
কৃত্বা দ্বারং সজ্জন সারং সভবতি লোক-বিনেতা।
ত্বন্মাননার্থং কবি সার্বভৌমেত্যুপাধিরত্নং সমুপহরামঃ
তৎস্বীয় নামাঙ্ক ভূষাদবানঃ সন্তুষয়েত্যাস্তি সমীহিতং নঃ।

গুণ গৃহ্যৈঃ

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষৈঃ তথাধ্যাপকবর্গেঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্তঃ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ, শ্রীনিবারণচন্দ্র স্মৃতিতর্কতীর্থৈঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থৈঃ, শ্রীকালীপদ তর্কশাস্ত্রৈঃ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তৈঃ

বঙ্গানুবাদ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে

বহুমান সহকারে দীয়মান

মানপত্র

হে মানস নন্দন হে গন্ধময় সমীরণ, তুমি দিকে দিকে ধীরগতিতে সঞ্চরণ কর। হে লীলাময়, কলতানে রত কোকিলকুল, তোমরা মধুময় সঙ্গীত শীলন কর ; কবি কুলপতি শুভসম্পাদনের নিমিত্ত আগমন করছেন, হে ভারতী বহু সম্মানে তাঁকে ভূষিত কর। দৈবত সিন্ধুর অতিশয় কোমল ও ভাবসম্পদে সমুজ্জ্বল হে সুধী-বর্গের মিত্র! তুমি কৃপাপূর্বক বিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ এই বিদ্যাভবনে আগমণ কর। যোগ্যতারূপ মাঙ্গল্যে এবং লাভরূপ কৌতূহলে তোমার দেবভাষা হয়েছেন বিবশা ; তোমার নিকট হতে বিশেষ শক্তি লাভ করে মধুর ভাষায় স্বাগত ভাষণ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন।

লতাপুঞ্জে পুষ্পকুঞ্জে সুমধুর গুঞ্জনরত ভৃঙ্গে নীলিম গহনে মেঘালয়ে, আকাশে, পর্বতশৃঙ্গে, ধীরগতি সম্পন্ন বায়ুতে, তটিনীর জলে, শ্যামল শান্তিময় শস্যগুচ্ছে তোমার অমৃতরস সদৃশ নূতন কবিতা রাজি কমনীয় কদম্বপুষ্পে মধুর। তত্ত্ব-বিচারে নৈতিক সমৃদ্ধিতে রূপাকাশ্রিত রমণীয়তায়, কৌশল পূর্বক ভক্তিরসে সমৃদ্ধ কাব্যে, সহৃদয়গম্যতায় উত্তমরসের আধানের সৎ উপাখ্যানে, গীতাঞ্জলির অন্তর্গত-গীতে—নির্মলনীতি বিশিষ্ট কে তুমি অনিন্দ্যনীয় কবিতায় এই বিশ্বে ক্রীড়া করছ? হে মোহরূপ তামসের অপহারক, হে বোধিরূপ সূর্য, শান্তিনিকেতনের বিধাতা, উদার শিক্ষণের সারভূত বিষয় বিশ্বকে শুভপ্রদাতা তুমি উপলব্ধি করতে সাহায্য করছ? পশ্চিমদিকে রাগ দ্বারা রোচিত হয়ে সূর্যও দীপিতকান্তি হয়ে থাকেন, কিন্তু এই পৃথিবীতে শান্তির ভাবনায় সন্দীপিত কে তুমি, কোথা হতে আবির্ভূত হলে? অন্বয়ে পরস্পর অর্থসংগীত শুদ্ধ, ভাবে সমৃদ্ধ, কোমল গুণ দ্বারা যুক্ত দোষ সমূহের থেকে বিশেষভাবে মুক্ত, সৎপদ দ্বারা সম্পর্কিত, শোভন রীতিতে বিনীত, ধ্বনিময়, অলঙ্কৃতি সার, চিত্তবিকারের অপসারক তোমার পবিত্র কবিতা সমূহ নব বণিতার ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে।

নন্দন কাননের দেব পারিজাতের সুগন্ধে রসময় বিহার সম্পন্ন করে, রঙ্গে বিখ্যাত দৈবতভৃঙ্গ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই তুমি কবিতার আকারে অশেষ মধুময় কবিতারস বিতরণ করছ—যে কবিতারস দান করে লোকাতীত সুখ এবং যার ফলে দূরীভূত হয় হৃদয়ের বিকার। তুমি শিশুর ন্যায় শান্ত, মুনির ন্যায় সংযত, গুরুর ন্যায় বিদ্যাশুদ্ধ, অখিল গুণদ্বারা আবদ্ধ, তুমি অপার নীতিজ্ঞান

সম্পন্ন বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে! বিধাতা স্বয়ং এই বিশ্বে লোকসংযম ও শাশ্বত-নীতি আচরণ করেন না, কিন্তু সেই লোকবিনেতা সজ্জনবর্গের হৃদয়কে অবলম্বন করে জগতে আবির্ভূত হন।

তোমাকে সম্মান জ্ঞাপনের নিমিত্ত "কবি সার্বভৌম" এই উপাধি আমরা আহরণ করেছি। তা নিজ নামের অঙ্গরূপে গ্রহণপূর্বক আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সম্যকরূপে ভূষিত কর।

ইতি—গুণগৃহ্য

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের

অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকবর্গ।

জয়ন্তী উৎসব

Glen Eden

Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় এসে দূরধ্বনিবহ যোগে তোমাদের সন্ধান করেছিলুম। প্রত্যুত্তর না পেয়ে মনে করলুম আয়ু পরিবর্দ্ধনের প্রত্যাশায় বায়ু পরিবর্ত্তনে বেরিয়েছ। আমিও সেই সংকল্পে অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও দার্জ্জিলিং এসেছি। স্পর্দ্ধিত পৃথিবীর অভ্রভেদী ঔদ্ধত্য আমি পছন্দ করিনে, তার চেয়ে অবারিত আকাশের তলে তার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আমার মনকে মুগ্ধ করে। মনে করেছিলুম ছুটির মাসটায় শান্তিনিকেতনে শেফালি-সুগন্ধী শুভ্র শরতের নির্মল প্রসাদ নির্জনে উপভোগ করব কিন্তু শরীর এবার শ্রান্তিভারে অভিভূত তাই গিরিরাজের আতিথ্যে শুশ্রূষা কামনা করে এখানে এসেচি। স্বাস্থ্য সংগ্রহ করে যদি নিয়ে যেতে পারি তবে দূর পথে কর্তব্যের বোঝা আরো কিছুদিন টেনে বেড়াতে পারব।

কলকাতা থেকে দূরে গেছ ভালই করেছ—দূরে যাওয়া অবগাহন স্নানের মতো, নিকটের ধূলি ধুয়ে দেয় এবং সঞ্চিত তাপ দূর করে। যে অবকাশে মন আপনাকে প্রসারিত করতে পারে অভ্যস্ত সংসার তাকে নানা দিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। সংসার কর্তৃক সেই একান্ত অবরোধের মধ্যে সংসারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয়। মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তবেই সেই সম্বন্ধকে আমরা বিশুদ্ধ করে নিতে পারি। এই সার্ব্বভৌম কবির কথা তোমার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

এবং তোমরা সকলে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি
বিজয়া দশমী ১৩৩৮

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিখানা কাশিতে আউনগাবাবির ঠিকানায় এসে পৌছল। দার্জিলিঙে ডাক্তার নীলরতন সরকারের দুখানা বাড়ি ছিল। প্লেন ইডেন ২।৩ কিংবা ১।২ নম্বর, ঠিক মনে পড়ছে না। তারই একখানা বাড়ি রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বছরের জন্য লীজ নিয়েছিলেন ও তার আদ্যোপান্ত সংস্কার করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও অনেক চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথকে দুবারের বেশি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। উনি কোনো এক পাহাড়ে দ্বিতীয়বার যেতে চাইতেন না। কেবল শেষের দিকে চার পাঁচবার মংপু ও কালিম্পং গিয়েছিলেন আমার নির্বন্ধাতিশয্যে।

কাশী থেকে সমস্ত উত্তর ভারত বেড়িয়ে আমরা ফিরলাম। এবং ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাগানঘেরা, বাংলো বাড়িতে উঠে এলাম। বাবা বললেন, এই বাড়িতে কবিকে একবার আনতে হবে। এদিকে জয়ন্তী উৎসবের সমারোহ আয়োজন সুরু হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। এ বিষয়ে অমল হোম ও কালিদাস নাগ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

কল্যাণীয়াসু

আমি তো আপাততঃ এইখানেই স্থির আছি যে পর্যন্ত না জয়ন্তীর দূতেরা আমাকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে যায়। ছিলেম দার্জিলিঙে শরীরটা ভালোই ছিল এখানে নেমে এসে নানা রকম কাজের চক্রে পাক খেয়ে মরছি—মুহূর্তকাল সময় পাচ্চিনে। যে ছবিটা পাঠিয়েচ তার ভুতুড়ে গোছের চেহারা। কোথা কোন প্রেতলোক থেকে সংগ্রহ করেচ। সময় পেলে তলদেশে কিছু লিখে দেবার চেষ্টা করব—কিন্তু আকৃতিটা দেখে কবিত্বের প্রেরণা মনে আসচে না।
২৪ নভেম্বর ১৯৩১

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যে ছবিটা পাঠিয়েছিলাম সেটা খুব অপরিচিত নয়। সাধনার যুগের। যতদূর মনে পড়ে ছোট কালো দাড়ি চোখে পাঁসনে—একটা বেতের লম্বা কাগজ

রাখার বাক্স পাশে, লেখাপড়া করছেন। যা হোক ছবিটা কবির পছন্দ হয়নি এবং আমি ফেরতও পাইনি। বছর দুই পরে এর পরিবর্তে বিলাতে তোলা একটা খুব সুন্দর ছবি পাঠিয়েছিলেন।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কোনো কোনো চিঠির জন্মক্ষণে হঠাৎ দুর্গ্রহের দৃষ্টি পড়ে। তোমার বাবার চিঠি পেয়ে তার জবাব লিখতে বসেছিলুম। একপাতা হতে না হতে বাধার উপর বাধা। কিছুদিন থেকে আমি নানাপ্রকার কাজে অকাজে এত বেশি বিজড়িত যে তাতে কাজও এগোয় না বিশ্রামও চাপা পড়ে। ছোটখাট জরুরী বৈষয়িক কর্ম— বৈষয়িক বলতে সম্পত্তি রক্ষণের কথা কল্পনা কোরো না—যে কাজ আমার ঘাড়ে চেপেছে তারই ঘাড়ে যত কিছু দায় চেপে বসেছে, থেকে থেকে এক একবার তারা আমাকে ব্যস্ত করে তোলে—বিশেষত যখন অন্নাভাব ঘটে। সেই দুঃসময় এসেছে। তার উপরে একটা অভিনয়ের উদ্যোগপর্ব—সেটা জয়ন্তী নামধারী একটা বিরাট পর্ব্বেরই আনুষঙ্গিক।

যা হোক অরুণসারথির মতো সেই অসমাপ্ত পত্র পদার্থটা চিরকাল অসম্পূর্ণ হয়েই থাকবে না, কোনো একটা অবকাশে সেটার উপর হস্তক্ষেপ করব।

কলকাতায় এখন যাওয়া ঘটবে না। জয়ন্তীর সময় আশা করি যাওয়া সম্ভব হবে।

তোমার বাবাকে আমার সবিনয় নমস্কার জানিয়ে পত্রোত্তর চ্যুতি জনিত অপরাধের ক্ষমা সংগ্রহ করে নিয়ো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলছিল। দেশ বিদেশের লেখকদের লেখা সংগ্রহ হচ্ছিল Golden Book Of Tagore-এর জন্য। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উৎসব। আগেই বলেছি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন অমল হোম। উৎসব সংঘটনের চেয়েও মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছিল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র সংখ্যার সম্পাদন। সংক্ষেপে রবীন্দ্র জীবন ও কর্মের ইতিবৃত্ত। ইংরেজিতে লেখা এই পত্রিকা বিবিধ খবরে ঠাসা। রবীন্দ্রনাথের উপর যারা গবেষণা করবেন তাঁদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। এইটি তাঁর গুরুদক্ষিণা, এরকম কবির কম ভক্তই করেছে।

উৎসবের দিন আমি গিয়েছিলাম বটে কিন্তু কি কারণে জানি না অত বড় ঘটনাটা আমার মন থেকে প্রায় মুছে গেছে। উৎসব গৃহের একটা আবছা দৃশ্য ছাড়া বিশেষ কিছু মনে নেই। উৎসবের প্রথম দিনে নিজের বক্তব্য বলা হলে কবি চলে আসেন। আমি দুপুরবেলা জোড়াসাঁকোয় এসে কবির কাছে বসে থাকতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সভায় থাকলেন না কেন? তাতে উনি বলেছিলেন, "বাস্ রে সেখানে সবাই আমার প্রশস্তি গাইবে আর আমি বসে বসে শুনব!" জয়ন্তী উৎসবে দেশ জুড়ে সাড়া পড়েছিল—কিন্তু কটুবাক্যও যে একেবারে উচ্চারিত হয়নি তা নয়। কেউ কেউ বলেছিল অমল হোম রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করে নিজের কোনো সুবিধা করে নেবেন, এমন কি আর্থিক লাভেরও ইঙ্গিত শুনেছি। আবার গুজব রটল রবীন্দ্রনাথ নিজেই অমল হোমকে দিয়ে নিজের জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছেন।

এই কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র অমল হোমকে একটা সুন্দর চিঠি লেখেন "...জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি কবি তোমাকে খাড়া করেছেন তার শিখণ্ডী মাত্র তুমি ...এ যে বাংলা দেশ অমল। মনে কোনো ক্ষোভ রেখ না, যে যা বলে বলুক..." বাংলাদেশই বটে। এই সব শুনেই নাকি কবি কোনো সময় বলেছিলেন— "একদিন লিখেছিলুম 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে'। মরার আগে নিজের হাতে এ লাইনটি কেটে দিয়ে যাব।"

একদিকে যেমন এই অন্য দিকে আবার ঘরে ঘরে তাঁর জন্য কী গভীর ভালোবাসার স্থান তাও তো দেখেছি।

কল্যাণীয়াসু,

পর্শু জোড়াসাঁকোয় থাকব মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ পর্যন্ত। যদি আসতে পারো তো দেখা হবে। আজকের দিনের ব্যাপারে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে। টাউন হলে দোতালায় ওঠা নামা করে অবসন্ন হয়ে গেছি—বিকেলে এখনও কাজ বাকি আছে।

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ

চিঠিটায় তারিখ নেই তবে যতদূর সম্ভব জয়ন্তী উৎসবের পরে লেখা।

জয়ন্তী উৎসবের সময়ে একটু ফাঁক বুঝে বাবা একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে

আমাদের সাত নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে নিয়ে এলেন। আমি কিছুদিন থেকে রমেনবাবুর কাছে ছবি আঁকা শিখতাম—আমার আঁকা কাঁথা সীবনরত বঙ্গবধূর ছবি দেখে বলেছিলেন, "আমরা পুরুষেরা যখন লিখি তখন মেয়েদের কথা লিখি, যখন আঁকি মেয়েদের ছবি আঁকি—তোমরাও দেখি ঠিক তাই কর। তোমাদের এত অহঙ্কার পুরুষদের ছবি আঁক না—নিজেদেরই আঁক।" এই অভিযোগ দু একবার শুনে আমি একটি অশ্বারোহী রাজপুত্রের ছবি এঁকে ছিলাম—বনের মধ্যে একাকী চলেছে—ছবিটা নেহাৎ মন্দ হয়নি। বাবা কবিকে দেখালেন, রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "ইনিই কি আসবেন নাকি!"

মা পঞ্চব্যঞ্জন নয় প্রায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ছিলেন। আমাদের প্রশস্ত মেহ-গনির টেবিলের অর্দ্ধেক জুড়ে বাটি চলে গিয়েছিল। রূপোর থালা বাটিতে সাজান প্রভৃত আয়োজন দেখে কবি বলেছিলেন, "আমার শক্তি ক্ষমতা সম্বন্ধে তোমাদের বিশ্বাস টিঁকিয়ে রাখতে পারব না।" মা আর বাবা দুজনে একটি একটি করে বাটি এগিয়ে ও সরিয়ে দিচ্ছিলেন পরম তৃপ্তি ভরে, তাঁদের দুজনের সেই সুখস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি আমাদের সংসারের বিলীয়মান সন্ধ্যারাগের সুন্দর দৃশ্যের মত আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

সেদিন আহারের পর বসবার ঘরে কবি এসে বসলে বাবা Golden Book of Tagore বইখানি তাঁর হাতে দিলেন কিছু লিখে দেবার জন্য।

মূল্যবান এন্টিক কাগজে ছাপা সিল্কের বাঁধাই বই বিদগ্ধ জনের রচনা সম্বলিত ও নানা শিল্পীর চিত্রে সজ্জিত, সে বইখানি অমল হোম ও কালিদাস নাগ মহা-শয়ের বহু পরিশ্রমের ফল। বইটি হাতে নিয়ে কবি এক মুহূর্তে ফস ফস করে চারটি লাইন লিখে দিলেন—এত সুন্দর সেই কবিতাটি এত অনায়াসে লেখা এবং এতই নিপুণ সেই হস্তাক্ষর যে অনেকে সেটি ছাপা বা লিথোগ্রাফ মনে করে—

"যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাঁধে
নামটা মোর মরে মরুক ঘুরে
মনটা মোর যেন অপ্রমাদে
শান্ত হয়ে রহে অনেকদূরে।"

এই অপূর্ব কবিতাটি 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোরে'র উপর লেখবার উপযুক্ত কবিতা কিন্তু এটা তাঁর মুখের কথা মাত্র নয়। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবি তখন কেবলি মনে হয়, মননে ও বচনে কত একীভূত ছিল তাঁর জীবনের বাণী। যখন জয়ন্তী উৎসবের জন্য কবি কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন আমি তাঁর কাছে যেতাম ও দেখতাম উৎসবক্ষেত্র থেকে অনেকে তাঁর কাছে এসে

অনেক কথা বলে যেতেন। কিন্তু এই সব প্রশংসাতে তাঁর কোনো অহমিকা জন্মাত না। মনটাকে সকল প্রমাদ থেকে দূরে রাখার সাধনাই তাঁর প্রতিদিনের পূজা একথা বার বার বলতেন ও জীবনে সত্য করে তুলতেন। রচনার নিন্দা শুনলে দুঃখ পেতেন সত্যিই, স্পর্শকাতর সুকুমার তাঁর মন নিন্দার শরে বার বার ক্ষত হলেও অহমিকা শূন্যতাও একই সঙ্গে ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি যে ভালো লেখেন তার জন্য দম্ভ করবার কিছু নেই, যেমন কেউ যে ভালো লেখে না সেটাও তার দোষ নয়। একথা প্রায়ই বলতেন, "আমি কারু লেখা খারাপ বলতে পারি না কারণ তাতে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়—প্রায় শাস্তিই বলা চলে অথচ বেচারা যে ভালো লিখতে পারে না সেটা তো কোনো অপরাধ নয়। সেটাকে মরাল ক্রাইম বলা চলে না।"

নিন্দামন্দ যে যাই করুক বাংলা দেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কী ভালোবেসে ছিল সে কথা মনে করলে আমার একজনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে, তিনি বৃদ্ধ মাখন সরকার। এঁকে কেউ আর আজ জানে না। এমন কি পুলিনবিহারী সেনও নামটিই মাত্র বলতে পাবেন। তাঁর কথা তাই এখানে লিখে রাখছি। এক দিন সন্ধ্যেবেলা জোড়াসাঁকোয় কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, উনি তেতালার সামনের বারান্দায় অল্প অন্ধকারে বসে আছেন—পাশে দু একটি মোড়া, মনে হয় কেউ বসেছিলেন এই মাত্র উঠে গেছেন। কবি আমাকে বললেন, তুমি আর একটু আগে এলে আমার একজন ভক্তকে দেখতে পেতে—মাখন সরকার—সরকারী আপিসের কেরাণী—আমার সমস্ত লেখা তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়া আছে। যেমন পুরোনো কবিতা তেমন নূতন কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। একথার অর্থ এই যে সে সময়ে যারা রবীন্দ্রনাথ পড়তেন তাঁদের মধ্যে স্পষ্টত দুটি ভাগ ছিল। যেমন যাঁরা মানসী সোনারতরী চিত্রা প্রভৃতি পছন্দ করতেন বলাকার পরবর্তী কবিতা তাঁদের ভালো লাগত না। আবার এর উল্টোটাও সত্যি, অমিয় বাবু বলতেন মানসীর কবিতাগুলো কবিতাই নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি লিখে-ছেন, ভাব ও ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে—কিন্তু শত পরিবর্তন সত্ত্বেও মণিসূত্রে গাঁথা তাঁর চিত্তসত্তার একটি অপরিবর্তনীয় রূপ অবশ্যই ছিল যা ভাষার পার্থক্যহেতু অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। যাক অন্য কথায় চলে এলাম। রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, মাখনের ভক্তি জানো, একেবারে বৈষ্ণবোচিত—আমাকে ওর বাড়ি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়, সকাল থেকে স্বামীস্ত্রী না খেয়ে বসে আছে, নিজের হাতে রান্না করেছেন ওর স্ত্রী. বললেন, তুমি আমার গোপাল আমি তোমাকে পায়েস খাইয়ে দিয়ে প্রসাদ পাব। অনেক গল্প করেছিলেন সেদিন

কবি মাখন সরকারের—কিন্তু এই গোপালকে পায়েস খাওয়ান প্রভৃতি সেকেলে ভাব আমাকে খুব মুগ্ধ করল না। আমি বরঞ্চ ভাবলাম ভাগ্যিস ভদ্রলোক এখান থেকে চলে গিয়েছেন তাই কবিকে একটু একলা পেলাম। মংপু থেকে যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসি তখন কবিকে কলকাতাতেই পাই না আর একলা পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা!

এটা ছিল সম্ভবত ১৯৩৯ সাল। তার বহুদিন পরে ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি যখন মংপুর বাস গুটিয়ে কলকাতায় চলে আসবার আয়োজন চলছে অর্থাৎ আমার স্বামীর অবসর নেবার সময় হয়েছে, সেই সময় একদিন সরকারী কার্যোপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সামনে বসবার ঘরে দর্শনপ্রার্থীর ভীড়। তিনি কোনো কর্মচারীকে বললেন, 'আমার নাম ডঃ সেন, আমি মংপু থেকে আসছি, আমার এপয়েণ্টমেণ্ট আছে—এক কোনে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ খাতা লিখছিলেন, উঠে এগিয়ে এলেন, তারপর কথোপকথন এই রকম—"আপনি মংপু থেকে আসছেন? আমার মা মৈত্রেয়ীকে চেনেন?" সবিস্ময় উত্তর, "হ্যাঁ তিনি আমার স্ত্রী··· আপনি?" "আমার নাম মাখন সরকার, আমাকে একবার আমার মাকে দেখাতে পারেন?" "নিশ্চয়ই, আপনি যেদিন আদেশ করবেন আমি আপনাকে নিয়ে যাব।"

সব শুনেও মাখন সরকার নামটি আমার কোনো স্মৃতি স্পর্শই করল না। যা হোক একটি দিন স্থির হল তাঁকে আমাদের বাড়িতে আনবার। ইনি ডঃ বিধান রায়ের বিশ্বস্ত কর্মচারী—এঁকে মেডিকেল কলেজ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও উপার্জনের জন্য কাজ করতে হচ্ছে, এইটুকুও খবর পেলাম। আমার স্বামী বললেন, ভদ্রলোককে দেখলে ভক্তি হয়। নির্দিষ্ট দিনে অপেক্ষা করে আছি বৃদ্ধ সাত্ত্বিক মানুষ শুনে একটু ফল শরবৎ তৈরী করে উৎসুক হয়ে। যদিও কেন তাঁর আমার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ তার কিছুই জানি না। অনুমান করছি 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটির কারণেই হয়ে থাকবে।

১নং বালিগঞ্জ পার্কের ল্যাণ্ডিং এর দরজা খুলে দেখলুম আমার স্বামী একটি শ্বেতকেশ শীর্ণকায় গৌরবর্ণ সৌম্য দর্শন বৃদ্ধকে গাড়ি থেকে নামাচ্ছেন। কম্পিত পায়ে তাঁর হাত ধরে কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠে এলেন এবং আমি তাঁকে প্রণাম করবার আগেই তিনি ভূপতিত হয়ে আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত করলেন, মাটিতে উর্দ্ধবাহু তাঁর দীর্ঘদেহ আমার পায়ের উপরে পতিত—আমি কাঁপিতে লাগলাম, বসে পড়ে বললাম, উঠন, উঠন, আমার যে পাপ হবে—তিনি উঠে

বসে আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, "মা তুমি এই হাত দিয়ে তাঁর সেবা করেছ এ হাত আমার মাথায় রাখ। তোমার ভক্তি ভালোবাসার শক্তিতে তাঁকে পেয়েছিলে, তুমি যে আমার মাথার মণি।" সেই সিঁড়ির তলায় মাটিতে আমরা দুজনে এক নিবিড় নীরবতায় একাত্ম হয়ে বসে রইলাম বহুক্ষণ। একটা গভীর অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করতে করতে আমার হঠাৎ মনে পড়ল মাখন সরকার কে। এরই সেই বৈষ্ণবোচিত ভক্তি—এঁর কথাই কবি আমাকে গভীর স্নেহের সঙ্গে বলেছিলেন। তখন বুঝতে পারিনি এই ভক্তির রূপ কী। আমার হাত ধরে বসে এক অন্তরঙ্গ নিস্তব্ধতায় যেন ডুব দিলেন মাখন সরকার। আমি অনুভব করলুম আমার ভিতর দিয়ে তাঁর ভালোবাসার তরঙ্গ যেন দূর থেকে দূরে বয়ে চলেছে। 'তপতী' গ্রন্থে একটি লাইন আছে রাণী রাজাকে বলছেন, "মহারাজ তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে।" আমার মনে হল মাখন সরকারের ভক্তি বা প্রেমও যেন তাঁর প্রেমের পাত্রকে ছাড়িয়ে আরো দূরে পৌঁছেছে—পৌঁছেছে সেই নিত্য উৎসের ধারে যেখান থেকে চির প্রেমের প্রবাহ এই মানব জগতের অন্তরে নিষ্যন্দিত।

দেশে বিদেশে আমাব অনেক রকম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু আমার ঘরের দরজায় মাখন সরকারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ অতুলনীয়।

'জয়ন্তী' কথাটা সম্ভবত এই সময় থেকেই সুরু। জয়ন্তী উৎসবে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম সেটা কবিকে শোনাই নি, একেবারেই প্রবাসী কিংবা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটা পড়তে পড়তে আমার সেদিনের অনুভূতিটা মনে পড়ল, কী জানি কী কারণে সেই বিরাট ধুমধাম আমাকে বিমর্ষ করেছিল। যাঁরা আয়োজন করেছিলেন তাঁরা খাঁটি মানুষ, তবু আমার মনে হচ্ছিল এত বাহ্য আড়ম্বরের একটা অসারতা আছে। আজ বুঝতে পারি সেটা অল্পবয়সের একটা 'মুড্' মাত্র কিংবা ভুল হলেও স্বাধীন ভাবনার সূত্রপাত। যা হোক আমার সমভাবাপন্ন আর একজন ছিলেন, তাঁর নাম প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর একটি দীর্ঘ অপূর্ব কবিতা একই সঙ্গে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শুভলগ্ন

শুভদিনে ভক্ত যত গেল দেবালয়ে
নতনেত্রে মুগ্ধ-হাতে অর্ঘ্যথালা বয়ে

বিকশিত পুষ্প দলে দিল অবিরাম
অসংখ্য অঞ্জলি আর অসংখ্য প্রণাম।
অনন্ত এ নিখিলের কাল অগনন
একটি মুহূর্ত আসে পরমশোভন
শুষ্ক বৃক্ষ শাখা হতে ঝরে পুষ্পরাজি
দিকে দিকে সে মুহূর্তে শঙ্খ ওঠে বাজি
ত্রিলোকের মর্মে মর্মে বাজে ধ্বনি তার
অনন্ত আকাশ হতে কলস সুধার
ঝরে নিখিলের পাত্রে তারি মধুরিমা
উদয় আলোতে আনে অপার মহিমা।
সেদিন এ ধরণীর প্রাঙ্গণ কোণায়
নীরব অর্ঘ্যের থালা ভরেছে সোনায়
তোমার চরণ প্রান্তে পূজার অঞ্জলি
সেদিন হয়েছে ঢালা তাই এ সকলি
গৃহকোণে অক্ষমের যত আয়োজন
মিথ্যা হল। তোমার কি আছে প্রয়োজন
তুচ্ছ মোহে। ইহাদের মিথ্যা অভিমান
তোমারে কভু কি পারে সঁপিতে সম্মান?
লক্ষ চিত্ত তটে জাগে অরুণ আভাস
অবরুদ্ধ জীবনের তুমি কি আকাশ
তুমি কি জীবন জোৎস্না ধেয়ানে মগন
মানস গগন তীরে? এ শুভ লগন
বেহাগে ধ্বনিত হল: ওঠে মুগ্ধ স্বর
তোমার তোরণ দ্বার জনতা মুখর
অসংখ্য চরণধ্বনি নৈবেদ্যের থালা
প্রজ্জ্বলিত ধূপশিখা পুষ্পগন্ধ ঢালা
উচ্ছ্বসিত উৎসবের আনন্দ উছল
সেথা মোর প্রবেশিতে নাহি ছিল বল।

সেই মুক্তদ্বার প্রান্তে চিরজীবনের
করুণ অঞ্জলি ছিল অশক্ত ভক্তের।

চির চরিতার্থতার মুগ্ধ-দীপ্তি লিখা
নিরুদ্ধ হৃদয় তলে সে নিষ্কম্প শিখা।
সেই তুচ্ছ দীপরশ্মি হে মহিমাময়
বুঝি এই পথপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত হয়
মেঘমুক্ত জীবনের জ্যোৎস্নাময়ী শশী
পশ্চাতে ফেলেছে মোর আঁধার তামসী
এ পূর্ণ প্রভায় আজ নাহি দৈন্য লেশ
যা কিছু চেয়েছি বেশি তাহা হোক শেষ
তোমার প্রাঙ্গণ দ্বারে পরিপূর্ণ চিত
সহসা পেয়েছি আজ অশেষ অমৃত।
তবু এ অক্ষম চিত্তে স্তব্ধ নীরবতা
নিঃশব্দ প্রণতি মম খোঁজে সার্থকতা
জন সিন্ধুতটে ফেরে খুঁজে এর দাম
হে কবি চিত্তের বন্ধু লবে এ প্রণাম?

ওঁ

খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

জানতে চেয়েছিলে কবে কলকাতায় আসব। এই চিঠিতেই সংবাদ পাবে। ভালো আছ তো? তোমার বাবা কি এখনও দাক্ষিণাত্যে? ইতি
৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

এখানে থাকব কিছুদিন। হয়তো দিন দশেক। কোনো এক সময়ে ক্ষণকালের জন্যে জোড়াসাঁকোয় যাওয়া ঘটতেও পারে কিন্তু সে অকস্মাৎ। আগে থাকতে বলা কঠিন। কোনো একদিন আমার লেখা একটা গল্প পড়বার কথা আছে—যদি স্থির হয় জানাব। শরীরটাকে সুস্থ রাখবার চেষ্টা কোরো। কারণ

যতদিন বেঁচে থাকি শরীরটাতে প্রয়োজন আছে। তা ছাড়াও অনেক যুক্তি দেখান যেতে পারে যথা শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। আরো যদি চাও লাটিন ভাষায় শাস্ত্র বাক্য পাবে তাতে সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের সমন্বয়ের উপদেশ মিলবে।* কিন্তু অলমতি বিস্তরেণ। এখানে গঙ্গাতীরের হাওয়া ক্ষণকালের জন্য হলেও পুণ্য ও স্বাস্থ্যের আনুকূল্য করতে পারে, চিত্ত প্রসাদের পক্ষেও এর উপযোগিতা থাকতে পারে। আর কোনো যুক্তি যদি না মানো শহরের ধূলিজাল থেকে মুক্তি মানতেই হবে। ইতি দেওয়ালি ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকো ক্রমেই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। পুরানো জমজমাট সংসারের পর যেন শূন্যতা বাড়িটাকে ঘিরে থাকত। তা ছাড়া শহরে থাকা ক্রমেই অনভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। জয়ন্তী উৎসবের পর খড়দহে শ্যামসুন্দর ঘাটের পাশে একটা বড় দোতালা বাড়ি রথীন্দ্রনাথ ভাড়া নেন। সেখানে গঙ্গার ঘাটে 'পদ্মা' বোট বাঁধা ছিল—এই 'পদ্মায়' রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পতিসরে বাস করতেন। 'মানস সুন্দরী' এই বোটে লেখা হয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম কবি এরোপ্লেনে পারস্য যাবেন—সঙ্গে যাবেন অমিয় চক্রবর্তী, কেদার চাটুজ্যে ও প্রতিমা দেবী। তখনকার প্লেনের যা অবস্থা। "প্রেসারাইসড" কথাটাই তৈরী হয়নি, তাতে এঁরা যে সকলেই প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করছেন তাতে সন্দেহ ছিল না। আমরা ২।৩ দিন খড়দহের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গঙ্গার উপরে একটি প্রশস্ত বারান্দা ছাড়া সে বাড়ির আর কোনো বিশেষ সৌন্দর্য ছিল না, আর ছিল প্রচণ্ড মশার উৎপাত এবং শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে ভেসে আসত কর্ণপটহ ভেদকারী কাঁসর-ঘন্টা। শান্তিনিকেতনবাসীরা মশার উৎপাতে অনভ্যস্ত নয়—তখন চীনে ধূপ বলে জিলাপীর মত একটি মশক বিতাড়ক বস্তু ছিল। কবি অনেক সময় সেটি তাঁর বিপুল জোব্বার ভিতরে নিয়ে বসে থাকতেন। খড়দহে সেদিন তাঁর পায়ের কাছে বসে ঐ ধূপের আগুনে আমার সবচেয়ে প্রিয় নীল শাড়িটির অনেকখানি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম এটুকু মনে আছে।

তবে ওখানে কোনোদিন গল্প পড়া হয়েছিল বলে মনে নেই, হয়ত হয়নি।

পারস্য যাত্রার আগের দিন বাবা ও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম—সেদিন কবির গায়ে জ্বর। তিনি বললেন গঙ্গার ঘাটে বোটে প্রতিমা আছেন, তাঁকে দেখে যাও। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, সেই অল্প আলোতে প্রায়

*Mens sana in corpore sano

শয্যালগ্না প্রতিমাদেবীকে দেখলাম তিনি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন, এইরকম সব শরীরের অবস্থায় এঁদের টিকটিকে প্লেনে করে পারস্য যাত্রার উৎসাহ কি করে টিঁকে আছে আমরা বুঝতে পারলাম না। মনে আছে অন্ধকারে দীর্ঘপথ ফিরতে ফিরতে আশঙ্কায় আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন রবীন্দ্রনাথকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে এলাম। আমি হঠাৎ বললাম, বাবা ওঁরা আর ফিরতে পারবেন না, না? বাবা বললেন, কেন ফিরবেন না? আবো ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসবেন—তোর বুঝি খুব ভাবনা হচ্ছে? স্নেহপাপাশঙ্কী!

নীতু

নীতুকে আমি প্রথম কবে দেখেছি মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর মেয়ে নন্দিতা বা বুড়িকে তার খুব ছোটবেলা থেকে দেখেছি। সে গোখেল স্কুলে আমাব ছোট বোনের সহপাঠিনী ছিল। কেন যে সে শান্তি-নিকেতনে না পড়ে কলকাতায় পড়তে এল তা জানি না। নীতুকে একবার শান্তিনিকেতনে দেখলাম। আমরা মোটামুটি এক বয়সী। মনে আছে একদিন সারা দুপুর ধরে নীতু আমাকে ক্যারাম শেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। খেলাধূলায় কোনো দিনই আমার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নীতুকে খুব ভালো লেগেছিল, সুশ্রী চটপটে মিশুক ও মধুর স্বভাব। আমাদের কলকাতার বাড়িতেও ও একদিন এসেছিল—ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ শুনলাম ওর বাবা ওকে জার্মানী পাঠিয়েছেন। পরে জেনেছি সেটা ঠিক কথা নয়, কবিই ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছেন। কিছুদিন পরে শুনলাম সে জার্মানীতে খুব অসুস্থ, বাঁচে কি না বাঁচে। মীরাদি ইয়োরোপ যাবেন তাকে শেষ দেখা দেখতে। কবি ও মীরাদেবী কলকাতায় এসেছেন খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোয় গেলাম। শুনলাম পরের দিনই মীরাদেবী জাহাজে রওনা হবেন। ১৯৩৩ সাল, তখনও তো এরোপ্লেনে যাতায়াত শুরু হয়নি। কয়েকদিন থেকে নীতুর অসুখের বিবরণ শুনছিলাম। তখনকার দিনে যক্ষা একটা দুরারোগ্য রোগ। শুনেছিলাম সে Black forest বলে এক জায়গায় আছে। Black forest কথাটাই যেন মৃত্যুর অন্ধকারের মত মনে হয়েছিল। পরে সেখানে গিয়েছি, খুব সুন্দর দেশ) আমরা যে রকম ধারণায় অভ্যস্ত তাতে জোড়াসাঁকোয় যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল যে খুব বিষণ্ণ শোকাচ্ছন্ন বাড়িতে যাচ্ছি—যাওয়াও উচিত অথচ বাইরের লোকের উপস্থিতি ভালো কি মন্দ তা ভেবে দ্বিধাগ্রস্তও ছিলাম।

গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই গৃহের যন্ত্রণা পেতে হয়েছে—মৃত্যুশোক ছাড়াও মনোমালিন্য, বিবাদ বিসম্বাদ, আর্থিক অনটন ও নানা রকম দোষারোপে সংসার জীবন বার বার কণ্টকিত হয়েছে যা আমরা এখন অনেকটা জানি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে যে তাঁর উত্তরসূরীরা গজদন্ত মীনারের কবি বলে কেন মনে করেন তার কারণও আমি বুঝতে পারি। সমস্ত মালিন্যের মধ্যে থেকেও অমলিন থাকার শক্তিই সেই গজদন্ত মীনার। তিনি যন্ত্রণা পেতেন, তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ যন্ত্রণা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে উত্তরণ চলত। দুঃখ তাঁর অনুভূতিতে মিশে পরিবর্তিত, সে দাহ্যমান ধূপের উর্ধ্বগামী সুগন্ধ। 'শোকের বুদ্বুদ' 'অশোক সমুদ্রে' মিশে যেত। এই মেশার প্রক্রিয়াটা ঘটত অন্তরালে। অতি প্রত্যূষে যখন তিনি সূর্যাভিমুখী হয়ে বসতেন তখন তিনি যেন অপেক্ষা করে আছেন বিধাতার তূণে আরো কি কি বাণ আছে তার জন্য—সেই বাণগুলির সূচীমুখে তাঁর চেতনাকে আরো জাগ্রত, আরো প্রখর করে তোলে। ক্ষণকাল থেকে চিরকালে পৌঁছবার দুঃখ দহনই যেন একটি সেতু।

সেদিন তিনতলার ঘরে পৌঁছে দেখি লেখবার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কবি লিখে চলেছেন। আমি সেখানে না ঢুকে পাশের ঘরে মীরাদির সন্ধানে গেলাম। আমার মনে ধারণা ছিল আমি রোরুদ্যমানা মীরাদেবীকে শয্যালগ্ন দেখতে পাব। কিন্তু দেখলাম মাটিতে বিরাট একটি জায়গা জুড়ে পানের পাতা টুকরো টুকরো করে সাজানো, নানাবিধ মশলা দিয়ে শতাধিক পান সাজছেন, আর ধীরেন্দ্রমোহন সেন পাশে একটি চৌকিতে বসে গল্প করছেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও কোনো দিন পান স্পর্শ করেন নি, কিন্তু ঠাকুর বাড়িতে পান খাবার রেওয়াজ খুবই ছিল। অবনীন্দ্রনাথ মুখ ভর্তি করে পান খেতেন। রথীদার সৌখিন ছোট ছোট পানে কুচো কুচো করে দারুচিনির মশলা দিয়ে সাজা হোত। মীরাদি পান সাজছেন তার জাহাজের সঞ্চয়, তিনি হেসে হেসে কথা বলছেন—"মৈত্রেয়ী পান খাবে? তোমার তো দাদার পান খুব ভালো লাগে।"

আমি অবাক হয়ে এই অদ্ভুত বাড়ির অদ্ভুত মানুষদের দেখছি আর ভাবছি। মীরাদেবীর এই নির্লিপ্ততা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তা সাধনোচিত কোনো গুণও নয়। এটা ঔদাসীন্যের পর্যায়ে পড়ে। তবু রবীন্দ্রনাথের যে দুটি সন্তানকে আমি দেখেছি, তাঁরা দুজনেই পিতার গুণের সামান্য সামান্য অংশ পেয়েছিলেন। মীরাদেবী অসাধারণ সত্যবাদিনী ছিলেন। মিথ্যাবাক্য—মিথ্যা ব্যবহার তাঁর ধাতে ছিল না। সেজন্য অপ্রিয় কথা বলতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্য বলতেন অপ্রিয় বলতেন না। কদাচিৎ

অসহ্য হলে কাউকে রূঢ় কথা বললে তা পরিহাস রসে সিক্ত করে তার ধার কমিয়ে দিতেন। আবার অবিলম্বে ক্ষমাও চাইতেন।

Uttarayan
Santiniketan, Birbhum

কল্যাণীয়াসু

আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। শরৎকালটা এখানে মনোরম, তাই ছুটির সময়টা আশ্রমেই কাটাচ্ছি। বাতাস শিশির স্নিগ্ধ আকাশে নির্মল সোনার রঙের রৌদ্র, দিকে দিকে শিউলি ফুলের গন্ধ—মাঝখানে চুপচাপ বসে আছি।

তোমরা কি ছুটিতে কোথাও যাবে? তোমার শরীর কেমন আছে লেখনি কেন?

আমার শরীরে মনে কর্মের উৎসাহ নেই। তবু কাজ তো চলেছে একরকম। কলম যে বন্ধ আছে তাও নয়। যখন আমার শরীর মন পীড়িত থাকে তখনি আমার লেখা চলে দ্রুত বেগে—বাধার তাড়নায় স্পর্ধা বেড়েই যায়। ইতি ২৬ আশ্বিন ১৩৩৯

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীতুর মৃত্যুর অল্পদিন পরে লেখা এই চিঠি। এখানে 'বাধার তাড়না' অর্থাৎ নীতুর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। এবং এই কথাটি একটি অপরাজেয় চিত্তশক্তির খবর দিচ্ছে।

আমি দুবার রবীন্দ্রনাথকে শোকের সামনে স্তব্ধ হতে দেখেছি—সে স্তব্ধতা ঔদাসীন্য নয়। হয়ত গীতায় উল্লেখিত প্রজ্ঞাবান ধীমানের উক্তিও নয়—যে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধ—শোক যেন তাঁরই সঙ্গীত বাজিয়েছে। বিশ্বতানকে জীবন গানে মেলাবার চেষ্টা করেছেন তাই তাঁর দুঃখের গানগুলো এত প্রবলভাবে আমাদের নাড়া দেয়—আমরা শোকের আঘাত পেয়ে থাকি বা না থাকি তাঁর গানে সেই বজ্রের বাঁশি শুনতে পেয়ে আমাদের স্বার্থরুদ্ধ মন অনন্তের দিকে মুক্ত হয়ে যায়। নীতুর মৃত্যুর অল্প পরে লেখা 'বিশ্বশোক' কবিতায়—যা লিখেছেন সেই কথাই কনিষ্ঠপুত্র শমীর মৃত্যু সময়েও তাঁর মনে হয়েছিল—

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।

দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে
কালের বুকে
শাখা প্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবন স্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙা গড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহ তাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—
সব ধরণীর কান্নায় গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

'পুনশ্চ'

কিন্তু আমরা জানি সেই অকথিত উদ্দেশ্য কি। তা যে অনন্তের ধ্বনি নিয়ে ফিরে আসবে বহু মানুষের অশ্রুধারাকে মহাসমুদ্রে বইয়ে নেবার জন্য।

পরশ পাথর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

৬ই অগষ্টে বেলা তিনটের সময় কলকাতা পৌছব। ৪টের সময় সেনেট হলে জয়ডঙ্কা বাজবে। তারপরে ৭ই অগষ্টে আরো কিছু হাঙ্গামা আছে। ১২ আগষ্টে আত্মীয়ার বিবাহ। ১৩ অগষ্টে শান্তিনিকেতন অভিমুখে উল্টো রথ।

তোমার দরবারের কথা মনে রাখলুম। শেষ মুহূর্তে যদি না ভুলি তবে নালিশের কারণ থাকবে না। ইতি ২ অগস্ট ১৯৩২

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একজোড়া চটি জুতো চেয়েছিলুম আমার কাছে রাখবার জন্য।

ওঁ

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো সরস্বতী পূজার দিন এলো। তিনি বাণী নিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় আছি। বীণাপাণি এখানেই উপস্থিত আছেন। ইতি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২।

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan
Santiniketan, Birbhum

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মানুষের গভীর সান্ত্বনার উৎস যেখানে আছে তার সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় কথা কই, কিন্তু কথা কয়ে, লাভ নেই। সোনার খনি আছে, সেকথা জেনে দারিদ্র্য যায় না। নিজেকে নিজে যে জালে জড়াই তার থেকে মুক্তি নেই একথা ঠিক নয়, কিন্তু সে মুক্তি অনেক সাধনায় ঘটে। এই মুক্তি যদি আমি তোমার কাছে সুগম করতে পারতুম তাহলে খুব খুশি হতুম, কিন্তু কাজটা একেবারেই সহজ নয়। তাই দুঃখের ভিতর দিয়ে দুঃখকে উত্তীর্ণ হবে এই আশা করি : মরুভূমির তপ্ত রাস্তা দিয়েই যেতে হবে নইলে মরু পেরিয়ে যাবার আর কোনো উপায় নেই। এসব কথা এত ব্যর্থ যে বলতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু আর কোনো কথা বলবার নেই।

পারস্য যাত্রা এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। ১১ এপ্রেলে রওনা হব। যাবার দিনদশেক আগে কলকাতায় যাব। ইতি ২৫ মার্চ ১৯৩২

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েছি এমন কল্পনার কোনো কারণ নেই। মনে মনে বৃথা আত্মপীড়ন কোরো না। সংসারে সমূলক দুঃখ যথেষ্ট আছে। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি ও অত্যন্ত ক্লান্ত। বাজে কাজ একটার উপর আর একটা আমার কাঁধে চড়ে বসেছে ঠিক যেন আমাকে নিয়ে সার্কাস করচে। মন বলচে পালাই পালাই, প্রাণ হয়ত তার আগেই পালাবে। ইতি ২২ জানুয়ারী ১৯৩৩

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৩ সাল থেকে নামের আগে 'শ্রী' কাটা পড়ল।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মালব্যজি যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে কাল শুক্রবারে। আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। তারপরে ১লা বৈশাখে আমাদের নববর্ষের উৎসব আছে। তারপরে পুরীতে আমার একটা নিমন্ত্রণ আছে বটে কিন্তু সেটা বোধ করি বাদ যাবে। নড়াচড়া ভালো লাগে না। জোড়াসাঁকোয় শাপমোচনের রিহার্সাল নিয়ে থাকতে হয়েছিল তারপরে আর চলল না, অত্যন্ত লোকের ভিড়। এখানেও জন সমুদ্রের ঢেউ এসে পৌঁছয়। কতকটা মৃদুভাবে। যদি এমন কোনো তপস্বী থাকতেন যিনি তোমার মনকে তোমার নিজের কাছ থেকে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে যে শিখা তোমার অন্তরে জ্বলেছে তা সার্থক হোত। আমার সেরকম তপস্যা নেই। আমি নানা ভাবে নানা কাজে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত। আমি সব সময় ঠিক আপনাকে পাইনে— চিত্ত নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাহিরের নানা রূপ রসকে সংগ্রহ করতে করতে চলে; অন্তরের কেন্দ্রে যে চরম আত্মবোধ, তার সঙ্গে সচেতন যোগ রক্ষা সব সময়ে ঘটে ওঠে না। অথচ সে অভিজ্ঞতার স্পর্শও ক্ষণে ক্ষণে পাই, সেইখানেই আপনাকে সত্য করে নিত্য করে স্থির করে দেখা, নিখিল মানবের মধ্যে মুক্তভাবে। যখন নিজের অন্তরতর বোধের মধ্যে শান্ত নিরাসক্ত

আনন্দিত হয়ে সেই বিরাটে প্রতিষ্ঠিত হব তখন আমি তোমাদের ঠিক মতো আশ্রয় দিতে পারব। সেদিন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু এখন আমার সংস্রব তোমাদের বিক্ষুব্ধ করচে, তাতে আমি নিজেকে দোষ দিই। এখন আমি যে প্রভাব নিজের অজ্ঞাতসারেও বিকীর্ণ করি তাতে শান্তি নেই। আমার সংসর্গ থেকে এই যে ঢেউ ওঠে, অন্যকে আঘাত করে, তাতে আমি দুঃখ পাই, ভয় পাই, এবং অন্যের ভিতরকার আক্ষেপ থেকে বুঝতে পারি নিজের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিনি। এটাতে দুঃখ এবং চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন হচ্চে দেখে পরিতপ্ত হই। আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনে—মৃত্যুর আগে এই দায়িত্ব পালন করে যেতে পারব সেই আশা রাখি মনে। এর বেশি তোমাকে আজ আর কী বলব। ৬ এপ্রেল ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ

৫

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, আমি তোমাকে যে স্নেহ দিয়েছি সেইটেই মনে রেখো। মানুষ আপনাকে যেটুকু দিতে পারে তা দেশ কাল পাত্রে সীমাবদ্ধ, যা দিতে পারে না তার সীমা নেই। সেই অতল স্পর্শ না-এর দিকে সন্ধান করতে গেলে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই হাতে ঠেকে না। কিন্তু হাঁ কি একটুকুও নেই? তার মূল্যই কি সামান্য? সংসারে আমরা অনেক কিছু পাই কিন্তু পেয়েছি বলে অনুভব করিনে—সেই পাওয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাই বলে পাওয়াকে দেখিনে—এই পেয়ে না পাওয়াই তো আমার "পরশ পাথর" কবিতার বিষয়। তুমি যে বঞ্চিত হয়েছ একথা সত্য নয়, তোমার কল্পনা তোমাকে বঞ্চনা করচে। সামনে নববর্ষের উৎসব—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি। ১১ এপ্রেল ১৯৩৩

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ধৃত চারখানি চিঠি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা অবান্তর। এই চিঠিগুলি আমি পাই ৭নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। তখন আমার বয়স প্রায় উনিশ। শেষ পত্রখানির একটি লাইন "মানুষ আপনাকে যা দিতে পারে দেশকাল পাত্রে তা সীমাবদ্ধ" জীবনে বার বার স্মরণ করেছি। সবচেয়ে বড় দান আপনাকে দান কিন্তু সে যে কত কঠিন! এই দানের ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল অপরিমিত। বিশ্বের মানুষের শোকে দুঃখে প্রেমে

প্রতিজ্ঞায় তাঁর সত্তা কাব্যের ও গানের মধ্য দিয়ে আপনাকে দান করেছে। আর ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের অঞ্জলি তিনি পূর্ণ করেছেন তাঁর অস্তিত্বের অনির্বচনীয় সুধা দিয়ে। স্নেহে কোমল, করুণায় দ্রব, সমবেদনায় কাতর, এই শক্তিমান পুরুষ যার যেমন অঞ্জলি তা তেমনি করেই পূর্ণ করেছেন। আবার একথাও ঠিক যে মানুষ নিজের অনেকখানিই দিতে পারে না, সমাজ সংসার আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জনের যা দাবী তার সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত আছে তার আপন সত্তা যেখানে সে একা, সেখানে কার নাগাল পৌছবে? ভালোবাসার একটা সর্বগ্রাসী দাবী আছে সেখানেই বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। যাঁরা বিরাট মানুষ বহুদিকে যাঁদের চিত্ত প্রসার তাঁদের কতটুকু তাঁদেব পাশের আপনজনেরা পাবে? অনেক পাওয়াব মধ্যে না পাওয়ার কষ্টটা আমার তাই লেগেই থাকত।

দার্জিলিঙে

ওঁ

আমার পিতার কাছে লেখা এই চিঠি—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সপরিজনে বর্ষারম্ভ দিনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। এই সময়টা নানাদিক থেকে নানা ব্যস্ততা ও উদ্বেগের সময়, এখন স্থানত্যাগেন দুশ্চিন্তাং বর্জ্জন করা প্রার্থনীয় হলেও সাধনীয় নয়।

১২ বৈশাখে এখানে গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হবে। তার পরে আমার গতি কোথায় নিশ্চিত জানিনে। যদি দুঃসহ না হয় এইখানেই শান্ত হয়ে পড়ে থাকব। অবকাশ যাপনের অভিপ্রায়ে দূরে যাত্রার আয়োজনে অবকাশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়। কাছের থেকে পালাবার চেষ্টায় আমরা দূরে যাই—বস্তুত নিজের কাছ থেকে পালাবার এই দুরাশা।

রবিতাপ এড়াবার জন্যে কোথাও যাবার সংকল্প করেছ কি? রথীরা দার্জিলিঙে যাবেন। সেখানে যেতে আমার অভিরুচি নেই—কিন্তু কোনো তুঙ্গীগ্রহ যদি উত্তুঙ্গে টান দেন তবে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

পত্রখানা মৈত্রেয়ীকে দেখিয়ো। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩৪০

তোমাদের কবিসার্ব্বভৌম

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যা

কলকাতায় এসে তোমার চিঠিখানি পেলুম। আমি দার্জিলিং যাচ্ছি পর্শু। তোমাদেরও তো সেখানে যাবার কথা। দেখা হতে পারবে। কিছুদিন থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে—সামনে আবো দীর্ঘকাল দেখতে পাচ্ছি কাজের ভিড। আমি স্বভাবত কেজো মানুষ নই—অথচ কাজ পড়লে ফাঁকি দিতে পারিনে—চিরদিনই খাটতে হবে—কাজেব দাবী কেবলই বেড়েই চলেচে।

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ

দার্জিলিং যাবার পথে কলকাতায় এসে এই তারিখহীন চিঠিখানি লেখা। যতদূর মনে পড়ে কবি পর পব দুবার দার্জিলিং যান। ওঁরা থাকতেন গ্লেন ইডেন বাড়িতে। আমরা ছিলাম স্টুয়ার্ট লজে। আমাদের বাড়ি প্রায় দুমাইল দূবে ছিল তা সত্ত্বেও আমি প্রত্যহ হয় সকাল নয় বিকালে গ্লেন ইডেনে যেতাম। এই দুমাস খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রতিমাদেবী ও রথীন্দ্রনাথকেও দেখবার সুযোগ পেলাম। রথীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট কুটরীকে খুব সুন্দর করে কাঠের প্যানেলিং কবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন—এইখানে তিনি চামড়ার কাজ করতেন। ২।১ বছব আগে বিলাতে বেড়াবার সময় মিলান থেকে রথীন্দ্রনাথ চামড়ার কাজ শিখে এসেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি নিপুণভাবে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী ও তাতে বং করার কাজে একাগ্রভাবে লেগে থাকতেন। অনেকে হয়ত জানেন না যে ভারতবর্ষে সৌখীন চামড়ার শিল্প বথীন্দ্রনাথই প্রচলন করেন—তার আগে এ বিদ্যার চর্চা ছিল না। দার্জিলিঙে থাকা কালে আমিও প্রত্যহ তাঁব কাছে এ বিদ্যায় হাত পাকাই।

সকালবেলা গ্লেন ইডেনের বাড়িতে এসে পৌছতাম। আমি কবির হাতের কাছে উপস্থিত থাকলে প্রতিমাদি নিশ্চিন্ত মনে জাপানী বাঁশের ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাজার করতে চলে যেতেন। কোনো দিন বা রথীদা প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং আমার ওভারকোটটি তিনি বইতেন—এসব বিলিতি দস্তুরে রথীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম পাঠ নিচ্ছিলাম। আমরা অনেক সময়ে ক্যালকাটা রোড দিয়ে হাঁটতে বেরুতাম। সে সময়ে কলকাতার এলিট সমাজ ও সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মীরা সব গরমের সময় দার্জিলিং পৌছতেন। তাই দার্জিলিঙে আমরা পরিচিত মুখগুলিই

দেখতে পেতাম। রথীন্দ্রনাথ ক্যালকাটা রোড পছন্দ করতেন কারণ রাস্তাটি নির্জন। দূর থেকে একদল স্বাস্থ্যান্বেষী দেখলে বলতেন, ঐ রে আবার আসছে ব্রাহ্মসমাজের দল—আমার ভারি আশ্চর্য লাগত কারণ আমি তো ওঁদেরও ব্রাহ্ম বলেই জানতাম। তবে অবশ্য আমার দিদিমা বলতেন, আদি সমাজের ব্রাহ্মদের কেউ ব্রাহ্ম বলে মনে করে না। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, রথীদা তখন ব্রাহ্ম বলতে 'সঙ্কীর্ণতা' বোঝাতে চাইছিলেন। এই কার্ট রোডে একটা বেঞ্চিতে বসে একদিন রথীদা হেসে বললেন, এইখানে বভ্রাওনের রাজকুমারীর সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন ক্যালকাটা রোড সেদিনও বোধহয় এই রকম ছিল—গল্পগুচ্ছের এই গল্পটি আমাদের কাছে একটি সুন্দর প্রেমের গল্প বলেই তখন মনে হত, এর ভিতরের তাৎপর্য তত লক্ষ্য হত না। আমি যে পরস্থ দার্শনিক তত্ত্বের রস পেতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম ততখানি সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা আমার স্পষ্ট ছিল না। এসব বিষয় আলোচনাও হত না। সেদিন রথীন্দ্রনাথই আমায় একথা বলেছিলেন যে, বাবার বেশির ভাগ লেখার মধ্যেই এই মূল কথাটি তুমি পাবে যে আচার প্রথা সংস্কার নিয়ম বাইরের জিনিস—তার হয়ত দাম আছে, সেটা আপেক্ষিক—আসল মানুষটি এই সব দিয়ে বন্দী হয়ে থাকে—তাকে মুক্ত করে দেওয়াই বাবার লেখার কাজ। আমার মনে পড়ল খেয়ার কবিতা—

> তাই গড়েছি রজনীদিন
>
> লোহার শিকলখানা—
>
> কত আগুন কত আঘাত
>
> নাইকো তার ঠিকানা।
>
> গড়া যখন শেষ হয়েছে
>
> কঠিন সুকঠোর,
>
> দেখি আমার বন্দী করে
>
> আমারই এই ডোর।

আমি বললাম, রথীদা রাজর্ষি ও গোরাতেও একথা পাব। রথীদা বললেন, সব লেখাতেই পাবে। Religion of man-এ তো বটেই। আমি এতদিন আমার হৃদয় মন দিয়ে যে সত্যটি অনুভব করেছি তত্ত্ব বা মত হিসাবে সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। এক মুহূর্তে যেন কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে গিয়ে একটি জ্যোতির্ময় সত্তাকে দেখতে পেলাম।

এই সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন চলেছে। মেয়েরাও পিস্তল

হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে হরিজন আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। গান্ধীজির চরকা আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়নি, কিন্তু হরিজন আন্দোলনে তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। চণ্ডালিকা ঐ সময়ে লেখা হয় ও নৃত্যনাট্য অভিনয় হতে থাকে—হরিজন আন্দোলনকে এই নৃত্যনাট্য অনেকখানি শক্তি জুগিয়েছিল, তার সঙ্গে পুনশ্চর কবিতাগুলো তো ছিলই। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন—"আমি ব্রাত্য"। হরিজন আন্দোলনেই কোনো ত্রুটির জন্য গান্ধীজি যখন অনশন সুরু করেন ও দিনের পর দিন তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে তখন দেখেছি রবীন্দ্রনাথের গভীর উৎকণ্ঠা। দার্জিলিং থেকে প্রথম একটি টেলিগ্রাম পাঠান। তারপর দুতিন দিন ধরে ক্রমাগত চিন্তা করছেন আর লিখছেন। এইভাবে গান্ধীজিকে একটা চিঠি লিখলেন, তার খসড়াটি এখানে তুলে দিচ্ছি। এত কাটাকুটি করেছেন যে বোঝা যায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। কী ভাষায় কী কথা বলে তিনি এই দৃঢ়সংকল্প মানুষটিকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করবেন।

Evidently the telegram which I sent you some days ago has failed to reach you though it has appeared in some papers. You must not blame me if I cannot feel complete agreement with you at the immense responsibility you incur by the step you have taken, I have not before me the entire background of thoughts and facts against which must be placed your own judgement in order to fully understand its significance.

From the very beginning of creation things which are ugly and wrong the negative factors of existence, and the ideal which is positive and eternal even waits to be represented by messengers of truth who never have the right to leave the field of their work in disgust or despair because of its impurities and imperfections.

It is a presumption in my part to remind you that when Lord Buddha woke up to the miseries from which the world suffers strenuously he went on searching the path of salvation till the last day of his early career.

Death when it is physically or morally inevitable has to be endured but we have not the liberty to court it unless there is absolutely no other alternative for the expression of the ultimate purpose of life itself.

We must have the full number of days allotted to us as

is enjoined by the Upanishad in order to fulfil our obligation to the universe of life a part of which is our own existence.

It is not absolutely unlikely that you are mistaken about the imperative necessity of your present Vow and when we realise there is the risk of its fatal termination we shudder at the possibility of the tremendous mistake never having opportunity to be rectified. I cannot help beseeching you not to offer such an ultimatum of mortification to god for his scheme of things almost refuse the great gift of life with all its opportunities to hold up till its last moment the ideal of perfection which justifies humanity.

However I must confess that I have not the vision which you have before your mind nor can I fully realise the call which has come only to you and therefore whatever may happen I shall try to believe that you are right in your resolve and that my misgivings may be the outcome of a timidity of ignorance.

বাঁশরী

দার্জিলিঙে এইবার কয়েকটি মনে রাখবার মত ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাঁশরী ও মালঞ্চ পাঠ। 'গ্রেন ইডেনের' বসবার ঘরে দার্জিলিং প্রবাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষী এলিটদের নিমন্ত্রণ করে কবি মালঞ্চ ও বাঁশরী দুটি গল্প শোনালেন। সত্যি বলতে কি মালঞ্চ বোঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, আমি কবিকে বললাম, 'আপনার মালঞ্চ আমার ভালো লাগল না।' 'কি দোষ হয়েছে বল?' 'সরলার ও আদিত্যের ব্যবহার একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। আপনি যেন তাদের সমর্থন করছেন। অন্যের স্বামীকে ভালোবাসা খুব গর্হিত কাজ।'

এই বালসুলভ সমালোচনায় কবি কিন্তু অসহিষ্ণু হন নি বরং আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাহিত্য বিচারের প্রকৃতি কি রকম। কতগুলি নির্দিষ্ট আদর্শের ছাপে মানব চরিত্র তৈরী হয় না। মালঞ্চের শেষ অঙ্কে নীরজার নাটকীয় উক্তি—সর্ব আভরণশূন্য আদিম মানব প্রকৃতির উদ্ঘাটনের দৃশ্য সেদিন যেরকম জোরের সঙ্গে পড়েছিলেন তা আজও কানে বাজে। কিন্তু আমি এই বই ঠিক গ্রহণ করতে পারলাম না। আমি এই সময় জেদী তার্কিক ও এক-

গুঁয়ে হয়ে উঠেছিলাম। যা আমার পছন্দ নয় তা নিয়ে তর্ক না করে আমার শান্তি হত না। আমি বলতেই লাগলাম 'লেখকের পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছে, তা কেন যাবে?'

এরপরে 'বাঁশরী' যার নামকরণ হয়েছিল 'ভালোবাসার নিলাম' এবং 'ললাটের লিখন' তার অনেকখানিই দার্জিলিঙে লেখা হয়। আমি সেই প্রথম সুযোগ পেলাম তাঁর লেখা কপি করবার। দু তিনদিন অন্তর আমি একখানা করে খাতা নিয়ে যেতাম ও প্রতি খাতা দু খানা করে কপি করতাম। একটা প্রেসে যাবে একটা লেখকের কাছে থাকবে। কারণ মূল পাণ্ডুলিপিটা আমি আত্মসাৎ করব। কপিগুলি দেখতে দেখতে একদিন খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পায়ে ব্যথা-ট্যাথা নেই তো?' আমি সরলভাবে এরকম প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। উনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'আর কিছু না, বার বার প্রেসে গিয়ে পড়ে দিয়ে আসতে হতে পারে।' যা হোক বাঁশরী কপি করে দিলাম ও তাঁর পাণ্ডুলিপি অনেকগুলো নীল রঙের খাতা আমাকে স্বহস্তে লিখে দান করলেন।

বাঁশরী দু দিন ধরে পড়া হয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র মহাশয়, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা দেবী ও ডাঃ অজিত বোসের স্ত্রী মায়া দেবীর কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। গ্লেন ইডেন থেকে আমরা দল বেঁধে কাঞ্চনজঙ্ঘা রোড দিয়ে ফিরছিলাম—অনেকেই আলোচনা করছিলেন যে, বাঁশরীতে কবি ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে খুব খোঁচা দিয়েছেন। কেউ বা বলছিলেন খোঁচাটা আধুনিক লেখকদের প্রতি, তারা যে জগৎটা চেনে না বানিয়ে বানিয়ে তাদের সম্বন্ধেই লেখে। কিন্তু বাঁশরীর আসল ঝোঁকটা আমার মনে হচ্ছিল অন্য—প্রেমের জন্য নয় কর্তব্যের জন্য সোমশঙ্করের বিয়ে দিলেন সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী—সমস্ত বিয়েটাই যেন সন্ন্যাসগ্রহণ। এর সঙ্গে গান্ধীজি তখন যে আধ্যাত্মিক বিবাহের পরিকল্পনা করেছিলেন আমার মনে হল যেন তারই ইঙ্গিত রয়েছে। সে সময় গান্ধীজির সমস্ত কার্যকলাপ ভাবনাচিন্তা খুব বেশী আমাদের মন অধিকার করেছিল। তিনি তো শুধু ইংরেজ তাড়ানোর মতলব আঁটছিলেন না আরো অনেক নূতন নূতন ভাবনা চিন্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল—তিনি মেম-সাহেবকে দিয়ে খাটা-পায়খানা পরিষ্কার করাবেন, চাঁড়ালকে মন্দিরে ঢোকাবেন, কামশূন্য বিবাহ দেবেন—এসব অদ্ভুত কথা কে কবে ভেবেছিলেন? তার মধ্যে খিলাফৎ ও হরিজন আন্দোলনই দেশের মানুষকে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়েছিল। অনেক জ্ঞানীগুণীর মুখেই শুনেছি—

খলিফাকে তার নিজের দেশের মানুষ তাড়াল, এখন উনি খিলাফৎ খিলাফৎ করে মুসলমানদের মাথায় তুলছেন! এখন আবার হরিজন আন্দোলন করে খামখা আর একটা সমস্যা সৃষ্টি করবেন। মাথায় তোলাই বটে! যারা খিলাফৎ আন্দোলন দেখেছেন তাঁরাই জানেন সে কি উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন—আমি ঠিক মনে করতে পারি না হয়ত গান্ধীজি একবার চাটগাঁয় এসেছিলেন কিংবা আলি ভাইদের একজন, আমাদের রহমৎগঞ্জের ব্রাহ্মসমাজ ও টাউন হলের মাঝখানের মাঠটি শত শত লাল ফেজের রঙে রঙীন হয়েছিল এবং মিলিত কণ্ঠের বন্দেমাতরম ও আল্লাহো আকবর ধ্বনি চট্টগ্রামকে মাতাল করে তুলেছিল।

বাঁশরীর কথায় বলছিলাম নিষ্কাম বিবাহের যে কাহিনী এখানে লেখা হয়েছে সম্ভবত সেটা আধ্যাত্মিক বিবাহের প্রতিধ্বনি—এত কথা তখন স্পষ্ট করে ভেবেছি কিনা মনে নেই। কিন্তু বাঁশরী কপি করতে করতে নানা চিন্তা আমার মনে ওঠা নামা করেছে তার যতটুকু মনে করতে পারছি এখানে লিখলাম। এই গল্পটা আমার মনে হচ্ছিল রূপাত্মক বা allegorical—রক্তকরবীর মতই এর ভিতরে যেন অন্য কোনো কথা বলি বলি করে বলা হচ্ছে না। এই গল্পটার ভিতরের কথা কি—এর পাত্রপাত্রী কে? পুরন্দর কে? পুরন্দর কি মহাত্মা গান্ধী? "যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে তাদের মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি তার যা প্রাপ্য তাকে দিতেই হবে।"

এই ব্রত কি দেশোদ্ধার? ধর্ম সাধনা? গান্ধীজীর কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেককেই সুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মোটা কাপড় পরে মোটা খেয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন, কোটিপতি মানুষরা নাকি ছাগল চরাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেন না, দেন কি? পুরন্দরের বক্তব্য "ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ।" একথাটা খুবই দুর্বোধ্য লেগেছিল—নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে আমি এতদিনে কিছুটা ওয়াকিবহাল কিন্তু এখানে তো সে কথা হচ্ছে না। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বা কামনা থাকবে না। পুরন্দর পৃথক করছেন প্রেম ও ভালবাসাকে, তাঁর মত "ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে—প্রেমের মিলনে মোহ নেই।"

আজ এতদিন পরে সেদিনকার ভাবনাগুলো অস্পষ্টভাবে মনে আসছে, আর মনে হচ্ছে যেন এই কথাটারই পরীক্ষা গান্ধীজি তাঁর শেষ জীবনে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন বাঁশরীর যে লাইনটি আমায় সবচেয়ে বিচলিত করেছিল তা সোমশঙ্করের বক্তব্য। সোমশঙ্কর পুরন্দরকে বলছে—"এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মত ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ।"

কয়েকদিন আগেই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে আমি তাঁর একটি চিঠি পেয়েছিলাম তাতে লিখেছিলেন: "যদি এমন কোনো তপস্বী থাকতেন যিনি তোমার মনকে তোমার নিজের কাছ থেকে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে যে শিখা তোমার অন্তরে জ্বলেছে তা সার্থক হোতো—আমার সেরকম তপস্যা নেই।"

একথার অর্থ কি? মাত্র দু মাস আগে লেখা আমার চিঠির বাক্য এ বইতে কেন? কি করতে হবে আমাকে? ব্রত কোথায় পাই? কোনো মহৎ সংকল্প আমার মনে আসছে না। আমি যাদের ভালোবাসি তাদের খুব কাছে পেতে চাই, সেটা কি দুষ্য? কবির কি তাই মত? না এটা একটা খেয়ালী গল্প! বাঁশরী কপি করতে করতে আমি ভাবতাম কবিকে বলব গল্পটা একেবারে ঝাপসা অস্পষ্ট—আপনি গল্পগুচ্ছের মত স্পষ্ট গল্প আর লেখেন না কেন? কিন্তু বলি নি। একবার 'মালঞ্চ' নিয়ে তর্ক করেছি আবার বাঁশরী নিয়ে অভিযোগ করলে মনে দুঃখ দেওয়া হবে।

বাঁশরী যেদিন পড়া হয় সেই সন্ধ্যার একটি ঘটনা আমার স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমি অনেকবার লিখেছি রবীন্দ্রনাথ কারু কোনো অসুস্থতা বা কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। সেদিন আমার প্রচণ্ড কাশি হয়েছিল। বসবার ঘরে বিশিষ্ট লোকেরা বসে আছেন আর রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন, পড়া তো নয় পুরো নাটকটাই জীবন্ত হয়ে উঠছে আর গানগুলো গেয়ে গেয়ে পড়াটা আরো রসিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন ওঁর গলায় 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' ও 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার' গান দুটি ছিল বড়ো মনোহরণ। এর মধ্যে বসে একজন অর্বাচীন মেয়ে খক খক করে কাশবে এর চেয়ে শ্রুতিকটু আর কি হতে পারে? আমি তাই বসবার ঘরের ঈষৎ বাইরে ওঁর শোবার ঘরের প্রান্তে দরজার একটু আড়ালে বসে শুনছিলাম এবং মুখে কাপড় গুঁজে খুক খুক করে কাশছিলাম। কিন্তু এক রকম অসভ্য কাশি আছে যে তাকে কিছুতেই শাসন করা যায় না। ধমকে ধমকে সেইরকম অদম্য কাশি যখন কিছুতেই বাধা মানছিল না তখন এক দৌড়ে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে এক দমকা কেশে নিয়ে বেরিয়ে আসছি, দরজা খুলেই দেখি রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন—দু একটা প্রশ্ন করে তিনি টেবিলের উপর থেকে বায়োকেমিক ওষুধের শিশিটা নিয়ে আমার হাতে কয়েকটি বড়ি দিয়ে

বললেন কাশি এলেই মুখে দিও এখুনি কমে যাবে। চেয়ারের উপর থেকে একটা গরম চাদর দিয়ে বললেন, এইটে মাথায় গলায় জড়িয়ে বোসো—এই সহানুভূতি ও করুণায় আমার ভিতরটা যেন গলে গিয়ে চোখে জল এল। আমি বাঁশরীর কাব্যসুধা কানে শুনতে থাকলেও আমার মনের ভিতরে ভিতরে যে সুধার প্রবাহ বইতে লাগল তার স্বাদ অন্য। আমার মা বাবাও পড়ার ঘরে ছিলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম কবি পড়তে পড়তে হঠাৎ খাতাটা উল্টে রেখে পাশের ঘরে চলে যান, কী কারণে তিনি উঠে যান তা কেউই বুঝতে পারে নি। আমার কাছে শুনে মা বাবা দুজনেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

কবি বলেন বটে কর্মভারে তিনি পীড়িত চিঠি লিখতেও তাঁর কলম সরে না কিন্তু কাজ না করে তাঁর চলে কই? এসেছেন দার্জিলিঙে বিশ্রাম করুন, তা হবার নয়—লেখা, ছবি আঁকা, পাঠ সব তো চলছেই তার সঙ্গে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের আয়োজন সুরু হল। এইবার কবির বাহাত্তর বছর পূর্ণ হল—একদিন বললেন 'আমায় বায়াত্তুরে ধরেছে।' কিন্তু ব্যবহারে তার কোনো লক্ষণ নেই। দার্জিলিঙে কলকাতার জ্ঞানীগুণী উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক জনই বেশি। যাদের ইঙ্গবঙ্গ বলা হত তারাও ব্রাহ্ম সমাজেরই। যা হোক এদের মধ্যে গাইয়ে খোঁজা হল—নাচিয়েও একজন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী হাতি সিং পরে যিনি শ্রীমতী ঠাকুর হন। তিনি ও তাঁর মা জলা পাহাড়ের গায়ে গ্লেন ইডেনের উপরেই একটি প্রাসাদোপম বাড়ি ভাড়া করেছিলেন—বাড়িটি লতায় সাজানো, সঙ্গে একটি 'এনেক্সি' সম্পূর্ণ কাঁচের। তাঁদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন এই অতিথিশালায় ছিলেন। গ্লেন ইডেন বাড়ির থেকে এই বাড়ি উঁচুতে, দৃশ্য আরো প্রশস্ত; তাছাড়া বাড়ি বদলে খুশী হতেন কবি—একটানা এক ঘরে থাকতে ভালোবাসতেন না। এই বাড়িতে একলা থাকা সকলেই অপছন্দ করতেন। আমিও তাই নিয়ে অনুযোগ করতাম তাই আমায় ঠকাবার জন্যে মধ্যরাত্রে স্বদেশী ডাকাতের আবির্ভাবের কাহিনী খুব প্রত্যয়জনক ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগসাজসে বনমালী একটি খালি হাণ্টলী পামারের বিস্কুটের টিন দেখিয়ে বলে ঐ টিনের সমস্ত বিস্কুট সেই রাত্রির অতিথি ভক্ষণ করেছে। এই কাহিনী 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি। যাহোক শ্রীমতী দেবী জিমখানা ক্লাবে নাচবেন, গানের লোকও কিছু জুটে গেল। রোজ বিকালে রিহার্সেল চলতে লাগল।

এই সময়ে একটি অপরিচিত মেয়ে কবিকে গান গেয়ে শোনাতে এলেন এক দিন সকালবেলায়। তাঁর গানের ধরন ধারণ রীতি পদ্ধতি একেবারে অন্য—তার

উপরে হারমোনিয়াম নৈলে তাঁর চলে না। কবি তো হারমোনিয়াম দু চক্ষে দেখতে পারেন না। পরবর্তীকালে All India Radio থেকে তিনি হারমোনিয়াম তাড়ান। এখন তাঁর ভক্ত ও মূল্যবান গায়ক গায়িকারা দেখছি হারমোনিয়াম আবার চালিয়ে দিল। কবি বলতেন, হারমোনিয়াম গলাকে নষ্ট করে দেয় সূক্ষ্ম সুরগুলো গলায় আসে না। এটাই স্টিম রোলার। মেয়েটি গান শোনাতে লাগল। প্রতিমাদেবী জাপানী ছাতাটি মাথায় দিয়ে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। আমিও একটু পরে অধৈর্য হয়ে বাড়ি চলে গেলাম। এই নিয়ে আমাদের দুজনকেই অনেকদিন পর্যন্ত পরিহাস মিশ্রিত গঞ্জনা সইতে হয়েছে। যে মেয়েটি গান গাইছিলেন তিনি গান জানেন বটে তবে একেবারেই এঁদের সঙ্গে মিলবে না তাই কবি তাঁকে নৃত্যানুষ্ঠানে না নিয়ে একক গাইতে দিলেন এবং হারমোনিয়াম বাজিয়েই গাইলেন তিনি। কাউকে কোনো রকমে বঞ্চিত করা বা উৎপীড়িত করা তাঁর সম্ভব ছিল না। কেউ তাঁর ব্যবহারে ঈষৎ কষ্ট পেয়েছে মনে হলে নিজেই এত কষ্ট পেতেন যে অনেক কিছুই মেনে নিতেন।

সেদিন শ্রীমতী দেবীর নাচ স্টেজ জুড়ে 'ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে' বড়ই সুন্দর লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে নাচও অভিনব। কী কারণে মা বাবা এই অনুষ্ঠানে যান নি আজ মনে পড়ে না। উৎসব ভঙ্গ হল রাত করে। অন্ধকারে দলে দলে লোক চলেছে, আমি পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গ ধরলাম। তিনি আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই যাবেন। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনলাম "মৈত্রেয়ী"—দেখি রবীন্দ্রনাথ একটি রিক্‌শতে আসছেন, কাছে যেতে বললেন, পিছনে রথী আসছে সে তোমাকে পৌঁছে দেবে। পরে শুনেছিলাম ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে নানারকম গুজব প্রচলিত ছিল, কবি সেগুলো ঠিক বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না কিন্তু তাঁর এই সস্নেহ সাবধানতা আমার বড় ভালো লেগেছিল।

অনেক দ্বিধা সংকোচে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। যেহেতু আমি সত্য ভাষণের দায়িত্ব নিয়েছি এবং অপ্রিয় সত্যও বলে থাকি তাই এই কাহিনীর অবতারণা। কোনো মানুষ জীবনের কোনো এক ক্ষেত্রে খুব বড় হয়ে উঠলে আমরা প্রত্যাশা করি তিনি যেন সব দিকেই সমান বিস্তার লাভ করবেন—এ ধারণা ভুল এবং এ ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার দরুণ অনেক সময়ই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয় না এবং আশা করার ফলে আশাভঙ্গের দুঃখ পাই।

দার্জিলিঙে জলাপাহাড়ের এক সুউচ্চ শিখরে 'মায়াপুরী'—জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যনিবাস ও গবেষণা কেন্দ্র। এই সময়ে তিনিও দার্জিলিং এসেছিলেন এবং একদিন বড় রকমের একটা পার্টি দিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে আমরাও গিয়েছিলাম। একটি বার তের বছরের ছোট মেয়ের অটোগ্রাফ সংগ্রহের সখ ছিল—তার অটোগ্রাফ বইতে অনেক প্রসিদ্ধ মানুষের সই তখনই সংগৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথের একটা হাতে আঁকা ছবিও সে সংগ্রহ করেছে। সে তার অটোগ্রাফের খাতাটি জগদীশচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিলো, আমায় একটা সই দেবেন? জগদীশচন্দ্র দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, হয়ত কোনো কারণে তাঁর মেজাজ খারাপ ছিল, তিনি বললেন, একি জন্তুর খাবা যে যেখানে সেখানে পড়বে? আমি ছেলে ছোকরাকে সই দিই না, যারা গবেষণা করেছে কাজকর্ম করেছে তাদের দিই। লেডি বসু অবশ্য খুব বিরক্ত হলেন এবং স্বামীকে একটু তিরস্কার করলেন। তিনি খাতাখানা রেখে দিলেন এবং পরে সই করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই আমি এই ঘটনার উল্লেখ করছি। আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর অতুলনীয় কর্মের জন্য। বেতারের আবিষ্কর্তা হিসাবে জগতের কাছে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান নি, সেজন্য আমরা ভারতীয় হিসাবে ক্ষুণ্ণ কিন্তু একথাও ঠিক যে প্রতিভাশালীদের জীবন এবং ব্যবহারও যে তাঁদের কর্মের সঙ্গে সমান উচ্চস্তরের হবে তা আশা করা যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতুলনীয় বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনে কপট আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "ঠিক হয়েছে এই রকম হলে তোমরা জব্দ হও আর আমার উপর তো তোমাদের ..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা লিখছি, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রগাঢ় সৌহার্দ্য শেষ পর্যন্ত তেমন অটুট ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অভিমান ছিল জগদীশচন্দ্র শান্তিনিকেতনের প্রতি তেমন সহানুভূতিসম্পন্ন নন।

সেবার দার্জিলিঙে দুমাসে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয় বন্ধন জন্মাল। এতদিন প্রতিমাদিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানলেও রথীদা একটু দূরের মানুষ ছিলেন, ঐ সময় থেকে তিনি আমার দাদা হলেন। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকের অনেক সময় বিরোধ হয়েছে কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংযোগে তিনি শেষ পর্যন্ত আমার দাদাই ছিলেন। শেষের দিকে আমি হয়ত মুখ ফিরিয়েছি তিনি ফেরান নি।

কল্যাণীয়াসু

তোমার জন্মদিনে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কিছু কাল থেকে অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। অবকাশ মাত্রই ছিলনা—এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইনি। দুর্গতির ছায়া আজ সমস্ত পৃথিবীর উপরে পড়েচে—বাংলাদেশের তো কথাই নেই। সর্বদা মন পীড়িত হয়ে থাকে—প্রতিকার করতে পারে এমনতব মহাশক্তি কার আছে? কোনো এক যুগে মানুষের এত দুঃখ ঘটেছিল বলে জানি নে। মনে একটা মাত্র আশা হয় যে এমন সর্ব্বব্যাপী বেদনায় হয়তো একটা নতুন মহাযুগের আবির্ভাব সূচনা করচে। পুরাতন সম্বন্ধ সূত্রগুলো ছিঁড়চে, ভিত্তি যাচ্ছে বিদীর্ণ হয়ে। ভেঙে পড়া জীর্ণতার ধূলোয় আকাশ আচ্ছন্ন। সামনের পথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে।

তুমি কি কাজ করতে পারো সে পরামর্শ হঠাৎ দেওয়া আমার সাধ্য নয়—আমার মনে হয় আপাতত নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের ইতিহাসটা আলোচনা করো যদি কাজে লাগতে পারে—অন্তত কালের একটা perspective হয়তো খুঁজে পাবে। সমগ্রকে সম্যকরূপে জানতে পারলে অনেক সময়ে খণ্ড কালের বর্ত্তমান বেদনার উপরে মনকে তোলা যায়। সত্যকে জানবার সাধনায় অনুভূতির উদ্‌ভ্রান্তিকে সংযত করা যায়। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সহায় করে যারা কেবল আবেগের তাড়নায় কর্ত্তব্য করতে ছোটে তারা কাজকে নষ্ট করে নিজেকেও।

ইতি ৩১ অগষ্ট ১৯৩৩

সেপ্টেম্বরের ২য় সপ্তাহে কলকাতায় যাব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময়ে বাংলাদেশে অগ্নিযুগের অগ্নিকাণ্ড চলেছে প্রবলভাবে। আন্দামানে বন্দীরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে—দেশ জুড়ে প্রতিদিনই একটা না একটা ব্যাপার চলেছে—প্রতি ঘটনাতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উদ্বেগ রয়েছে। হিজলীর ব্যাপার আগেই ঘটে গেছে—তাঁর সে সম্বন্ধে চিঠি ওয়াটসন সাহেব প্রকাশ করতে দেন নি—একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু যতই উত্তেজনার কারণ থাকুক চিরদিনই তাঁর বিশ্বাস যে দেশের হিতসাধনের সাধু সংকল্পটাই যথেষ্ট নয়। তার জন্য সাধনা চিন্তা ও প্রস্তুতি চাই। প্রায়ই বলতেন হিতসাধনের উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করে দম ফুরিয়ে গেলে আর গন্তব্য

স্থানে পৌছন যাবে না। রবীন্দ্রনাথ কোনো মতেই গুপ্তহত্যা অনুমোদন করতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য 'রাজা প্রজাতে' ও নানা প্রবন্ধে আছে। কোনো দিনই এ মত তিনি পরিবর্তন করেন নি কিন্তু যখন দেখতেন তাঁরই কবিতা মুখে নিয়ে তাঁরই গান গাইতে গাইতে ছুটেছে কত তরুণ প্রাণ পূর্ণ আত্মবিসর্জনের দিকে, তখন তাঁর কী যন্ত্রণা কী দ্বন্দ্ব হত তা আমরা জানি। 'প্রশ্ন' কবিতায় সেই যন্ত্রণা রূপ নিয়েছে। বর্তমান কালের স্বার্থ-ক্লিন্ন কপট দেশ হিতৈষণা যখন দেখি তখন বুঝতে পারি ত্যাগের কতদূর প্রকাশ এই দেশে ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে একটি চিঠি পেয়েছিলাম সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি। আমার 'অচেনা চীন' বইতে দীনেশ গুপ্তর নাম ভুল করে দীনেশ দাস বলে উল্লেখ করেছিলাম। আমার তথ্যেও কিছু ভুল ছিল। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষ সেই ভুল সংশোধন করে ও নতুন কিছু তথ্য দিয়ে আমায় একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি এখানে উদ্ধৃত করবার অর্থ যে রবীন্দ্রনাথের বাণী কিভাবে এঁদের জীবন তন্ত্রীতে সুর বাজিয়েছিল তা বোঝা যাবে। তাই এঁরা যা করছিলেন তার দায়িত্ব কিছুটা কবির উপর বর্তায় বলেই আমার ধারণা। "...দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই। ঠিক তার ২০ দিন পরই দীনেশ গুপ্তর দণ্ডদাতা জজ সাহেব গালিককে আলিপুরে তাঁর এজলাসের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করা হয়। কাজটি সমাধা করেই কানাই ভট্টাচার্য পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। শহীদের পকেটে ছিল একটি চিরকুট। তাতে লেখা ছিল 'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও। ইতি—বিমল দাশগুপ্ত।' বিমল দাশগুপ্ত তখন পেডি মার্ডার কেসের পলাতক আসামী। নিজের নাম মুছে ফেলেও বিমল দাশগুপ্তকে মুক্ত করে দেবার কি অদ্ভুত প্রয়াস। বিমল মারা গেছে পুলিশের এই ধারণা হলে বিমল নিশ্চিন্তে আরও কাজ করতে পারে শুধু এই কামনা। (কানাই ভট্টাচার্যের সত্যিকারের পরিচয় অনেক পরে জানা গিয়েছিল।...দীনেশ গুপ্ত ২.২.৩১ থেকে ৭.৭.৩১ (ফাঁসির দিন) পর্যন্ত এই পাঁচ মাসের পরিসরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে তাঁর পরিজনদের যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার চৌদ্দখানা মাসিক 'বেণু'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ১৪ খানা চিঠির মধ্যে দুখানা ছিল মণিদির নামে। দীনেশ গুপ্ত তাঁর কোনো বৌদিকেই মণিদি ডাকতেন নাকি মণিদি তাঁর কোনো বোন হতেন আমার ঠিক জানা নেই। তবে এই মণিদির কাছেই (যিনি সম্ভবত আপনার সেই মাসি) তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিটি লেখা হয়েছিল। আপনার অবগতির জন্য

চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি। শুধু মনে রাখবেন যে ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের একটি ১৯ বছরের ছেলে তার condemned cell-এ বসে এ চিঠি লিখছে—

দীনেশ গুপ্তর চিঠি—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
৩. ৭. ৩১

মণিদি,

ভগবানের আশিষ যারা পায়, অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কতজনের হয় জানি না তবে যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন তার সুখ সম্পদ সবকিছু দেন ধূলায় লুটিয়ে করেন তাকে পথের ভিখিরী, রিক্ত কাঙ্গাল, সে মালা কি সহজ?

"এ তো মালা নয় গো
এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারি
এ তো তোমার তরবারি।"

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে। কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই। কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিত ভাবে দান করেন তিনিই। (তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি) নৈলে সাধ্য কি তার সে গুরুভার এক মুহূর্তও সে সহ্য করে?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা—সে কি কখনো তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে?···তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

"শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে

দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি
মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

আজ যাই দিদি। এই হয়তো শেষ প্রণাম।

স্নেহের দীনেশ

হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীতের ধারাস্নানে অভিষিক্ত আপনার দীনেশ নিঃসন্দেহে এই দীনেশ গুপ্তই।

স্বার্থত্যাগের এই পরম মহিমা, বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা, সংকল্প সাধনের এই অদম্য প্রচেষ্টার প্রতি অসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি রেখেও রবীন্দ্রনাথ এ পথের অনুমোদন করতেন না। ক্রমে যে এপথ বিভ্রান্ত হবে, গোপনীয়তার ছিদ্র পথে পাপ ঢুকে সমস্ত দিব্যজ্যোতির উপর ধূম্রজাল বিস্তার করবে এই তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন এই দেশকে স্বাধীন করা গুটিকতক ইংরেজ মেরেই সফল হবে না—তার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের সাধনার দ্বারা সংগঠিত করা চাই। তাঁর কাছে স্বাধীনতার পূর্ণছবি শুধু সরকার দখল করাতেই প্রকাশ হবে না। চিরন্তন মূল্যবোধগুলি উজ্জীবিত না করে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি সেগুলি বিনষ্ট করা যায় তাহলে স্বাধীনতাই অর্থশূন্য বিফল ও পরিণামে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, মানব সম্বন্ধকে কলঙ্কশূন্য স্বার্থশূন্য করে নিত্য আদর্শগুলি সজীব করে তোলাই স্বাধীনতার সাধনার প্রথম পদক্ষেপ। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সেই সাধনার গূঢ় প্রকৃতিকে দেখেই তিনি লিখতে পারলেন—'আমরা গান্ধীর শিষ্য কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব'...দেশজুড়ে এমন কাজের আবহাওয়া আমারও সর্বদাই মনে হত কিছু করা চাই কিন্তু কি যে করতে পারি সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

কবির এই চিঠিটা পাবার পর Historian's History of the world-এর প্রথম ভল্যুমখানা বাবার লাইব্রেরী থেকে নামালুম। প্রথম খণ্ড ঈজিপ্ট—বিশদ ও যত্ন করে লেখা পুরানো ঈজিপ্ট সম্বন্ধে সানুপূর্বিক তথ্য, যদিও ঐ সভ্যতার বাহ্যিক উন্নতি যতই হোক তার চিন্তা ও অন্তর্জীবনের গভীরতা পুরাতন ভারতীয় চিন্তার তুল্য নয়। সে ক্ষেত্রে দেখলাম ভারত সম্বন্ধে আলোচনা একেবারে অসম্পূর্ণ হেলাফেলায় লেখা। তখন আমার মনে হয়েছিল স্বাধীনতা না পেলে বোধহয় কোনো ক্ষেত্রেই মর্যাদা পাওয়া যাবে না।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবারে কলকাতায় গিয়ে দিন পাঁচেক ছিলুম জোড়াসাঁকোয়। রক্তকরবী অভিনয় ও ইণ্টারন্যাশনাল ইত্যাদি ইত্যাদি কী একটা ব্যাপার উপলক্ষ্যে। আমার গতিবিধি অপ্রকাশ থাকে না, আমার আকাশের মিতারই মতো আমার উদয়াস্তের সংবাদ দিগ্‌বার্ত্তাবহে মুদ্রিত হয়ে থাকে। তাই ভেবেছিলেম তোমার আসবার সুযোগ হলে তুমি আসতে পারবে।

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। তত্ত্ব আলোচনায় তোমার মন ব্যাপৃত আছে। জিজ্ঞাসা করেছ এতে চরম লাভটা কী? শুধুই তর্কের পথে জ্ঞানের অনুশীলন নিয়ে আনন্দ কোথায়? সংক্ষেপে তার ফল বিচার করা যাক।

অধিকাংশ মানুষ বিশেষত স্ত্রীলোক সংসারের সেই অগভীরে জীবনযাত্রা যাপন করে যেখানে নিয়তই দোলাদুলি, যেখানে নিরন্তর ফেনিলতা তার নানা-প্রকার ঝাপট থেকে মন নিষ্কৃতি পায় না। গভীরের মধ্যে নিবিষ্ট থাকলে কোনো চরম সত্য নিঃসংশয়ে লাভ করি বা না করি, চিত্ত থাকে আত্মসমাহিত, এমন একটা ধ্যানের আকাশের মধ্যে দিয়ে সব জিনিষ দেখি যাতে করে তারা অতিশয় হয়ে উঠে মনের সামঞ্জস্য নষ্ট করে না। এই নিরাসক্তির দূরত্ব জীবনে শান্তি আনে। স্বভাবের মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য্য আসে যাতে তুচ্ছকে বড়ো করে তুলে আমরা নিজের অসম্মান ঘটতে দিতে পারি নে। জ্ঞানান্বেষণের একান্ত অনুরাগ নিয়ে সকল বিদ্বানই যে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন তা নয় কিন্তু যেখানে সাধনা সত্য সেখানে মুক্তি পাবারই কথা। যেখানে অন্যথা দেখতে পাই সেখানেও তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে না। জ্ঞানের অকৃত্রিম সাধনায় মন আপনার মধ্যে গৌরব লাভ করে, সেই গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলে সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া সম্ভব হয় না, অকস্মাৎ বিচলিত হলেও পুনর্বার স্থিতিলাভকরা তার পক্ষে সহজ হয়।

এই মাসের শেষভাগে সিংহলে যেতে হবে। কলকাতা হয়ে যাব অতএব দেখা হতে পারবে। জোড়াসাঁকোয় ঘরকন্নার ব্যবস্থা যথোচিতমত না থাকায় সেখানে বেশিদিন থাকতে অসুবিধা হয়, তা ছাড়া জনতার উপদ্রবেও আমাকে উদ্বেজিত করে তোলে। কোনো একদিন জোড়াসাঁকোয় থেকে তোমাকে সাক্ষাৎকারের অবকাশ দেব। আজকাল আমার চিঠি লেখবার সহজ উদ্যম গ্রীষ্মকালের নদীধারার মতো ক্ষীণ হয়ে এসেছে—কিছু বলবার থাকলে লেখনীর

চেয়ে রসনার পরেই নির্ভর করতে হয়। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পালা বদল

পুরানো কথা লিখতে বসে সবচেয়ে মুশকিল এই হয় যে দিনগুলো ঠিক পরপর সাজিয়ে আসে না মনটা তো ইতিহাসের বই নয়, আগের ছবি পরে, পরের ছবি আগে, মনে আসে—তখন খুঁজে খুঁজে তারিখ মেলাতে গেলে আমার স্মৃতিসত্তার রঙীন আচ্ছাদন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়—একে তো কলম ধরে লেখাটাই একটা ব্যায়াম যাতে ভাবনার রূপ ও রেখা বদলে যায়। যতদূর মনে হয় ১৯৩৩ সালটায় কবি বেশ কয়েকবার কলকাতায় এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। মাঝে বরানগরে থাকলেও জোড়াসাঁকোয় এসে আমাকে দেখা করবার সুযোগ দিতেন। একবারই মাত্র আমরা বরানগরে গিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে—সেদিন 'রক্তকরবী' পাঠ করেছিলেন—একসঙ্গে অতবড় বই সবগুলো পার্ট নানা ভঙ্গিতে পাঠ করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন—সবচেয়ে আমার মনে পড়ে আরম্ভটা—সেই হঠাৎ ডেকে ওঠা "নন্দিনী নন্দিনী, নন্দিনী" ডাকের মধ্যে যেন আনন্দের উৎস ঝরে পড়ছিল।

১৯৩৩ সালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ছিল কমলা লেকচার্স। এটি গ্রীষ্মাবকাশে দার্জিলিং যাবার আগেই হয়ে গিয়েছিল। তিনদিন ধরে এই বক্তৃতা 'মানুষের ধর্ম' পড়া হয়েছিল—'মানুষের ধর্ম' ও হিবার্ট লেকচার Religion of man একই বই। আমরা সপরিবারে ঐ বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। দ্বারভাঙ্গা হলে ছোট একটি ডায়াসের উপর কবি বসেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তখন মাইকের আমদানী হয়েছে এবং একটি লোক লম্বা তার নিয়ে মাইক লাগাচ্ছে এইটুকু দৃশ্যই আমার মনে পড়ছিল কিন্তু সাধারণত ছবির মত যা আমার মনে পড়ে এক্ষেত্রে তা পড়ছিল না, আমি মনে করতে পারছিলাম না আমি কোথায় বসেছিলাম—কী কী কবিতা পড়া হয়েছিল ইত্যাদি। এই লেখা লিখতে বসে কয়েকদিন পর্যন্ত যখন আমি কমলা লেকচার্সের দিনগুলি মনে করবার চেষ্টা করছি আর তা যেন বারবার কুয়াশার আড়াল থেকে একটু মুখ বাড়িয়েই লুকিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—আমি হঠাৎ ভিক্টোরিয়া ইনস্টিট্যুশনের ভূতপূর্ব কর্ত্রী সুপ্রভা চৌধুরীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই আর পত্র ব্যবহার তো নেইই। হঠাৎ তিনি

আমায় চিঠি লিখলেন এবং অন্যান্য কথার মধ্যে লিখলেন, "আপনাকে আমি প্রথম দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কবি কমলা লেকচার্স দিচ্ছিলেন তখন···" চিঠিটা আমাকে অবাক করে দিল। আমি যা খুঁজছিলাম যেন তার উত্তর এল। যার সঙ্গে আমার জীবনে পত্রব্যবহার হয়নি তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন যা আমি তখনই ভাবছিলাম। আমি তাঁকে জানালাম একথা। এবার আমি তাঁর পত্র থেকে একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করছি এই কারণে যে এতক্ষণ আমি নিজে যা লিখে এলাম তা যে শুধু আমারই মনের কথা তা নয় আমি সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর কাছে আসতে পেরেছি যাঁরা সে সুযোগ পান নি তাঁরাও দূর থেকে তাঁর কবিতার ঝর্ণাধারায় অবগাহন করেছেন। চিন্তার আলোক সুধা পান করে আমারই মত কারণহীন সুখে আপ্লুত হয়েছেন। সুপ্রভা চৌধুরী লিখছেন,—"কমলা লেকচার্স যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৩-৩৪ এর কোনো সময় হয়েছিল (জানুয়ারী ১৯৩৩), দ্বিতীয় দিনে 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে "কী গাহিবে কী শুনাবে" থেকে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করেছিলেন—তৃতীয় দিনে 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ করেন। সম্ভবত বিকাল তিনটায়—আপনি প্রথম সারিতে বসেছিলেন, আমি দ্বিতীয় সারিতে, এক সহপাঠিনী আপনাকে দেখিয়ে ছিল। আগেই কবিতা পড়েছিলাম, ভালো লাগত, তাছাড়া আপনি দর্শনীয়ও ছিলেন তাই সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলাম, কতদিন আগের কথা ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি, রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুদিন আমাকে পড়িয়েছিলেন মনে পড়ে—বলাকার নদী (চঞ্চলা) ও সাজাহান কবিতা (রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনের জন্য বাঙলার অধ্যাপক হন)।···

···আপনি তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, কথা শুনেছেন, হাস্যপরিহাস করেছেন তাঁর সঙ্গে, তাঁকে সেবা করেছেন, উপহারও দিয়েছেন। আমি কোনোদিন তাঁর কাছে যাইনি—তিনি চিনতেন না আমাকে, অর্থাৎ তাঁর দেশের কোটি কোটি মানুষের একজন মাত্র আমি, তবু আমারও কিছু প্রাপ্তি হয়েছিল এবং সেটাই প্রমাণ করে কি উদার ছিলেন তিনি এবং কি দরাজ তাঁর দেবার হাত। ···রাত্তিরে বসে কাঁচা ভাষায় উচ্ছ্বাসে কবিকে আমার নিবেদন জানালাম।···' তাঁর কবিতা শুধু নয় সব লেখা আমি ভীষণ ভালোবাসি। তাঁর কাছ থেকে কত যে পেয়েছি তার তুলনা নেই, সেটা জানাবার জন্যই লিখছি তবে যদি অসম্ভব না হয় যদি একটু সময় থাকে, তবে কি পাঠাবেন আমাকে এক লাইন কবিতা? আমি কোনো পরিচয় দিইনি শুধু লিখেছিলাম আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের মেয়ে—তখনকার ডাক বিভাগ খুব সক্রিয় ছিল, এক সপ্তাহ পরে একটি

খাম এল উপরে ইংরেজিতে ঠিকানাটা ওঁর লেখা ভিতরে সুন্দর একখানা কার্ডে :

কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুপ্রভা—

আমার আপন ভালো লাগায়
রচি আমার গান
তুমি দিলে তোমার আপন
ভালো লাগাব দান
মোর আনন্দ এমনি করে
নিলে আঁচল পেতে
তোমার আনন্দেতে—

সুতরাং 'শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি' এ শুধু কাব্যের কথা নয় হৃদয়ের উত্তাপে লেখা এই কথা, তিনি সকলের কবি, তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী এ বিষয়ে আমার এই অভিজ্ঞতাটুকু আপনাকে জানালাম।"

এই প্রসঙ্গে আমার এরকম আরো অনেকগুলি কবিতাই মনে পড়ছে যা তিনি তাঁর ভক্ত পাঠক পাঠিকাকে লিখেছেন, আমাকেও একটি এ ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। একটি ভাঁজ করা পুরু হলদে কাগজে লেখা—

সূর্য কখন আলোর তিলক
দিলেন তোমার ভালে
অজানা উষার কালে
কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মত
দেন নাই তিনি ফুল
তোমার আপন হৃদয়েতে ছিল
মাধুরী লতার মূল
অরুণ কিরণে ঝবিল করুণা
বিকশিল মঞ্জরী
দেবতা আপনি বিস্মিত হল
আপন মন্ত্র স্মরি—

কবিতাটির উল্টো পিঠে লেখা "এখনি ফিরে চলেছি শান্তিনিকেতনে (শ্রীনিকেতন থেকে)।"

এইটুকুই সুপ্রভার চেয়ে আমার বেশি লাভ—ব্যক্তিগত পরিচয়।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অসুস্থ শরীরে বোটে বেড়াতে গিয়েছিলুম—তার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা চাপিয়ে ফিরেচি ; এখন কিছুকাল কিছু না করতে পারলেই ভালো হয়—কিন্তু নানাবিধ উপরোধ অনুরোধের দায় রোগের দায়ের চেয়ে বেশি। তাই বিছানার চেয়ে ডেস্কের দিকেই আমার গতিবিধি চলচে। ভেবেছিলেম ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে সে হয়ে উঠল না। হয়ত বা নবেম্বরের শেষভাগে অন্যত্র যাবার পথে কলকাতা মাড়িয়ে যেতে হবে। ইতি

৫ নবেম্বর ১৯৩৩

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সোমবারে সাড়ে পাঁচটায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার আবৃত্তির দিন। তৎপূর্বে এখান থেকে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে আন্দাজ সাড়ে দুপুরে জোড়াসাঁকোয় যাব—সেখান থেকে যাব কর্ত্তব্যক্ষেত্রে। যদি সম্ভবপর হয় তুমি জোড়াসাঁকোয় এলে দেখা হবে। ইতি শুক্রবার

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো জোড়াসাঁকোতেই আছি। অভিনয়ের পালা সুরু হলেই দৌড় মারব। এরমধ্যে কোনোদিন যদি মধ্যাহ্নে কিছুকালের জন্য আসতে পার দেখা হবে। অবশ্য অভিনয় কালের পূর্বে কিম্বা পরে। আগামী কাল লোকের ভিড় হবার আশঙ্কা আছে। ইতি বুধবার

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মংপু প্রবাস

১৯৩৪ সালে কবি সিলোন গেলেন। ১৯৩৪ সালের ১৯শে জুন আমার বিয়ে হয়ে গেল চারদিনের নোটিশে—শুক্রবার বিয়ে ঠিক হল পরের মঙ্গলবার বিয়ে হয়ে গেল। তার পরের সপ্তাহে কবি সিলোন থেকে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি মংপুতে আমার নিভৃত গিরিবাসে চলে গেলাম।

৩১শে জুলাই আমি তাঁর কাছ থেকে নিম্নোক্ত চিঠিখানি পাই—

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

কল্যাণীয়াসু

সব চেয়ে বড়ো সৃষ্টির দায়িত্ব যা মেয়েদের হাতে আছে সে তাদের আপন সংসার। এতে যথার্থ শক্তির প্রয়োজন করে—কল্পনা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গভীর স্নেহের ধৈর্য দিয়ে ছোট একটি আত্মীয়জগৎ সুন্দর করে রচনা করা সহজ কাজ নয়। সহজ নয় বলেই তাতে আনন্দ আছে গৌরব আছে। সব মেয়ে তা পাবে না, কেননা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বোধের অভাব আছে। এই সংসারে সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে থেকে যে নারী আপন প্রভাবকে চার দিকে বিস্তার করবে—তার মধ্যে গভীর শান্তি ও সহজ আত্মত্যাগের শক্তি থাকা চাই—নইলে মূলগত ক্ষুব্ধতা থেকে সৃষ্টির সৌষমা নষ্ট হয়। তোমার মধ্যে চরিত্রের গভীরতা ও কল্পনার আলোক আছে—তোমার সংসারকে বিশিষ্টতা দান করে আপন প্রতিভাকে সার্থক করবে এই আমি একান্ত মনে আশা করি।

হিমালয়ের বক্ষে নিভৃত আশ্রয় লাভ করেছ—ওখানে বৃহৎ অবকাশের মধ্যে তোমার চিত্ত আত্মনিবিষ্ট হয়ে আপন অন্তর্গূঢ় সম্পদের সন্ধান পাবে—চারদিকে জনতার পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মন আপনাকে প্রসারিত করতে পারবে।

তোমরা উভয়ে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৩১ জুলাই ১৯৩৪

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে আমার জীবন ও সংসার যাত্রা কীরকম হবে সে সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগ আছে। এবং উদ্বেগ আছে বলেই আমার উপরে ভরসা করছেন, আসলে এবারও নির্ভর করছেন "কল্পনার আলোকের" উপরে—"কল্পনার আলোক" বলতে ঠিক কি বোঝায় তা তখনও আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। কবির ৩১ জুলাইয়ের লেখা ঐ চিঠিটা পাবার আগেই তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। মনে হয় যেন তিনি আমাকে এই যে আশীর্বাদ করে লিখলেন তা আমার হাতে পৌঁছবার আগেই তার উত্তর পেয়ে গিয়েছিলেন।

অরণ্যবেষ্টিত জনহীন মংপুর একটি বিশেষ সৌন্দর্য ছিল—আমি গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বর্ষাকাল। বর্ষাধারা অবিরাম ঝরে ঝরে চারিদিক শ্যামল তৃপ্ত ও আর্দ্র করে রেখেছে, যেমন আর্দ্র হয়ে আছে আমার মনের ভিতরটা।

আমি যেখানে এসেছি এখানে সংসারে বা বাহিরে কেউ নেই। বিবাহে যে শরীর মনের পরিবর্তন যে কোনো অল্পবয়সী মেয়েকে ব্যাকুল করে তাছাড়াও চারিদিকে প্রকৃতির গভীর নীরব সঙ্গ আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে। এর মধ্যে একটি দিনের কথা মনে পড়ে—আমি বাইরে একটা চৌকিতে গ্রামোফোনটি নিয়ে বসেছি একলা—এখনকার রেকর্ড প্লেয়ার নয়—সে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাতে হয়, আর একটি রেকর্ড শেষ হলে উল্টে দিতে হয় ও পিন বদলাতে হয়। আমাব সঙ্গে আছে কনক দাসের কয়েকখানি রেকর্ড। ঐ গ্রামোফোনের দাম চল্লিশ টাকা—আমার বিবাহের যৌতুকের অন্তর্গত! এখন ভাবি কত অল্পতেই সন্তুষ্ট হতাম তখন আমরা। আমি চাবি দিয়ে দিয়ে একটার পর একটা গান শুনছি তার স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে আমার মন উধাও হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির শব্দ টিনের চালের উপর প্রচণ্ড ও দ্রুত, মাঝে মাঝে থেমে থেমে গুঞ্জন, মাঝে মাঝে মেঘ সরে সরে অল্প অল্প রোদ উঁকি দিচ্ছে। সামনের পাহাড় কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে কখনো উদ্ধত হয়ে উঠছে। প্রকৃতি, গান ও নূতন পরিস্থিতি সব মিলে এক অভাবনীয় সৌন্দর্যের মাধুর্যে আমার শরীর মন বিবশ হয়ে গেছে—গ্রামোফোনে কনক দাস গান গাইছেন, সে গান আজকের নিরীখে কেমন জানি না কিন্তু সেদিন তার ঝংকার সামনের সিলভার ফারের সূক্ষ্ম পাতায় পাতায় সিলভার বেল্-এর মত বাজছে। আমার অন্তরের নিভৃত নিকেতনে সূক্ষ্মতর সংবেদনা জাগিয়ে। যখন আমার সম্বিৎ ফিরে এল তখন দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেছে। আমি সেদিন দুখানা চিঠি লিখলাম। একখানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও অন্যখানা আমার এক বান্ধবীকে। তার উত্তরে ৮ই আগষ্টের চিঠিখানা পেলাম—

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

কল্যাণীয়াসু

আজ তোমার চিঠিখানি পড়ে খুব খুশি হলুম। তুমি আপনার চারদিকে আপন শান্তিকে সৃষ্টি করে তুলতে পারবে সে আমি নিশ্চিত জানি। বাইরের আনুকুল্যের পরেই যাদের একমাত্র নির্ভর সেই দুর্বল প্রকৃতির লোকেরা চির দিনই থাকে পরাবশ স্থায়ী······

তোমার আশ্রয় তুমি নিজে রচনা করবে। সেই আশ্রয় সৌন্দর্যে কল্যাণে

মণ্ডিত হয়ে উঠবে তোমার কাছে আমি এই প্রত্যাশাই করি। আমি তোমার পরে শ্রদ্ধা রাখি এবং তোমার মঙ্গল কামনা করি এর বেশি আমার আর তো কিছু করবার নেই।

আশ্রমে বর্ষামঙ্গল উৎসবের উদ্যোগ হচ্ছে। এবার কিছু বিশেষ আয়োজন করা যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমার দিন যতই সঙ্কীর্ণ হচ্ছে ততই প্রদীপের আলো বেশি করে উস্কিয়ে যাওয়া দরকার। যে সব কাজ বুদ্ধির কাজ তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ—কিন্তু যাতে আনন্দের প্রকাশ বিদায়ের পূর্বে তাকে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল করে মুদ্রিত করে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। তোমরা আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৮ অগাষ্ট ১৯৩৪

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর পরে এবং আগেও কবি আমাকে বলেছেন, "তোমার ঘর যদি আনন্দের ঘর হয় তবে আমি যাব তোমার কাছে।" তাঁর অনেক আশাই আমি পূরণ করতে পারিনি কিন্তু মংপুতে আমার সংসার যে আনন্দে ভরপুর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই—দূর দূর থেকে অতিথি অভ্যাগত আসতেন আমরা পথ চেয়ে থাকতাম তাঁদের জন্য। মাসের পর মাস কেউ কেউ সপরিবারে থেকেছেন। আত্মীয় স্বজন দু পক্ষের এমন কেউ ছিলেন না যিনি কোনো না কোনো ছুটি আমাদের মংপুর বাড়িতে কাটিয়ে গিয়েছেন। এ সংসারের সার্থকতার চূড়ান্ত হল যখন কবি এলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহুজন সমাগমে আমাদের ক্ষুদ্র সংসার যা সাধারণতঃ দু একজনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, মন্থিত হয়, ক্লিষ্ট হয়, তা অন্তরে বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার করল। সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর মত বেগ লাভ করল, গোষ্পদ সমুদ্র হয়ে গেল। আমাদের স্বামী স্ত্রীর মিলিত জীবনের ঐকতানে কবি যে গৃহমাধুর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন সে কথা তখন আমি বুঝতে পারিনি তবে পরে অনেকে আমাকে বলেছেন প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে যা লিখেছেন তা সত্য।

কবির সুকুমার স্পর্শকাতর মন এতটুকু অসামঞ্জস্য সহ্য করতে পারত না—চারবার তিনি ঐ দুর্গম বিপজ্জনক পথে আমাদের কাছে এসেছেন—পঞ্চম বার ও অসুস্থ শরীরে মংপুতে আসবার জন্য রওনা হয়ে কালিম্পঙে বেশি রকম অসুস্থ হয়ে গেলেন। . আমাদের সেই নির্ভাবনার দেশে তাঁর আসা যেন প্রাণ

হাতে করে আসা। আমরাও যে এতখানি সাহস করতাম তার কারণ বোধ হয় বিচক্ষণতার অভাব এবং তাঁর উপস্থিতির উল্লাসে আর সমস্ত দুশ্চিন্তা লোপ পেয়ে যেত।

আমার নীড় বাঁধবার ক্ষমতা অক্ষমতার সঙ্গে কল্পনাশক্তির সংযোগ কোথায় তাও আমি ক্রমে বুঝতে পেরেছি। আমার চরিত্রের দৈন্যে বা ভাগ্যের উৎক্ষেপে একদিক যদি ভাঙে কল্পনাদেবী অন্যদিকে তা পূর্ণ করবার পথ করে দেন। একদিকে যদি দরজা বন্ধ হয়ে যায় তা যত প্রিয় ঘরেরই হোক তিনি নিজ হাতে অন্য ঘরের দরজা খুলে দেন। এবং অজানাকে জানাবার অপ্রিয়কে প্রিয় করবার শক্তি সঞ্চার করেন। নূতনকে জানবার আগ্রহে পুরাতনের দৈন্য ঘুচে যায়। কল্পনাদেবীর আশ্রয় যে পেয়েছে তার জীবন আপন হৃদয় কেন্দ্রেই পূর্ণতার উৎস খুঁজে পেয়েছে। রামানন্দবাবু লিখেছেন "মংপু স্বর্গে পরিণত হয়েছিল" সে কথা সত্য।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষত্বের কথা সামান্য আলোচনা করব। আমার কাছে মংপুতে যখন ছুটি কাটাতে আসতেন তখন এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য হয়। হয়তো কোনো একটি বিষয়ে তিনি আগ্রহভরে চাইছেন—এত আগ্রহ যে দিবারাত্র তাই নিয়ে আলোচনা চলছে হঠাৎ সেই প্রার্থিত বিষয়টি পাওয়া গেল না, তখন তিনি বিষণ্ন হতেন না, প্রায় অব্যবহিত পর থেকেই বলতে শুরু করতেন যে প্রার্থনীয় বস্তুটি না পাওয়াই কত ভালো হয়েছে। যতটা জোরের সঙ্গে চাইছিলেন ততটা জোরের সঙ্গেই না পাওয়াকে সমর্থন করতেন। আমি একেবারে বিস্মিত হয়ে যেতাম। ভাবতাম আশাভঙ্গের বেদনা কি ইনি অনুভব করেন না? কিংবা এত তাড়াতাড়ি মত বদলে গেল কি করে—বৈরাগ্য তো নয়, আকাঙ্ক্ষা তো আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফলতায় নৈরাশ্য নেই। বরং মনে করতেন যা চেয়েছেন তা না পেয়েই ভালো হয়েছে। গানে অবশ্য লিখেছেন "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে"—কিন্তু সে তো অনেক বড় বিষয়ের কথা। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এই optimism দেখেছি। চরিত্রের এই চূড়ান্ত সদর্থক দিকটির সম্পূর্ণ অর্থ বোঝা আমার তখনকার অভিজ্ঞতায় সম্ভব ছিল না—এখন জানি এই শক্তি কল্পনা ও আশার সম্মিলিত শক্তি যার প্রভাবে নানা প্রতিবন্ধকতা নিন্দা লাঞ্ছনা শোক তাপ কিছুই সেই স্বর্গের মহিমাকে ম্লান করতে পারত না।

আমার মংপু চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া আর সহজ ছিল না। যখন আমি কলকাতায় আসতাম তখন উনি কলকাতায় নেই—আমারও আর বারে বারে শান্তিনিকেতন যাওয়া সম্ভব হত না। তাই কলকাতায় এলে আমার খোঁজ করতেন এবং খবর পেলে আমি জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হতাম। আমি কদাচিৎ তাঁকে চিঠি লিখতাম। কারণ আমি জানি চিঠি লিখলে তিনি উত্তর দেবেন ও তাতে তাঁর পরিশ্রমই বাড়বে।

রবি দীপিতা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্রখানি আমার টেবিল ক্ষেত্রে নানা সামগ্রীর ভিড়ের মধ্যে দৃষ্টিপথাতীত হয়েছিল। যদি ঠিকানা বদল না করতে তাহলে কোনো ক্ষতি হত না। প্রতাপাদিত্য রোড পর্যন্ত মনে ছিল কিন্তু নম্বর মনে রাখবার মতো মেধা আমার না থাকাতে এতদিন নিরুত্তর ছিলুম। হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করেছি। অতএব বাসি বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এখানে ছুটি উপলক্ষ্যে লোক সমাগম দুর্বার হয়ে উঠেছে। তারা বহু আমি একা, তারা প্রত্যেকে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সমূহের স্রোত দীর্ঘপ্রবাহী। নানা দায় নানা দাবী চারদিকে টানাটানি করচে—হয়ত তদুপলক্ষ্যে কোনো একদিন কলকাতায় টেনে নিতে পারে—তখন দৃশ্যমান হব, দেখা করতে চাও যদি তো দেখা পাবে। দিনক্ষণের সংবাদ আগে থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। ইতি

৪ অক্টোবর স্নিগ্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো affectionate শব্দের তর্জমা ঠিকমতো হয়েছে কিনা—না যদি হয় তবে বেদান্ত দর্শন থেকে সংগ্রহ করে দেন যেন!

চিঠি পড়ে বাবা বললেন, এই! আমাকে একটি খোঁচা না দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না।

কিন্তু কয়েকদিন পরই বাবার কাছে যে চিঠিখানা এল সে রকম চিঠি কম লেখকই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে। সেই সময়ে 'রবিদীপিতা' গ্রন্থ ছাপা হয়ে

এল। 'রবিদীপিতা' অর্থ যা রবির দীপ্তিতে দীপ্তিমান। তারপর তাঁর চিন্তা হতে লাগল কেউ আবার মনে করবে না তো বাবার বইটিই রবিকে দীপিত বা প্রকাশিত করছে! তাহলে তো স্পর্ধার মত শোনাবে। যা হোক যে যা ভাবে ভাবুক শেষ পর্যন্ত ঐ নামই বহাল রইল! 'আলোচন' নামে মুখবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন "ইহা রবীন্দ্রনাথের দীপিকা নহে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্তের যে উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছি তাহারই ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ মাত্র।" রবিদীপিতা বইটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গপত্রে আছে

"যদানন্দাভিষেকেণ চেতো মম নবায়তে
তৎপ্রীতিপূত চিত্তেন তুভ্যমেতৎ প্রদীয়তে।"

রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই একটি প্রশ্ন তুলতেন যে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মধ্যে প্রেয়োবোধ শ্রেয়োবোধের উপরে উঠেছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের পত্রে এই প্রশ্নের উত্তর আছে এবং যেহেতু এবিষয়ে আমাদের কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে তাই রবিদীপিতা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি —বইটি দুষ্প্রাপ্য। চিঠিটা বুঝতে হলে এই অংশটুকু পড়া দরকার, "বলাকা" প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন: "সুখ ও দুঃখ উভয়ই আমাদের স্বভাব। এই উভয়ের মধ্যের সেতু আমাদের চরম ধর্ম। কিন্তু দুঃখ ও দুঃখ বিমুক্তি বা চরম ধর্ম ইহার কোনোটিই মানুষের পক্ষে চরম কথা নহে। মানুষের মধ্যে চরম কথা এই যে তার প্রেয়োবোধ তাঁর শ্রেয়োবোধের উপরে উঠিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়োবোধের দাবী মানেন না, এমন অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে তিনি কেবল কালগতিতে যাহা ক্রমবিসারী সেই সরল রেখার প্রান্তভাগে যেন তাহার শ্রেয়োবুদ্ধিকে সন্নিবেশিত করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যেই শ্রেয়োবুদ্ধির স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকের দিক হইতে তাহার মতের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক বিচার করেন নাই। তত্ত্ববিচারের প্রণালীও অবলম্বন করেন নাই। সেইজন্য যুক্তি তর্কের অবতারণা করা নিষ্ফল। কিন্তু তাঁহার কাব্যানুভূতির মধ্যে শ্রেয়োবুদ্ধির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই এ অভিযোগটি আমরা কেবলমাত্র অনুভূতির দিক দিয়াও আনিতে পারি।...

...প্রকৃতির প্রীতিবন্ধনের মধ্য দিয়া যখন বিশ্বের রস জীবন পাত্রে উচ্ছলিয়া উঠে তখন শ্রেয় ও প্রেয়র ভেদ থাকে না, শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বের কথা আমাদের লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া যায়।...কিন্তু অজানার দিকে বিশ্বের চলন স্বভাবটা যেমন

একটা গভীর সত্য, মানুষের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশও তেমনি মনুষ্য-জীবনের একই পরম মহিমাময় সত্য। মানুষ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিসই হইতেছে তাহার এই শ্রেয়োবোধ…সেইজন্য আমরা আশা করি যে, প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের অনেকগুলি সারসত্য যেমন তাহার অনুভূতির মধ্যেই ধরা পড়িয়া রসোজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে মনুষ্য-জীবনের এই পরম সত্যটিও তেমনি তাহার আগামী স্তরের অনুভূতিতে হয়তো রসোজ্জ্বল হইয়া দেদীপ্যমান হইবে।…"

রবীন্দ্রকাব্য ও জীবনের অনেক সদর্থক আলোচনা প্রসঙ্গে এই (আমার মতে) নঞর্থক মতটি লেখা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠির মধ্যে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন সেজন্যই এই উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

রবি-দীপিতা' পড়ে সুরেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "রবিদীপিতা" বইখানিতে আমার গর্ব করবার যথেষ্ট বিষয় আছে—কিন্তু আমার কাছে ওর মূল্য কেবল সে জন্যে নয়। নিজের কবিতার মধ্যে নিজের অন্তরতম যে পরিচয় স্বত উদ্ভাবিত হয় নানা ভাব বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে তার ঐক্যটিকে আবিষ্কার করা কবির পক্ষে এমন কি অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই অসাধ্য। যে চিত্তদর্পণে নিজের স্বরূপ প্রতিফলিত হলে নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া সম্ভবপর হয় সেই স্বচ্ছ দর্পণ দুর্লভ। তোমার বইখানি পড়তে পড়তে তোমার উপলব্ধির মধ্যে আমার কবি প্রকৃতিকে অনুভব করে আনন্দ পেয়েছি। ইতিপূর্ব্বে কোনো কোনো গ্রন্থে আমার কাব্যের ব্যাখ্যা দেখেছি, কিন্তু সে যেন শরীর তত্ত্বগত দেহের বিশ্লেষণ, তাতে মর্ম্মগত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তুমি সেই প্রাণ রহস্য উদ্ঘাটিত করেছ বলে মনে করি। তাতে অনেক জায়গায় আমার নিজেকে ভাবতে হয়েছে। তার একটা দৃষ্টান্ত, যথা, তুমি লিখেছ আমার কাব্যে শ্রেয়োবোধের প্রাধান্য নেই। যদিও তার কোনো কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তবু আমার মনে হল মোটের উপরে তোমার কথাটা সত্য। আমার বোধহয় একথাটা সাধারণত ভারতবর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে খাটে। য়ুরোপীয় খৃষ্টান ধর্ম্মে ভালোমন্দ পাপপুণ্য ঘটিত দ্বন্দ্বের সংঘাত সবচেয়ে প্রবলরূপে দেখা যায়।এই জন্যে সেই ধর্ম্ম শ্রেয়োবুদ্ধি প্রধান। ভারতীয় আর্যধর্ম্ম আধ্যাত্মিক। সে ধর্ম

দ্বন্দ্বাতীত পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়াসী। কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণা নিঃসন্দেহ আমার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত তার আদর্শ য়ুরোপীয় শিক্ষা থেকেই আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এই আদর্শ দুঃসাধ্য প্রয়াসে আমাকে কঠোরভাবেই প্রবর্ত্তিত করেছে। কিন্তু আমার কাব্যের মধ্যে আমার চিত্তের যে গূঢ় লক্ষ্য দেখা যায় সে কর্ত্তব্য সিদ্ধির অভিমুখে নয়। তাতে দেখতে পাই কর্ম্মকে অতিক্রম করে যে অমৃতময় অবকাশ দেবভোগ্য তারই জন্য আমার যথার্থ উৎকণ্ঠা। এই নৈষ্কর্ম্ম্য অক্রিয় নয়, এর গভীরতার মধ্যে যে ক্রিয়া আছে তা স্বাভাবিকী, তা সৃষ্টি সংকল্পের সহজ আনন্দে বেগবতী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই জন্যই শিশুকাল থেকে আমাকে এমন নিবিড় আনন্দ দিয়েছে, সে আনন্দ ইস্কুলপালানে ছেলের ছুটির আনন্দ। আমার কাব্যে আমার ছুটি, আমার ছবি আঁকাতেও তাই। আমি শান্তিনিকেতনে যে আশ্রম রচনা করতে নামলেম, তার প্রবর্ত্তনা তপোবনের আদর্শে। আনন্দের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা শিক্ষার সাধনাকে অবকাশের মধ্যে ফলবতী করে তুলব এই কল্পনার আনন্দই একদা আমাকে এই কাজে আকর্ষণ করেছে—যে অসীম অবকাশের মধ্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারকার নিরন্তর উদ্যম দীপালি উৎসবের মতো প্রকাশ পেয়েছে, যে অবকাশের মধ্যে ফুল ফুটচে, ফল ফলচে, শস্য উঠচে পেকে, তাদের প্রাণের চেষ্টাকে নেপথ্য-গত করে তাদের প্রাণের প্রকাশ বিশ্বের কাছে উৎসৃষ্ট হচ্ছে—সেই অন্তর্গূঢ় প্রাণপূর্ণ অবকাশকেই আমার কর্ম্মের মধ্যে কামনা করছি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় অনুষ্ঠান নানা স্বভাবের নানা লোককে নিয়ে সম্পন্ন করতে হয় সেখানে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" মন্ত্রটি চাপা পড়ে সেখানে প্রকাশ হতে থাকে "সতপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" অর্থাৎ সেখানে শ্রেয়োবুদ্ধিই দ্বন্দ্বের সমাধানে সর্ব্বদাই উদ্যত হয়ে থাকে। এই নিরন্তর সংগ্রামের মাহাত্ম্যবোধ আমরা য়ুরোপের কাছে পেয়েছি—সুতরাং এই সংগ্রামে নানা ক্ষেত্রেই আমাদের নামতে হয়েছে। তবুও কর্ম্মের মধ্যে তার প্রয়াসটাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে আমার মন বলতে থাকে বিপুল ক্ষুধাশালী গরুড় যে জন্মেছিল সে কেবল খাদ্য ও আশ্রয় খুঁজে বেড়াবার জন্যে নয় বিষ্ণুকে বহন করবার জন্যেই। গরুড় যখন গৌণ হোলো তখনই সে সার্থক হোলো। আমার মধ্যে যে কবি সে কর্ম্মের উর্দ্ধে এই দীপ্তিমান দিব্য অবকাশকেই চেয়েছে, পেয়েছে কিনা সেকথা এই চিঠিতে আলোচনা করবার নয়। ভারতবর্ষের দেবতা বাজিয়েছেন বাঁশি, ভারতবর্ষের দেবতা নেচেছেন নাচ, সেকথা শাস্ত্রে মানেন এমন ধীমান বিদ্বানের অভাব নেই, তাঁরা হয়তো ভাবেন না সেই গানে সেই নাচেই

সৃষ্টির কাজ, আপিসের কাজ হয়ে ওঠে নি—দেবতারা যে চাপল্যে কুণ্ঠিত হননি আমি সেই মনোরঞ্জনী চপলতাকে আমার কর্ম অনুষ্ঠানে আহ্বান করেছি—আমার সৃষ্টি কর্মে আমি বিশ্বসৃষ্টি কর্ত্তার অনুসরণ করতে চেয়েছি তোমার বইখানি পড়ে এই কথাটি বিশেষ করে আজ আমার মনে হোলো। আমার অনেক পণ্ডিত বন্ধু এ সমস্তকে শ্রেয় নয় বলে থাকেন কিন্তু আমি কবি, শ্রেয়ের ঊর্দ্ধে তাকে মানি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

যাই হোক তোমার বইখানি এই জন্যেই আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েচে যেহেতু তোমার কাব্য-আলোচনা কেবল মাত্র বৈশ্লেষিক নয় তুমি যাকে বলেচ "সাংঘটিক" এ তাই। এতে তুমি সমগ্রভাবে কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করেচ এই জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় অল্প, শরীর অপটু, তবু চিঠিখানা বড়ো হয়ে গেল সে কেবল মনের আবেগে। ইতি ১২ অক্টোবর, ১৯৩৪ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময় শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বের কথা সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই আলোচনা কবতেন। কথাটা তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আজ দীর্ঘদিন পরে এই চিঠিখানি হাতে নিয়ে আমার একটি পুরানো কথা মনে পডছে, তা এই যে তখন যাঁবা ববীন্দ্রকাব্যরসিক ছিলেন বা সাহিত্য আলোচনা করতেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিপুল কর্মজীবনকে তেমন চিনতেন না। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন বিশুদ্ধ ইণ্টেলিজেনসিয়া। রবীন্দ্রকাব্যে শ্রেয়োবোধেব অভাব বলতে লেখক এখানে কী মনে করেছেন জানি না। যদি সেটা ধর্মভাব হয় তাহলে তাঁর জীবনের এক অংশ জুড়ে তো পূজারই গান, সে পূজা যদিও ঠিক কোনো শাস্ত্রানুগ নয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখানে শ্রেয়োবোধের অর্থ করেছেন 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি' এবং এর সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মের আভ্যন্তরীণ প্রবর্ত্তনাব কথা বলেছেন যা মিশনারীদের মানব কল্যাণের বিবিধ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় রূপ নিয়েছে। ভারতে হিন্দুরা নয় বৌদ্ধরাই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ হিতৈষণার কাজ করেছেন—ওষধি নিয়ে স্থবিব ও স্থবিরারা দেশ দেশান্তরে যেতেন মানব কল্যাণ কাজেই।

রবীন্দ্রনাথ তো অল্প বয়স থেকেই মানুষের কাজে নামলেন। তাঁর রচনার একটা বিরাট অংশ তো মানুষের শ্রেয়োবোধ উদ্বোধনেরই কাজে লেগেছে। শিলাইদহে পতিসরে তাঁর কর্মজীবন পল্লী সংগঠন কর্মের বহু পরিকল্পনা যার পরিণতি ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে ও শ্রীনিকেতনের গ্রাম সংগঠন কর্মে এবং বিশ্বভারতীতে। কত বিচিত্র দিকে তাঁর কল্যাণমুখী পরিকল্পনা কী অনলস চেষ্টায়

নিত্য ধাবিত তা অনেকেরই সে সময় জানা ছিল না, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন সহকর্মী ছিলেন তাঁরাই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন অনেক পরে।

কিন্তু একথাও অবশ্য আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাজই রূপে রসে আনন্দে একীভূত। তিনি কাজ ও খেলাকে পৃথক করেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে তাঁর নিজের কর্ম ও সৃষ্টির তুলনা করছেন—

খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল যে ধরে
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে, ভয়ের ভীষণ রক্ত রাগে
খেলার আগুন যখন জাগে
ভাঙ্গা চোরা জ্বলে যে হয় ছাই—

ফুল ফুটছে, ফল ধরছে, ফসল হচ্ছে সেই বিরাট কর্মযজ্ঞ তো 'কামারশালায়' হাতুড়ি পেটা নয়—বসন্ত বিধুর বাতাসে মৌমাছিদের গুঞ্জনে মিলে বিধাতার যে কর্মযজ্ঞ চলেছে সেখানে কাজও খেলা হয়ে উঠছে। অনেক পুরানো চিন্তা অনেক ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা কবির চিন্তার আগুনে ভস্ম হয়েছে কিন্তু সেও সংস্কারকের কোমর বাঁধা দাপাদাপির রূপ নেয়নি। এই কারণেই কেউ কেউ তাঁকে গজদন্ত মিনারের কবি বলে, কারণ কাজকে তিনি রুক্ষ শুষ্ক কর্তব্যের বোঝা না করে জীবনের আনন্দে অনুস্যূত করেছেন। সেই আনন্দই তাঁর গজদন্ত-মিনার।

শ্রেয়োবোধ অর্থ যদি পাপপুণ্যের চেতনা হয় তবে অবশ্যই কবি পাপের চিন্তায় অভিভূত নন। এ সম্বন্ধে ১৯১৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী Friend নামে একটি পত্রিকায় Gospel of Joy নামে একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি। এই প্রবন্ধে লেখক টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে লিখছেন:

This idea of joy as the central springs of life is opposed to the idea of sin. Rabindra literature is never obsessed by fear of sin. Yet, it could sing of the soul……Poet Yeats also wrote—when I tried to find anything western, which I might compare with the work of Mr. Tagore I thought of the Imitation of Christ, yet between the works of the two men there is a whole world of difference. Thomas A Kempis was obsessed by the thoughts of sin Mr. Tagore has as little thoughts of sin as a child playing with a top."

যতদূর মনে হয় সুরেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রকাব্যে এই পাপবোধের অভাবকেই শ্রেয়োবোধের অভাব মনে করে থাকবেন। না হলে সে যুগে জনহিতকর কাজে

কোন্ লেখক কোন্ কবি বা অন্য কেই বা এতখানি নিবেদিত ছিল? এমন কি রাষ্ট্রনেতারাও তো আন্দোলন ও বক্তৃতার বেশী কিছু করছেন না বলে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল। কোথায় অনাহার জীর্ণ ম্যালেরিয়া পীড়িত গণ্ডগ্রামের অগণ্য ভারতবাসী কোথায় বা শহরের বক্তৃতা মঞ্চ। অথচ তাঁর পল্লী সংগঠনের বিবিধ কাজ, শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা, বিশ্বভারতীর সংগঠন এ সবের জন্য যে নিরলস অবিশ্রাম কর্মোদ্যম তা ঢাকা পড়ে যেত, নৃত্যগীত সঙ্গীত মুখরতায়, দেশের বহু লোক বলত রবীন্দ্রনাথ নাচগান নিয়েই রইলেন, দেশের জন্য কিছুই করলেন না।

আজ ভাবি তাঁর কর্মধারা আজ পর্যন্ত কত দিক থেকে তাঁর দেশবাসীকে কতভাবে প্রাণপূর্ণ করে চলছে। একা রবীন্দ্রনাথ আজ কত লোকের রুজি রোজগারের মূলধন। তাঁরই বই ছাপিয়ে বাঁধিয়ে এক বিরাট কর্মসংস্থান চলেছে —তাঁর উপর বই লেখা হচ্ছে—থিসিস হচ্ছে, তাঁর রচিত নাটকে নৃত্যনাট্যে গানে কত লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ হচ্ছে—কেউ যন্ত্রে বাজাচ্ছে কেউ গাইছে কেউ রেকর্ড করছে। বিশ্বভারতীর একটি বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ছাড়াও বহু লোকের জীবিকা ও আনন্দের উৎস হয়ে আছেন আজও তিনি। বোধহয় জগতে কোনো দেশে আর কোনো কবি তাঁর স্বজাতিকে এতখানি উপকৃত করতে পারেন নি।

তাত্ত্বিক সুরেন্দ্রনাথ শ্রেয় ও প্রেয়ের যে বিতর্কই তুলে থাকুন সাহিত্যরসিক সুরেন্দ্রনাথ রবিদীপিতায় তাঁর নিজের মনের দর্পনে কবির সৃষ্টিকে প্রাণের আনন্দেই দেখেছেন। রবিদীপিতার শেষ প্রবন্ধ মহুয়া সম্বন্ধে—তার শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করছি—এখানে তত্ত্বজ্ঞানী তার্কিক মানুষটি রসোপলব্ধির ভরা সমুদ্রে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন—

"প্রকৃতির সহিত নারী ও নরলোকের যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া নারীপ্রেম যে বিচিত্র মুক্তির ইঙ্গিতে আমাদের অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া দেয়, সে শিহরণ যে শুধু অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসের কারাগৃহের মধ্যে, আপন অনুভবের মুক্তি সঙ্গীতের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাহা যে মানুষকে নরসমাজের ও প্রকৃতিলোকের বিচিত্র দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে, বিরহের মধ্যে, দুঃখ সন্তাপের মধ্যে ধৈর্যে অটল, গতিতে বাধাবিহীন মুক্তি বিহারী করিয়া তোলে। তাহারই আঘ্রাণ মহুয়া কাব্যের মধ্য হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় যেন নারীপ্রেমের অনুভব ও কল্পনা মানুষের চিত্তলোকে যা কিছু দীপ্তি, যা কিছু বর্ণচ্ছটা, যা কিছু তপস্যা, যা কিছু শৌর্য বীর্য ও-

অগ্নিদীক্ষা আনিতে পারে মনুষ্যের পর্ণপুটে কবি তাহা নিঃশেষে ভরিয়া দিয়াছেন। রবি যেন তাহার আকাশের উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীন হইয়া মহাজ্যোতি সম্পাতে মনুষ্যলোক ও প্রকৃতিলোককে যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পদ্মা বোটে

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বরানগরে ছিলুম—সংস্কৃত কলেজ থেকে একটা খাতায় আমার নাম সই নেবার জন্যে কোনো ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁদের কাছে শুনলুম তুমি কলকাতায় আছ। আমি তোমাদের জানাতে বললুম যে আমি জোড়াসাঁকোয় যাব সেখানে যেন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়। তোমাকে দেখবার জন্যই জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম। দেখা হলো না। বোধ হয় তোমাকে জানান হয় নি। কিছুদিন থেকে নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশে বক্তৃতার দাবী আছে, এই কাজটা আমার পক্ষে সব-চেয়ে ক্লান্তিকর। আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষের বয়স চক্রপথে চলে। বয়স যখন অল্প ছিল লেখার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম কবিতা দিয়ে। অর্থাৎ সেটা ছিল লীলা শ্রেণীর সাধনা মধ্যপথে সুরু হল গদ্য প্রবন্ধ, সেটাতে প্রধানত কর্ত্তব্য পালনের উদ্যম ছিল প্রধান। সেটা পরিমাণে কম হয়নি, যথেষ্ট উৎসাহও ছিল। উৎসাহের কারণ কেবলমাত্র লোকহিত নয়। বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতিকে উৎকর্ষ দেবার ইচ্ছাও আমার মনে ছিল। ক্রমে ক্রমে এই সংকল্প নানা আকারে আমার লেখায় যথাসম্ভব পরিণতি লাভ করেছে। সাহিত্যিক গদ্য ভাষাকে আমি বোধ হয় আগের চেয়ে সবল করেছি। আজ আমাকে যারা গাল দেয় আমারি ভাষা তাদের আনুকূল্য করে। আজ গদ্য লিখতে বসতে আমার ইচ্ছেই করে না। এককালে আমার ঘোড়া ছিল সওয়ারী ঘোড়া, তার কাজ ছিল সখের দৌড়, মাঝ বয়সে সে হল গাড়িটানা ঘোড়া; কখনো তাতে মিটত আরোহীর সখ কখনো বা তা আরোহীর জরুরী কাজে লাগত। আজ লেখনী তার সেই গাড়ি-জোতা লাগাম থেকে মুক্তি চাচ্ছে কিন্তু মাঝখানকার কর্ম্মফল তাগিদ দিতে ছাড়ে না, এই তাগিদে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমি অকেজো হয়ে দিন আরম্ভ করেছিলুম অকেজো হয়ে বিদায় নিতে ইচ্ছে করে।

ভিড়ের মধ্যে ঘন ঘন ডাক পড়েচে, ছেলেবেলাকার মতো পলাতক বৃত্তি করবার অধিকার হারিয়েছি অথচ সেই স্বভাবটা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে—আমার খ্যাতিটা আমার পক্ষে দুঃসহ বোঝা বলে মনে হয়। তার একটা কারণ আমার প্রদেশটাতে আমার খ্যাতিতে ভালোবাসার অংশ অতি অল্পই আছে এর থেকে মন কেবলি সঙ্কুচিত হয়ে প্রতিনিবৃত্ত হতে চায়—এ এত অবাস্তব, এত নির্ম্মম, বোধ করি আমার পক্ষে ভালোই হয়েচে, খ্যাতির প্রমত্ততা থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আগামী উনিশে অক্টোবরে মাদ্রাজে যাত্রা করব। দোসরা নবেম্বর নাগাদ ফিরব। সেখানে যথারীতি অভ্যর্থনা অভিনন্দন ইত্যাদিতে কটা দিনকে আলোড়িত করে তুলবে, যদিও সেটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর কিন্তু বিতৃষ্ণাজনক নয়। এরকম জায়গায় খ্যাতিমান পুরুষ দেশের লোকের পক্ষে খেলার উপকরণ। কিছু দিনের জন্যে এই তাদের একটা বিশুদ্ধ উত্তেজনাব বিষয় হবে। এর মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ নিন্দা বিষ মেশাবে না। দুদিন পরে খেলা সাঙ্গ হবে, আলো নিববে, ঢাক বাজনা বন্ধ হবে, দেশে আসবো ফিরে। এই খুসিটুকু অল্পক্ষণের জন্যে ওদের দিয়ে আসতে পারব এতে আমিও খুসি হব, ভুলে যাব ক্লান্তিও।

শীতের সময় পর্বত বাস ছেড়ে যদি আমাদের সমতল ক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্যে নেমে আস, তাহলে সেই সময়ে দেখব তুমি কেমন আছো। তোমার বাবার রবিদীপিতা পড়ে খুব খুসি হয়েছি। ইতি—১২ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিটা মংপুতে ফিরে গিয়ে পেলাম—অনুমান করা কঠিন নয় কী রকম মনের অবস্থা হল—আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় এলেন দেখা হল না।

এই সময়ে আমার সংসার যাত্রা ছিল আমার এতকালের পরিচিত জীবন থেকে পৃথক। পড়াশুনো আলোচনা ও নূতন নূতন বইয়ের সম্মোহিনী থেকে যে সব মানুষ ও জীবনধারায় আমি যুক্ত হলাম সেখান থেকে কী জানি কী আলস্য-বশত রবীন্দ্রনাথকে আমি নিত্য নূতন সংবাদ দিইনি, দিতেও হয়ত পারতাম তা এখন জানি—যেমন কোনো কীটপতঙ্গের জীবন বৃত্তান্ত, কোনো নূতন চেনা তরুগুল্মের বিবর্তন এ সব লিখলে তাঁর ভালোই লাগত। কিন্তু আমি কিছুই লিখতাম না। উনি ব্যস্ত হতেন।

আসল কথা অভিজ্ঞতার শিক্ষা তখন আমার একেবারেই হয়নি। বেশ কিছুদিন আগে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি—ঘরে ঢোকামাত্র একটা চিরকুট দিলেন তাতে ছোট ছোট দুটো কবিতা লেখা আছে—

প্রথমটি—

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পূরাতে পার না তাও
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও।

আর একটি—

দুঃখ এড়াবার আশা নাই এ জীবনে
দুঃখ সহিবার বল পাও যেন মনে—

পরে এ দুটি কবিতা আমি লিখে দেওয়াতে কোনো বইতে ছাপা হয়েছে। এ কবিতার শব্দার্থ বোঝা কঠিন ছিল না কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতাতে সফল করা সহজ নয়। যা পাইনি সেদিকে না তাকিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির যে পূর্ণ ঐশ্বর্যের মাঝখানে এসে পৌঁছেছিলাম দুচোখ দিয়ে তা প্রাণপূর্ণ করে দেখার শিক্ষা তখনও আমার হয় নি। কী অপ্রাপ্য ধন, কী অপূর্ণ আশা, আমায় নিরন্তর ব্যাকুল করছে তা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না—আমি অতিরিক্ত সিরিয়াস অর্থাৎ সামঞ্জস্যের অভাবে অসম্পূর্ণ, মনে মনে সর্বদাই কি করি কি করি ভাবতাম। কবি যেন অনেক দূরে চলে গেছেন। কবিকে যে কত সহজে পাওয়া যায় তিনি যে কত সহজ মানুষ তা যারা বুঝত তারা আমার চেয়ে বেশি পেয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম যখন তিনি আমার বাড়িতে এলেন—কাছের মানুষের আটপৌরে চেহারার সরল সৌন্দর্য আমার স্বকল্পিত অন্তরাল ঘুচিয়ে দিল।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল পূর্ব্বে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলাম—তোমাদের পার্ব্বত্য ঠিকানায় তার উত্তর পাঠাতে বিলম্ব করিনি। খবর পেলুম তারি কাছাকাছি কোনো সময়ে তোমার বাবার সঙ্গে তুমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলে—তাই উত্তর না পেয়ে ভেবেছিলুম সে চিঠি যথা সময়ে তোমার হস্তগত হয়নি। আজ তোমার

চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে সেটা বিলুপ্ত হয়েছে। চিঠিখানা এত বড়ো দণ্ডের যোগ্য ছিল না।

ইতিমধ্যে আমার গ্রহ আমাকে অনেক ঘুরিয়েছে। গিয়েছিলুম কাশিধামে সেখানকার মুখ্য কর্ত্তব্যের আমন্ত্রণটা ফেব্রুয়ারি মাসে পিছিয়ে গেছে। গৌণ আমন্ত্রণ একটা ছিল। সেইটে এড়াতে না পেরে আটকা পড়তে হলো। সংসারের সমস্ত তাগিদ কাটিয়ে বিক্ষিপ্ত উদ্যমকে আপনার মধ্যে প্রত্যাহরণ করবার জন্য মন উৎসুক হয়ে ওঠে, কিন্তু ছোট বড়ো নানা দাবীর আকর্ষণে আমাকে আবর্তিত করতে থাকে, একটুও ভালো লাগে না। আগামী ২৭শে ডিসেম্বরে প্রবাসী 'বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সূচনার ভার আমার উপর পড়েছে। এই সামান্য ও নিরর্থক কাজের জন্যে এখান থেকে কলকাতায় যাতায়াত আমার পক্ষে যে কত ক্লেশকর সে কথা এঁদের কাউকে বোঝাবার শক্তি আমার নেই। এঁরা আমাকে এঁদের সমারোহের উপকরণরূপে ব্যবহার করতে চান—তাতে আমার স্বাস্থ্য ও বিশ্রাম যদি ক্ষুণ্ণ হয় সে দুঃখ একা আমারই। আমার নিজের কর্ম্ম আমার পক্ষে যথেষ্ট গুরুভার, সেই ভার লাঘবের জন্যে দেশের কাউকেই পাইনে। এই নির্ম্মমতা আমি অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারতুম যদি এঁরা নিজেদের সামান্য প্রয়োজনের উপলক্ষ্যে আমার এই ক্লান্ত দেহকে পীড়িত করতে অকুণ্ঠিত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করতেন। আজকাল চেষ্টা করি মনকে এই সকল ক্ষোভের উর্দ্ধে শান্ত রাখতে। কিন্তু শরীর যখন দুর্ব্বল থাকে তখন মনকে উত্তেজনা থেকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়—সেজন্য আমি লজ্জাবোধ করি। এই একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে আমার দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় আমার প্রকৃতিগত গভীর বৈষম্য আছে। সেই জন্যে আমার প্রতি মমত্বের অভাবে দেশ আমাকে এতই অনায়াসে দুঃখ দিতে উদ্যত।

গিরিরাজের আতিথ্যে জনসংঘের সংঘাত থেকে নিস্তার পেয়ে তুমি শান্তিতে আছ শুনে খুব খুশি হয়েছি। আমার সর্ব্বান্তঃকরণের স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

২৩শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ। আমাদের এখানে দুর্গ্রহের তাড়নায় আমাকে

২৬শে ডিসেম্বর যেতে হবে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সূচনা করতে। নিরতিশয় অনর্থক কাজ। আমার ক্লান্ত দেহকে ২০০ মাইল পথ বৃথা ঘুর খাওয়াবে, তারপরে ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো ব্যর্থ বাক্য উচ্চারণ করতে হবে, ন দেবায় ন ধর্ম্মায়। নালিশ করে ফল নেই—নিজের দুর্ব্বল স্বভাবকেই দায়িক করতে হবে—প্রতিকূলতা সর্বত্র যথেষ্টই আছে, তাকে মথিত করে তুলতে কুন্ঠিত হই। একেই বলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই আত্মঘাত। সম্প্রতি আমার সামনে গোটা তিনেক মোটা কাজ আছে হিন্দু মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা, তার অনতি পরেই এলাহাবাদে তারপরেই লাহোরে। তারপরে যদি বেঁচে থাকি তবে সত্যাগ্রহ করব—মৌনী বাবা হয়ে বসব—সকল প্রকার বিক্ষিপ্ত চেষ্টাকে নানা ক্ষেত্র থেকে মনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনব ঘোষণা করে দেব দ্বার বন্ধ। নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব না তবু কল্পনা করলেও মন হাঁফ ছাড়ে।

খ্রীষ্টমাস সপ্তাহে যদি কলকাতায় থাকো তবে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আর যদি শান্তিনিকেতনে আসা অসম্ভব না হয় তবে আরো ভালো। ইতি

তারিখ জানিনে

আশীর্বাদ গ্রহণ করো—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(এনভেলাপের তারিখ ১৬.১২.৩৪)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি এখন কোথায় জানিনে। তোমার কাছ থেকে এক বোতল মধু পেয়ে বোধ হচ্চে তুমি কলকাতায় এসেছ। মধু পেয়ে খুব খুশী হলুম। মধু আমি প্রত্যহই খেয়ে থাকি। তোমার এই দান প্রতিদিনই তোমার পরিবেষণরূপে আমার কাছে আসবে। পশ্চিম থেকে ফেরবার পথে কলকাতায় নামবার সঙ্কল্প ছিল। শরীরটা ভাঙন ধরা অবস্থায় বাধা দিলে। প্রায় এক মাস নানা স্থানে নানা সভায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছি। প্রথম থেকেই শরীর অসুস্থ ছিল, তাই অনুরোধ করেছিলুম কর্ত্তব্য সংক্ষেপ করতে। যথেষ্ট সংক্ষেপ করে যা অবশিষ্ট ছিল তাতে আমার বড়ো কিছু অবশেষ ছিল না। লাহোরে গিয়ে একজন বাঙালী মহিলার পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টিসিক্ত উদ্যান বাটিকায় চা সত্রে অপরাহ্ণ যাপন করে সেই রাত্রেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লুম। অনেক দিন গেল তার ধাক্কা সামলাতে, বোধ

হচ্ছে এখনো তার ক্ষতিপূরণ হয়নি। ২০শে তারিখে এখানে বসন্ত উৎসব হবে। তারি আয়োজনে নিযুক্ত আছি। পালা শেষ হলে পর যাব কলকাতায়। তার অনতিকাল পরেই বৌমা রথীর সঙ্গে যাত্রা করবেন য়ুরোপে। তাঁরা বোধ করি আষাঢ়ের আরম্ভে ফিরবেন। আমি ইতিমধ্যে হয়তো দেরাদুন যেতেও পারি। কিন্তু দেহটাকে নিয়ে টানাহেচড়া করবার মত অবস্থা নয়—তাই বোধ করি এখানেই আমার স্থিতি। একটা মাটির ঘর নির্ম্মাণ চলচে। আগামী জন্মদিনে সেই ঘরে উঠব—তারপরে একদিন শেষ মাটির শরণ—কেমন আছ তোমার খবর অনেক দিন পাইনি। ইতি ১৩।৩।৩৫

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল উৎসব শেষ হয়ে গেল। তুমি থাকলে নাচগান দেখে খুশি হতে পারতে। আমিও খুসি হতাম। আজ থেকে আমার ছুটি। আগামী কাল কলকাতায় রওনা হচ্চি কিন্তু তিনচার দিনের মধ্যে ফিরতে হবে, কারণ ঢাকা থেকে ওদুদ আসচে ২৬ তারিখে এখানে বক্তৃতা দেবার উপলক্ষ্যে। তারপরে কোথাও অবকাশ বা আরামের সন্ধানে দৌড় মারব। লক্ষ্ণৌ থাকাকালে আমার একজন শ্যালক, তিনি প্রফুল্ল ঠাকুরেরও উক্ত সম্পর্কীয়) প্রস্তাব করেছিলেন, ডেরাডুনের প্রাসাদে আমার গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের। শ্যালক জায়া আমার সেবার ভার নিতে প্রস্তুত ছিলেন, পাকা খবর দিই নি কিন্তু কচিৎ সম্ভবপর ভাবী ঘটনার মধ্যে এও একটি। আপত্তির কারণ, দূরত্ব। পুরীতে নীলরতন বাবুর মেয়ের একটি ভালো বাড়ি আছে সেখানে যাবার জন্যে অনেক বার তার অনুরোধ পেয়েছি। সেখানে যাত্রাও সহজ, ব্যবস্থাও ভালো, সমুদ্রের হাওয়াও আমার পক্ষে পথ্য। একদা কালিংপং পর্ব্বতে সুধীন্দ্রদের বাড়িতে আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম, ইচ্ছা করলে যেতে পারি। মুস্কিল এই, বয়স যত বাড়চে ততই শরীর রক্ষার ও মানসিক শান্তিরক্ষার নানা অভ্যাস পাকা হয়ে এসেচে, এই জন্যে স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টনে থাকতে হয়। বন্ধুদের আতিথ্যকে নানাবিধ দাবীর দ্বারা ভারাক্রান্ত করতে অত্যন্ত অনিচ্ছা হয়। আমি গেলে তোমরা বিব্রত হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই। তারপরে যে শিব কেদারনাথ, যিনি মাঠের শিব আমি তাঁরি চেলা, ভালোবাসি সমতল দেশকে, মাথা উঁচু পাহাড়ের নজরবন্দী আমার

বেশি দিন সয় না, তা ছাড়া সারাদিন শীতবস্ত্রের আবেষ্টনকে আমি দৌরাত্ম্য বলেই মনে করি। তোমাদের ওখানে যাত্রাপথ কীরকম সেটা জানিয়ো। নিশ্চয় জানি যথেষ্ট যত্ন পাব,—কিন্তু বয়সোচিত পরনির্ভরতাবশত দুটি একটি অনুচর অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে স্পৃহনীয়তা কিছু নেই আছে কেবল বিশুদ্ধ উপদ্রব। আমাকে আশ্রয় দেবার গুরুত্ব দুঃসহ হবারই কথা।

যদি আমার পুরীতে যাওয়া নিশ্চিত হয় সেখানে তোমাদের আসা কি অভাবনীয়? তা যদি হয়, তাহলে বর্ষায় যখন তোমাদের গিরিব্রজ মেঘাবৃত বারিধারাগুণ্ঠিত হবে তখন শান্তিনিকেতনে আমাদের বর্ষা উৎসবে যোগ দিতে এসো। এখানে আমার একটি মাটির কোঠা তৈরী হচ্ছে সেটাও দর্শনযোগ্য।

আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ। ইতি ২১।৩।৩৫ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৫ সাল থেকে আর বিশেষ দেখা করবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমার নূতন জীবনে নানা কর্তব্য পালনের চেষ্টায় কলকাতায় এলেও শান্তিনিকেতন যাওয়া হয়ে উঠত না। আমি বুঝতে পারছিলাম উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, তাই ভাবলুম একবার কবিকে নিমন্ত্রণ করা যাক আমার বাড়ি আসতে, আমি তাই লিখলুম আপনি এখানে না এলে বুঝবেন কি করে আমি কেমন আছি।

তবে দুর্ভাবনা তো কম নয়। আমরা যেখানে থাকি দার্জিলিং জেলায়, মংপু পাহাড়ে সিনকোনা চাষের ক্ষেত্র। সেখানকার পথ অতি দুর্গম। গভীর আদিম অরণ্যের মাঝে মাঝে চাষের জমি। প্রায় ছয় মাইল খাড়া পথ অত্যন্ত সরু, কোনোমতে একটা গাড়ি যায়। একদিকে পাহাড় উঠে গেছে অন্যদিকে গভীর খাদ। মিটার গজ ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে রিয়াং নামে একটি ছোট স্টেশনে পৌছতে হয়। ঐখান দিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে রোপ-ওয়ে চলেছে, আর ট্রেন 'লুপ' লাইন উপরে উঠছে। এই স্টেশনটি থেকে শিলিগুড়ি কালিংপঙের মোটর রাস্তায় উঠে এসে রিয়াং নদীর উপর একটা ব্রীজ পার হতে হয়।- ঐ ব্রীজ এমন নড়বড়ে যে আরোহী সুদ্ধ গাড়ি পার হয় না। গাড়ি থেকে নেমে আরোহীরা হেঁটে পার হন। অবশ্য শিলিগুড়ি থেকে সোজা মোটরে আসাও যায়।

মংপুতে পোস্ট অফিস আছে, টেলিগ্রাফ অফিস নেই, টেলিফোন নেই, ডাক্তার প্রায় নেই বললেই হয়, আছেন খুবই অনভিজ্ঞ একজন এল এম এফ

ডাক্তার। কুলী মজুরের প্রাণের মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন সেইটুকু সরকারী ব্যবস্থা। ঔষধ আসে ১৮ মাইল দূর থেকে। আমাদেরও প্রাণ তারই উপর সমর্পিত। এমন জায়গায় ৭৭।৭৮ বছরের দুর্বল শরীর বিশ্ববরেণ্য মানুষকে ডাকবার অসম সাহস হয়েছিল কি করে আজ তাই ভাবি। আমার পিতার অধ্যাপক ও পরে সহকর্মী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, কবি বারবার মংপু আসছেন দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এত sensitive মানুষকে এতদিন সন্তুষ্ট রাখল কি করে মৈত্রেয়ী? উনি যে অত্যন্ত sensitive ছিলেন তা অনুমেয় এবং অতি সামান্য সূক্ষ্ম ব্যাপারে ওঁর মন যখন বিরূপ হত অন্যদের পক্ষে তা বোঝাই শক্ত ছিল যে কোথায় আঘাত লাগল।

উপরে উদ্ধৃত তিনখানি চিঠি থেকে আমি বুঝতে পারলাম মংপুতে আসতে যে তাঁর ইচ্ছে নেই তা নয়, কিন্তু দ্বিধা আছে। ভাবছেন আমরা বিব্রত হব, আতিথ্যের দায় বহন করতে পারব কিনা। যে নিমন্ত্রণগুলির কথা লিখেছেন সেখানে তো শুধু বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে কারু সংসারে আতিথ্য নয়। পরে কালিংপঙে সপরিবারে কয়েকবার বীরেন্দ্রকিশোরের প্রাসাদোপম শূন্য বাড়িতে নিজেদের ব্যবস্থায় থেকেছিলেন। তখন সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায়ই দেখা করতে আসতেন ও মহাভারতের গল্প হত। এখানে যে মাটির কোঠার উল্লেখ আছে সেটি 'শ্যামলী'।

পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠিতে কাশী যাওয়া সম্বন্ধে কবি অনেক আক্ষেপ করেছেন বটে, ক্লান্তিও তাঁর আছে কিন্তু চুপ করে বসে থাকাও তাঁর চলে না। এ চিঠিতে কাশী যাওয়ার যে প্রসঙ্গ আছে সে সম্বন্ধে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীতে লিখছেন —"ইতিমধ্যে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবির আহ্বান আসিয়াছে, সেখানে কন্‌ভোকেশন বা সমাবর্তন উৎসবে তাঁহাকে পৌরহিত্য করিতে হইবে। সেই সঙ্গে কাশীতে থিওজফিক্যাল সমাজের নব প্রতিষ্ঠিত মণ্টেসরি স্কুল উন্মোচন করিবার জন্যও অনুরোধ আসিয়াছে। যাত্রার আয়োজন হইয়াছে; এমন সময় সংবাদ আসিল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার মদনমোহন মালব্য অসুস্থ হওয়ায় সমাবর্তন উৎসব স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু কবির মন যখন একবার চলিতে সুরু করিয়াছে তখন তাহাকে ফিরানো কঠিন। তিনি তাঁহার সেক্রেটারী অনিল-কুমারকে লইয়া কাশী রওনা হইয়া গেলেন (২৯ নভেম্বর ১৯৩৪) কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দুইদিন ও রাজঘাট বিদ্যালয়ে দুই দিন কাটাইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।"

এইবার নানা কথা বিবেচনা করে আমার স্বামীকেও একটি পত্র লিখতে

বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখতে হবে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি তো বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর প্রধান কথা কোন ভাষায় লেখা হবে? যা হোক শেষ পর্যন্ত যুগ্ম সইতে একটি চিঠি গেল।

আত্মীয়স্বজন যখন শুনলেন মংপুতে আমাদের বাড়িতে অর্থাৎ আমাদের সংসারে রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবেন তখন সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন। সবচেয়ে মনে পড়ে আমার স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতার কথা, একদিকে আনন্দ অন্যদিকে দুশ্চিন্তায় তিনি অভিভূত। বললেন "মনির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাবেন! কী আশ্চর্য কথা, তোমরা যে ছেলেমানুষ, গরীব মানুষ, যত্ন করতে পারবে কি করে?" দুশ্চিন্তায় তাঁর বোধ হয় মাথা ঘুরে উঠলো। বললেন "বৌমা একটা বালিশ দাও তো!" বলে শুয়ে পড়লেন। আমি বললাম, "মা উনি যদি সত্যিই আসেন তবে আমরা খুব ভালো করেই তাঁর সেবা করব।

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাদের দুজনেরই জোড়া নিমন্ত্রণ পেয়ে আমার অভ্যর্থনা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলুম। আজকাল শরীরটা নড়া দাঁতের মতো হয়ে উঠেছে, তাকে অল্প একটু নাড়াতে গেলেই চমকে উঠতে হয়—এমন কি হাওড়া প্ল্যাটফর্ম পার হবার মতোও বীর্য্যের অভাব। এই জন্যে ডেরাডুন পুরী উটি প্রভৃতি আমন্ত্রণের ফর্দ্দে লাল পেন্সিলের উচ্ছেদ চিহ্ন কাটতে হয়েছে। শেষে স্থির করেছিলুম গঙ্গার ঘাটে, আমাদের বোটে আশ্রয় নেব। এখানে আমার জন্মদিন অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি। তারপরে তোমাদের আহ্বানের বিচার করব। আশা করি আমার গ্রহনক্ষত্র আনুকূল্য করবে। তাদের পরে আমার খুব বেশি বিশ্বাস নেই। আমার তরফে ইচ্ছার অভাব ঘটবে না। তোমাদের নতুন ঘরকন্নার মধ্যে আমার সেবাশুশ্রূষার প্রাচুর্য্য কল্পনা করে প্রলুব্ধ হয়েছি।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—২৬।৩।৩৮ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—

একটা কথা বলে রাখি, আমার ভাগ্যদেবতা অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত—আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আশা রেখো না।

এখানে বলতে হয় ভাগ্যদেবতাই যে সব সময় ভ্রমণসূচীর উপর আক্রমণ চালান তা নয়—নানা সামান্য ঘটনায় মনমেজাজের পরিবর্তন হয়—যাঁরা তাঁকে ভালোমতো চেনেন না তাঁদের তাই অভিমানের দুঃখের কারণ ঘটে।

মনে পড়ে অনেকদিন আগে একবার বিদেশ যাত্রার আয়োজনে কলকাতায় এসেছেন, ঠিক কোন সাল ও কোথায় গন্তব্যস্থান তা আমার মনে পড়ছে না। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে ভোরবেলা জাহাজ ছাড়বে। আগের দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি জোড়াসাঁকোয় বসে আছি। কত লোক আসছে যাচ্ছে আমি গল্প শুনছি—একবার জাপান যাবার পথে জাহাজে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে—বড় বড় ঢেউ ডেকের উপর দিয়ে প্রপাতের মত পড়ে ভেসে যাচ্ছে—জাহাজের ঘূর্ণী নাচনে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কবি বসে আছেন কেবিনে নিশ্চিন্ত। মনে মনে ঠিক করেছেন বোটে ভাসমান হয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কখনো করবেন না। এই অভিজ্ঞতার একটি সুন্দর বর্ণনা জাপান যাত্রীর পত্রে আছে—সেই অভাবনীয় বর্ণনায় প্রলয়ঙ্করের সঙ্গে শান্ত শিবের মিলন ঘটেছে। এ সব গল্প শুনে একটু রাত করেই আমরা বাড়ি ফিরেছি। পরের দিন সকালে প্রিনসেপ ঘাটে যাব বিদায় দিতে বাবা আর আমি—আমি সঙ্গে নিয়েছি এক গুচ্ছ রক্তকরবী, খুব কুলীন ফুল নয় তবে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে—অমল হোম একটি বড় পদ্ম ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছেন—আমরা সবাই ঘাটে অপেক্ষা করে আছি কখন কবি আসবেন, প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছি, কিন্তু তিনি আসছেন না, শেষ পর্যন্ত প্রত্যূষের কুয়াশা ভেদ করে তপ্ত রৌদ্র উঠে এল। জাহাজের পাটাতন তুলে নিচ্ছে তখন আমরা বুঝলাম, আজ আর কবির যাওয়া হল না। কি কারণে এ অঘটন ঘটল কে জানে, কাল রাত্রি পর্যন্ত যাওয়া স্থির, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হতে পারে। আমরা তো সদলবলে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হলাম—সেখানে পৌঁছে দেখি তেতালায় ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে লিখছেন—আমাকে দেখেই বললেন, যে চোখের জল জমা করে নিয়ে গিয়েছিলে হায় হায় তা বিসর্জনের সুযোগ হল না!

যাওয়া হল না বোঝা গেল, কিন্তু কি কারণে তা কেউই জিজ্ঞাসা করছে না। তারপর আস্তে আস্তে অনেকে চলে গেলেন—আমার ধৈর্যের বাঁধ যখন ভাঙ্গে ভাঙ্গে তখন বললেন যে, আগের রাত্রে আমরা চলে যাবার পর অপূর্ব চন্দ এসে খবর দিয়েছেন যে তিনি নিজে জাহাজে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, জাহাজে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম নেই। কবি বললেন, তখনই যাওয়া ক্যানসেল করে দিলুম। এই প্রসঙ্গে তাঁর অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা বললেন, একবার জাহাজে বাথরুমের জন্য

কিউ করে দাঁড়াতে হয়েছে—দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ একটা লোক এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল—উনি পড়ে গেলেন। সেই বিশ্রী অভিজ্ঞতার পর ওঁর আর ইচ্ছে নেই যে ঐ রকম ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলির সম্ভাবনার ধারে কাছে যান।

আমি বললাম আপনারও তো তখন অল্প বয়স ছিল, গায়েও শক্তি ছিল, আপনিও তো ধাক্কা দিতে পারতেন। উনি হাসছেন মৃদু মৃদু—কোনো বয়সেই ওর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, অভদ্রতার উত্তরে অভদ্রতা, অশালীনতার উত্তরে অশালীনতা, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা হবে না। তাঁর "বড় আমি"ই যে শুধু ঊর্ধ্বমুখী তা নয় তাঁর "ছোট আমি"ও এ কাজ করতে অপারগ!

সেদিন সারা দুপুর জোড়াসাঁকোয় খুব আনন্দে কেটেছিল—আমার রক্ত-করবীর গুচ্ছটিকে কবি খুব সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তার একটি বৃন্ত ভেঙে বলেছিলেন, এসো চুলে পরো—বেঁধে তোল বেণীবন্ধনে। অমল হোম প্রসন্ন হেসে বললেন, এইবারে নন্দিনীকে পাওয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাওয়ার সময় স্টেশনে বিদায় দিতে আর একবার গিয়েছিলাম—যতদূর মনে পড়ে সেবার হায়দ্রাবাদ যাচ্ছিলেন—বড় কামরা, সঙ্গে আরো ২।৩ জন ছিলেন, তাঁরা যে কে আমার মনে নেই। কারণ সত্যি কথা বলতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে আর কারু দিকে বড় একটা নজর পড়ত না। স্টেশনে অনেক লোক, আমার ইচ্ছা ছিল কামরায় ঢুকে একটু বসি কিন্তু সাহস হচ্ছিল না, বড় বড় মান্যগণ্য কত মানুষ। কিন্তু কবি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন—কিছুদিন পরে আমায় একখানা ছবি কেউ দিয়েছিলেন—ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে আছেন—আমার মনে হয়েছিল সেটা ঐ দিন তোলা, আমি তার নীচে কিছু লিখে দিতে বলায়—লিখলেন—

চলে যাবে সত্তারূপ রচিত যা প্রাণেতে কায়াতে
রেখে যাবে মায়ারূপ রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

একথা কি সত্য? সত্তারূপ কি চলে গেছে—শুধু ছবিটাই পড়ে আছে—আলো ছায়ায় গাঁথা? হায় ছবি তুমি শুধু ছবি?

আমার তো একথা বিশ্বাস হয় না—আমার তো মনে হয় সেই মরণহীন সত্তা বার বার তাঁর পাঠকদের মনে পুনর্জন্ম লাভ করছে।

ওঁ

On Board
Houseboat "PADMA"

কল্যাণীয়াসু

আজ বিশে তারিখে তোমার চিঠি পেলুম। আমি বোটে আছি চন্দন-নগরে। ২৯শে তারিখে এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে প্রথমে জোড়াসাঁকোয় উঠব—দুই একদিন পরে যাব বরানগরে। সেখানে দুই একদিন থেকে যাব শান্তিনিকেতনে। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয় তাহলে খুবই দুঃখিত হব। তুমি কি ৩০শে তারিখের পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান করবে? চন্দননগরে ক্ষণকালের জন্য তোমার আসবার কি কোনো সম্ভাবনা আছে? বোটটা দেখে যাও না। এই বোটেই আমার সাধনার যুগ, সোনার তরীর যুগ কেটেছে। কত লেখা লিখেছি কত চিন্তা করেছি তার অন্ত নেই।

জোড়াসাঁকোয় আমাদের দরোয়ানের নাম জয়নারান। তার হাতে মধুর বোতল দিলে সেটা আমি নিঃসন্দেহে পাব। তুমি নিজে এসে যদি দিতে পারো তাহলে আরো ভালো। ইতি ২০ জুন ১৯৩১ স্নেহানুরক্ত

চন্দননগর ঠিকানা দিলেই চিঠি পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দননগরে এই বোট দেখবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারিনি। চালক ছাড়া চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলাম না তখনও।

যতদূর মনে হয় এই সময়েই বোটে দেখা করতে গিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস বনফুল প্রভৃতি। এই বোটে অবশ্য কয়েকবার আমার বেড়াবার সুযোগ হয়েছে, সে বর্ণনা পরে লিখব।

ওঁ

On Board
Houseboat "PADMA"

কল্যাণীয়াসু

আবার বিঘ্ন ঘটল। তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে রবিবার রাত্রে জোড়াসাঁকোয় যাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। ভেবেছিলুম সোম মঙ্গল সেখানে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব। আজ জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল, সৌম্যরা জোড়াসাঁকো বাড়ির তাদের অংশ কয়েকদিনের জন্য মাড়োয়ারিদের ভাড়া দিয়েছে—সেখানে তাদের বিয়ের ধুম পড়ে গেছে। মাড়োয়ারির বিয়ে

বরকনের পক্ষে যেমনই হোক বাড়ির বাসিন্দাদের পক্ষে সহনীয় নয়। সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—আমাকে বারণ করেছে যেতে। সোমবার অপরাহ্ণের দিকে বরানগরে গিয়ে উঠব। বৃহস্পতিবারে যাব বোলপুরে। তুমি সেখানে গিয়ে একবার দেখা দিয়ে আসতে পারবে কি? যদি সম্ভব না হয় তাহলে এ যাত্রায় তোমার সঙ্গে দেখার আশা রইল না। শান্তিনিকেতনে একবার নববর্ষার সমারোহ যদি দেখতে যাও তাহলে মন্দ হয় না। এখানে গঙ্গার দুই তীরে খুব ঘন হয়ে বর্ষা নেমেছে। লাগ্‌চে ভালো। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অবারিত প্রান্তরে বর্ষার আসর যেরকম জমে এমন আর কোথাও না। তুমি আমাদের নিম্নভূমিতে কতদিন যাপন করবে—বোধকরি শরতের আগে ফিরবে না। ইতি

২৭ জুন ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

On Board
Houseboat "PADMA"

কল্যাণীয়াসু

জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল মাড়োয়ারিয়া ঠাণ্ডা হয়েছে—পুলিস শৈত্য বিধান করেচে। সোমবার মধ্যাহ্নে যদি জোড়াসাঁকোয় আসতে পারো খুসি হব—সন্ধ্যাবেলায় রবি অন্তর্দ্ধান করবেন। ইতি ২৯ জুন ১৯৩৫ স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ এই চিঠিগুলি হাতে নিয়ে সেই বিস্ময়কর সময়ে মন ফিরে যাচ্ছে। চিঠিগুলি সামান্য। কোনো গুরুতর কথা নেই, তত্ত্ব নেই বিতর্ক নেই বাণী নেই। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার মত একটি সামান্য মানুষের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কতদূর থেকে আসছেন। তিনি জানেন আমার কত অসুবিধা, অত করে ডাকা সত্ত্বেও আমি পদ্মাবোটে যেতে পারলুম না। নানা দিকে কর্তব্য জালে আমি জড়িত। ইচ্ছে করলেই আমি যেতে পারিনে, তাই উনি নিজেই আসছেন। কী জানি কেন আমার বরাবর মনে হত তিনি যেন উদাসীন, কে এল কে গেল তা উনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু এই চিঠিগুলি আজ আবার পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে তা তো নয়, ক্ষুদ্র মানুষের ভক্তি ভালোবাসার শিশিরবিন্দুর মধ্যে এ যে তপনের ধরা দেওয়া!

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ফিরে এসেছি। রেলগাড়ির নাড়া খেয়ে আমার প্রাণপুরুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেচে। তাই শয়ান অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছি—আমার উত্থান একাদশীর তিথি কবে পড়বে নিশ্চিত জানিনে। চলৎশক্তি যখন অবাধ হবে তখন তোমাদের ওখানে যাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব। আপাতত কল্পনাবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোনো মনোবৃত্তি বা দেহশক্তি ভ্রমণপটু অবস্থায় নেই।

৭ বৈশাখ ১৩৩৬ শুভাকাঙ্ক্ষী
(১৯৩৫ ?) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার শরীরের জন্যে যদি উদ্বেগ অনুভব করতে আরম্ভ করো তাহলে কোথাও তার শেষ পাবে না। এই শিথিলগ্রন্থি শরীর এখন থেকে থেকে নড়ে উঠবে, পড়ে যাবে পথের মাঝখানে, এ যে অনিবার্য্য। এতদিন মাঝে মাঝে ক্লান্তি অনুভব করেছি কিন্তু শরীরযন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ অনুগত ছিল। এবার কয়েকদিন মনে হোলো তাদেরও মধ্যে কোনো কোনো বিদ্রোহী বা সত্যাগ্রহ করতে সুরু করবে—সে জন্যে প্রস্তুত থাকা চাই। এবারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনকে বলেছিলুম, আর নয়, দেহটাকে এখনো বিশ্বাস করা হবে মূঢ়তা। অবশেষে কিছুদিন পরে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলুম, মনের সঙ্গে যা রফা নিষ্পত্তি করেছিলুম দেখতে দেখতে সেটা অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তথাপি আগেকার চেয়ে সাবধান হয়েছি। এখনো প্রত্যেক ডাকে চিঠি আসচে message চাই, forward চাই, কবিতা চাই, প্রবন্ধ চাই, শিশু সন্তানের নাম চাই, আসন্ন বিবাহের আনন্দগীতি চাই, পরকাল সম্বন্ধে অভিমত চাই, ঈশ্বর দয়াময় কিনা আমার কাছে তার সার্টিফিকেট চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বাভ্যাসের ঝোঁকে দৈবাৎ তার কোনো কোনোটার জবাব দিয়ে ফেলি কিন্তু অনেকগুলোর দিইও না। যখন খ্যাতি রটে যাবে এই সকল সামাজিক কর্ত্তব্যে আমি পরাঙ্মুখ তখন পোস্ট আফিসের ইন্‌কম্ যথেষ্ট কমবে, আমিও নির্জনে মুক্তির সাধনায় অব্যাহতভাবে প্রবৃত্ত হতে পারব।

এখানে কয়দিন প্রবল বর্ষণ চলেছে। আজ ভাদ্র মাসের আরম্ভে শরতের মেঘাবগুণ্ঠন একটুখানি উঠেছে। তবু বলা যায় না। এবারকার বাদলটা পূর্ব্বদিক-

বাহিনী নয়—পশ্চিম আকাশের প্রান্তে অপেক্ষা করচে, তার বর্ষণের নেশা জমে অপরাহ্ণের দিকে। তোমাদের ওখানে তার আক্রমণ বোধহয় খুবই প্রবল, গিরি-নদীর মতো তোমাকে কি নীচের দিকে প্রবাহিত করে আনবে না? ইতি

২৩ অগস্ট ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। কিছুদিন হল বিশেষভাবে অসুস্থ হয়েছিলুম কিন্তু আমার শরীরটা ব্যামোকে প্রশ্রয় দেয় না, তাই আজ পর্যন্ত টিঁকে আছি এবং কাজকর্ম্মও করে যাচ্ছি। ভয় হচ্চে হয়তো বাঁচতে হবে অনেকদিন।

ইতিমধ্যে রাজা অভিনয় করেছি, ৭ই পৌষের উৎসবও সমাধা করতে হোলো ---দেশ বিদেশের অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনার ভারও নিতে হয়েছে। তিন দিন ধরে বিষম জনতা ও কলরবের পরে আজ আশ্রম কিছু পরিমাণে শান্তি লাভ করতে পারল। দুই একজন অতিথি আছে কিন্তু অত্যন্ত পরিদৃশ্যমান নয়। তাদেরও মেয়াদ ফুরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে পুনশ্চ আমার কলকাতায় যাওয়া সম্ভবপর হবে না। এইখানেই দিন কাটবে, অত্যন্ত মনোহর দিনগুলি। বসন্তের হাওয়ার চেয়ে শীতের রৌদ্দুরের নেশা আমার কাছে প্রবলতর।

তুমি যদি কোনো অবকাশে শান্তিনিকেতনে আসতে পারো তো খুসি হব। লোক সঙ্গের আশঙ্কা কোরো না, এখানে নিভৃত স্থান আছে।

তোমাদের মৌচাকের মধু যদি সঙ্গে করে আনতে পারো তাহলে সবচেয়ে ভালো, নতুবা জোড়াসাঁকোয় জয়নারায়ণ নামে দারোয়ান আছে তার হাতে দিলে সে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। ইতি ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি হয়তো জানুয়ারীর শেষভাগে কলকাতায় যাব। ততদিন তুমি যদি নিম্নভূমিতে থেকে যাও তাহলে দেখা হতেও পারে।

দ্বারীর হাতে মধু যদি দিয়ে থাক ঠিক জায়গায় এসে পৌছবে। ইতি

৬ জানুয়ারী ১৯৩৬ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

জানি তুমি দুঃখিত হবে কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। ৯/১০ই মে তারিখের কাছাকাছি এণ্ড্রুজ সাহেব আমার এখানে আসবেন—জরুরী কাজ আছে এবং সে কাজ সময়সাধ্য। এই হোলো নম্বর এক—এই যথেষ্ট। তবু আর একটি বাধাও আছে। রথী বৌমা গেছেন দূরদেশে। এখানে কয়েকটি বালিকা আছে তাদের এখানে একলা ফেলে যাওয়া বা কোথাও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আমি একমাত্র অভিভাবক। তারাও স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্গত।

আমার জন্মোৎসব নিয়ে এখানকার স্বজন পরিজনরা ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের সেই খেলায় আমাকে সাজতে হবে পুতুল—আমি নিষ্ক্রিয়ভাবে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করব—কাতরস্বরে বলব যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ বৎসর বৈশাখ এখনো রুদ্রমূর্তি ধরেনি—মাঝে মাঝে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবহার করে। কাজকর্ম্ম চল্‌চে পুরো বেগে। সমাধা করে ছুটি পেতে দেরি লাগবে।

তোমার নতুন সংসারে তোমার লক্ষ্মীর আসন তুমি বিছিয়ে নিয়েচ শুনলে খুসি হবো। ইতি ১৩ বৈশাখ ১৩৪২ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

6 Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta
Phone: B. B. 3995

কল্যাণীয়াসু

আমি যেখানে আছি এ জায়গাটা অত্যন্ত দুর্গম নয়। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বেয়ে সিধে আসা যায়। এ বাড়িটার নাম গুপ্ত নিবাস। বেলঘরিয়া। টেলিফোন নম্বর Regent 511

যদি আসতে পারো খুসি হব। ইতি বুধবার শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

On Board
Padma

কল্যাণীয়াসু

আমি এখান থেকে ৩০শে রাত্রে জোড়াসাঁকোয় রওনা হব। বেশিমাত্রায় দুর্যোগ হলে তার পরদিন প্রাতে। সোম ও মঙ্গলবারে কলকাতায় থাকব। তারপর একদিন বরানগরে থেকে শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব। আশা করি তুমি তার পূর্ব্বেই অন্তর্ধান করবে না। ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩৪২

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে এখন ছুটি। বৌমা পুপেকে নিয়ে চলে গেছেন পুরীতে। কোথাও বেরিয়ে পড়বার মতো উদ্যম নেই আমার দেহে মনে—কলকাতায় আমার শূন্য বাসা পড়ে আছে, আমার জন্যে তার কেনো প্রতীক্ষা নেই। কলকাতায় যাওয়া হবে না। সেখানে যেতে ক্লান্তি এবং সে ক্লান্তি দূর করবার মতো কোনো শুশ্রূষা সেখানে নেই। মনে হচ্ছে দীর্ঘকাল কোথাও যাওয়া আসা আমার চলবে না। দুর্ব্বল শরীরের দাবীতে এই যে আমার নিশ্চলতা এ আমার লাগচে ভালো। শরীর যে জগৎটাকে বেষ্টন করে আছে, তার বাইরে গিয়ে পৌছন সহজ হয়েছে। সকাল বেলাকার আলোর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসি, এবং রাত্রের অন্ধকারে, তখন পাই বিরাট একটা ছুটি। ক্রমে ক্রমে এরই মধ্যে পাব চরম মুক্তি এইটে অনুভব করি। এখানে শরতের আবির্ভাব হোলো—এই ঋতুর নির্ম্মলতায় মন যেন অবগাহন স্নানের অবকাশ পায়। শান্তিনিকেতনে শরৎকালের অভ্যর্থনা খুব, পরিপূর্ণ। যদি কখনো আসতে পারো খুসি হবে।

আমার জীবনটা দিনে দিনে নৈষ্কর্ম্মের নেপথ্যে সরে যাচ্ছে। সামান্য কাজেও মন বিমুখ হয়েছে। তবু জনতার দাবী মেটে না। তুচ্ছ অনুরোধের অন্ত নেই। সৌজন্যের খ্যাতিটাকে এবার বর্জ্জন করব। নিরুত্তর হয়ে থাকব। সবাই বলবে লোকটার ভারি অহঙ্কার। বেশি ক্ষতি হবে না। কেন না যাই করি লোক-নিন্দা আমাকে অনুসরণ করবেই। একদিন ছিল যখন তাতে বিচলিত হতম-

এখন বোধহয় উদাসীন হয়েছে মন। এখন থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত কি কলকাতাতেই যাপন করবে?

স্নেহরত

শুক্লা অষ্টমী আশ্বিন
১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তোমার বাগানের চাকের মধু এসে পৌঁছেছে। আমার পূর্ব্ব সঞ্চয় প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় পেয়ে খুসি হলুম। মুখে দিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে সিন্‌কোনার* পরিচয় নেই। পুষ্প বিকাশে যেখানে গাছের কবিত্ব সেখানে বোধকরি তিক্তরসের উপদ্রব ঘটে না। আজকাল এখানে শীত পড়েছে হৈমালয়িক মাত্রায়। উত্তর দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে বর্গির দৌরাত্ম্যের মতো। খাজনা আদায় করচে গাছপালার ডালে ডালে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে। শীতের প্রতাপ একে বলা যেতে পারে না, অপ্রতাপ বলাই উচিত। তোমাদের ওখানে জীবলোকে না জানি কি রকম কম্পান্বিত অবস্থা। ইতি ৯।১।৩৭

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৪-এর পর থেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র ছাড়া কবির সঙ্গে আমার যোগাযোগের উপায় ছিল না। চিঠিপত্রও বেশি লিখতে আমার সংকোচ হত। যখন কলকাতায় আসতুম দৈবাৎ তখন তিনিও কলকাতায় এলে এবং জোড়াসাঁকোয় আসতে পারলে যেতুম। একদিক থেকে এই সময়টা ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক নানা আন্দোলনে দেশ মুখর। কবি কোনো দিনই তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওদিকে নৃত্যনাট্য ও নানা উৎসবের আয়োজন চলেছে। নৃত্যগীতের এমন একটি উৎস তৈরী হয়েছে যেখান থেকে সুরধারা আজ পর্যন্ত অবিরাম প্রবাহিত হয়ে এসে দেশকে প্লাবিত করেছে।

কলকাতায় আশুতোষ কলেজের প্রেক্ষাগৃহে সম্ভবত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য

* আমি যেখানে থাকতাম হিমালয়ের মংপু পাহাড়ে সিনকোনার চাষ হত ঐ ভেষজ থেকে কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

দেখে এসে আমার মা আমাকে লিখলেন, 'অভিনয়ের পরে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আমাদের সঙ্গে তোমাকে না দেখে ওঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল, বললেন, তোমরা কোথায় যে ওকে পাঠিয়ে দিলে ও আর এসব কিছু দেখতে পায় না।'

কবি যে নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে দেশবিদেশ পরিক্রমা করতেন তার উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ হলেও সেটাই একমাত্র নয়। এই বিশেষ শিল্পের দ্বারা তাঁর রচনা আরো সম্পূর্ণ হয়েছে—এই রূপের খেলা রসের মেলায় তাঁর সৃষ্টি হয়েছে উজ্জ্বলতর।

গান্ধীজি মনে করলেন, এভাবে নেচে গেয়ে অর্থ উপার্জন কবির পক্ষে শারীরিক মানসিক দুঃখকর। গান্ধীজি শুধু হাতে ঘরে বসেই টাকা তুলতে পারতেন। লোকে টাকা দিয়ে যেত। তিনি ষাট হাজার টাকা তুলে রবীন্দ্রনাথকে দিলেন। বললেন, এবার আর দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে ঘুরবেন না। কিন্তু নাচগানের উৎস শুকায় নি।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দু তিন দিন ধরে অতল স্পর্শে নেমেছিলুম—আমাকে ডাঙায় টেনে তুলেছে। এখন পরিচিত সংসারের স্পর্শ আরো নিবিড় করে পেয়েছি। সবচেয়ে পেয়েছি তোমাদের স্নিগ্ধ হৃদয়ের বেদনার দান। দায়িত্বের যে সব বোঝা কাঁধের উপর চেপে বসেছে ঝেড়ে ফেলতে পারলে আরাম পেতুম। সবচেয়ে দুঃসহ বোঝা নিজের খ্যাতি। প্রায় মনে পড়ে সেই পদ্মাতীরের জীবনযাত্রা—সেদিনকার খ্যাতিভারহীন যৌবনের স্বপ্ন প্রয়াণ।

চিকিৎসার উত্তরকাণ্ড চলচে। আর দিন দশেকের মধ্যে ছুটি পাওয়া যাবে আশা করচি। তারপরে যাব চলে শান্তিনিকেতনে। ১।১১।৩৭

আমার আশীর্বাদ

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী তোমার পাঠানো লেবুগুলি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। ভালো অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। তোমাকে স্মরণ করে অনতিবিলম্বে ভোগে লাগাব। এবার

কিছু দীর্ঘকাল কলকাতার কাছে বেলঘরিয়ায় আটকা পড়েছিলুম—নীলরতনবাবু চিকিৎসার জালে আমাকে জড়িয়েছিলেন। একস্ রে প্রভৃতি অত্যাধুনিক আলোকবান রুগ্ন অঙ্গের পরে বর্ষণ চলছিল—বিচক্ষণদের মতে এতে রোগের মূল ধ্বংস হবে। আমি তো জানি প্রাণটাই রোগের মূল মৃত্যুর আহ্বান কর্ত্তা। যদিও স্বস্থানে চলে এসেছি তবুও সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই নি—মাসখানেক পরে পুনরায় যাবার কথা—কিন্তু কথা যথাসময়ে পালন করব বলে বিশ্বাস হচ্চে না।

শীত পড়ে আসচে, তোমাদের হিমনিবাস থেকে বোধহয় নেমে আসতে হবে। আমি সম্ভবত জানুয়ারির আরম্ভে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করব। সে সময় যদি সেখানে থাক তাহলে দেখা হবে।

আমার দেহ এবং মন দুইই এখন মন্দগতি—চলবার মধ্যে মাঝে মাঝে চলে তুলিবাহন আঙুলটা। ভাগ্যে চিত্রকলা আমার শেষ দশায় আমাকে বরণ করেছিল তাই আমার দিনান্ত কালটা নিবর্থক হচ্চে না। ছবির সুবিধা হচ্চে সমালোচকের ভিড় টানে না, খ্যাতি কোলাহলের বাইরে তার লীলাভূমি—জনসাধারণের কাছে কোনো জবাবদিহি নেই। ইতি ২০।১১ ৩৭ স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম চিঠিখানি কলকাতা থেকে লেখা, দ্বিতীয়খানা শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে।

এই চিঠি দুখানিতে যে অসুখের কথা আছে তা খুবই সাংঘাতিক। দীর্ঘদিন কবির কোনো বড়ো অসুখের কথা শুনি নি। তিনি কর্মক্লান্ত এই পর্যন্ত জানতাম। সকালে ভোর চারটেয় ওঠেন, সারাদিনে এতটুকু সময় শয্যা গ্রহণ করেন না। তারপর ক্রমাগত লোকজন আসছে—বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা, এইসব কারণে মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এইবারে একটা বড় রকমের অসুখ করল। তাঁর কানের পিছনে একটা শুকনো একজিমা ছিল (dry eczema)। কতদিনের পুরনো রোগ তা আমি বলতে পারব না। বিশেষ যত্ন করতেন না। তাঁর এইসব শারীরিক কষ্টের সেবাযত্ন করবার বিশেষ কেউ ছিলেন না। তবে বললে করবার লোকের অভাব ছিল না কিন্তু তিনি তো বলবার পাত্র নন বরং বাধা দেবেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সুধাকান্ত প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কোনার্ক বাড়িতে কবি একাই থাকতেন—দৈবক্রমে ঘটনাটা ঘটে সন্ধ্যাবেলায় যখন আরো দুচারজন উপস্থিত আছেন। অবস্থাটা

অতিশয় সাংঘাতিক হয়ে পড়ল, বোঝা গেল কানের একজিমাটা বিষাক্ত হয়ে ইরিসিপ্লাস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কবি।

কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার ও অন্যান্য ছোট বড় ডাক্তাররা ছুটলেন। পরদিন থেকে নিয়মিত বুলেটিন বেরুতে লাগল। দেশবিদেশ থেকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ জিজ্ঞাসা চলেছে। চীন দেশে তখন জাপানী আক্রমণে সকলে বিপর্যস্ত, সেখান থেকেও কুশল প্রশ্নের টেলিগ্রাফ এলো। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে সেবার দায়িত্ব নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। খবরের কাগজে রুগীর ঘরেব সমস্ত খবর বেরুত। হাস্য পরিহাস থেকে প্রত্যেক সেবক সেবিকাদেরও খবব পেতাম। আমার পক্ষে শান্তিনিকেতন যাওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি ভীড ঠেলে যেতে অনীহা অনুভব করলাম। আগেই লিখেছি আমি অত্যন্ত হীনমন্যতা রোগে ভুগতাম। আমি মংপুতে বসে একদিনের বাসি কাগজ খুঁটিয়ে পড়তাম। কিন্তু কোনো চিঠি লিখতেও সাহস করতাম না। সকলে এত ব্যস্ত কে আমার চিঠির উত্তর দেবে। একটি টেলিগ্রাফ করেছিলাম। রথীদা তার উত্তর দেন।

কবি একটু সুস্থ হলে আমার পিতা তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন।

শ্রীচরণেষু

··প্রার্থনা করি আপনি আমার প্রপিতামহের মতো সুস্থ ও কর্মঠ শরীরে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া থাকুন। আমার প্রপিতামহের নাম ছিল মদন কৃষ্ণ কবীন্দ্র। তিনি শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁর কবীন্দ্র উপাধি। তিনি মৃত্যুর একদিন পূর্বে নিজের হাত (নাড়ী ?) নিজে দেখিয়া মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়া তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার ভার পৌত্রদের উপর দিয়া ধ্যানস্থ হন···ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

···জীবনের তরুণ অবস্থায় আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে—সেই থেকে ভালোবাসায় ও ভক্তিতে আবদ্ধ আছি। বাংলাদেশের বহু সহস্র লোকেরই এই সুযোগ ঘটিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন নগণ্য পূজারী। আপনি সমস্ত পৃথিবীর ভরসার স্থল। বাঙালী বলিয়া বিশেষ করিয়া আপনি বাঙালীর একমাত্র সম্বল। আপনার জন্য দেশের শত সহস্র নরনারীর সঙ্গে নিরন্তর প্রার্থনা জাগিতেছে। প্রার্থনায় কোনো ফল হয় কিনা জানি না, মানুষের প্রাণের ইচ্ছায় বা চিন্তাতে যত্ন নিরপেক্ষভাবে প্রাকৃতিক জগতে কোনো পরিবর্তন হইতে পারে কিনা জানি না—ধার্মিকেরা বলেন পারে, আমাদের দেশের শাস্ত্র ও অন্য বহু জাতির ধর্মশাস্ত্রে বলে পারে কিন্তু কোনো প্রমাণ বা যুক্তি দেখা যায় না।· মনন

জ্ঞান ধ্যান ইচ্ছা ইহাদের কি জাতীয় সত্তা তাও জানি না, পদ দ্বারা প্রতিপাদ্য বলিয়া ইহারা পদার্থ কিন্তু তাহা ছাড়া ইহাদের অন্য লক্ষণ দেখা যায় না।... (কিন্তু) অরবিন্দ প্রভৃতির অলৌকিক তত্ত্ব বিশ্বাস একটিবার সত্য হোক বিশ্বের নিয়ম বন্ধন অন্ততঃ একটিবার শিথিল হোক এবং বিশ্বের নরনারীর সম্মিলিত প্রার্থনা আপনার দীর্ঘজীবন লাভের সহায় হৌক। সেকালে একজনের আয়ু অন্যকে দান করা যাইত, পুরু যযাতিকে তাহার জীবন দিয়াছিলেন এখন সেদিন থাকিলে আপনাকে আয়ু দেওয়ার এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত যে লাল পাগ্‌ড়ির ফৌজ লইয়া নাজিমুদ্দিনকে ছুটিয়া যাইতে হইত...

প্রণত

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সঙ্গে বাবা একটি কবিতাও পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথের চিঠি—

কল্যাণীয়েষু

অনেক দিন পরে তোমার হাতের কবিতা পেলুম। এতে কেবল রচনা মাধুর্য নয় তোমার হৃদয় মাধুর্য আছে। সেই রসে আমার চিত্ত অভিষিক্ত হল। আরোগ্যের পক্ষে তোমাদের শুভ কামনা নিষ্ফল হতে পারে কিন্তু তার মূল্য নষ্ট হতে পারে না। সেই মূল্য যথেষ্ট পেয়েছি আমার জীবনের ইতিহাসে সে তো অক্ষয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুর অন্ধকার প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করেছি পথের মধ্যে বৈতরণীতে স্নান করে এলুম। মনে হচ্ছে যেন অতীতের জীর্ণতা অনেকটা ধুয়ে আসতে পেরেছি। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ফিরে আসা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যদি ঘটে তবে অন্তত তখনকার মত অহমিকা শিথিল হয়ে আসে। কতদিন স্থায়ী হয় বলতে পারিনে। প্রিয়জনের মৃত্যুর পর বৈরাগ্য আসে নিজের মৃত্যুর সময় দেখি যে সব জিনিষ অত্যুক্তি করেছে। যাদের আমরা মিথ্যা মূল্য দিয়েছিলুম তাদের বিড়ম্বনা ধরা পড়ে কি জানি হয়ত ভুল বলছি। অসীমের ক্ষেত্রে সবই তো আপেক্ষিক যখন যা ভালো করে পেয়েছি তখন সেটাই সত্য। মৃত্যুর ব্যথা দেখে তাকে যেন অশ্রদ্ধা না করি। এখনো ডাক্তারি শাসনের মধ্যে বদ্ধ আছি। শরীরেরও বিদ্রোহ করবার সাধ্য নেই। তোমার কবিতাটি কাউকে দেখাতে বারণ করেছ—কিন্তু তোমার এই নিষেধ শোনবার যোগ্য নয়। আমার তো মনে হয় একে চাপা দিয়ে রাখায় প্রত্যবায় আছে।

ইতি ১৯।১০।১৭ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ কানের পিছনের রোগটি কিন্তু কোনো দিনই নির্মূল হয়নি। যখন আমার

কাছে ছিলেন প্রত্যহ ঔষধ লাগাতাম। সেই কারণে 'কর্ণধার' কবিতাটি লিখেছিলেন।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসে যে কবিতাগুলি লিখলেন সেগুলি 'প্রান্তিক' নামে একটি ছোট গ্রন্থে ছাপা হল।

ওঁ

Uttarayan
Shantiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

আমি কাল থেকে কিছুদিনের জন্যে সুরুলে শ্রীনিকেতনে আশ্রয় নিয়েছি। যদি এসো এখানে তোমার স্থানাভাব হবে না। বোলপুর আসবার তিনটি মাত্র ট্রেন আছে। তার মধ্যে যেটা সকাল ৯টার সময় ছাড়ে সেটাই সবচেয়ে সুবিধার। বোলপুর ষ্টেশনে বাস্ হাজির থাকে কোনো অসুবিধে হবে না। আগামী রবিবারে যদি আসতে পারো খুসি হবো। মৃত্যুপথ থেকে ফিরতি আমাকে দেখে হয়তো পুরোপুরি চিনতে পারবে না। ইতি ৩।১২।৩৭

স্নেহাকৃষ্ট
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে হয় এই চিঠি পাবার বেশ কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই মংপু থেকে এসেছিলাম। চলনদারও সংগ্রহ হল—বাবার প্রিয় ছাত্র শশী রাজী হলেন নিয়ে যেতে। ইতিপূর্বে তিনি রবীন্দ্র সকাশে বড় একটা যান নি। শশী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পরে তিনি ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন ও অকালে মারা গেছেন।

স্টেশনে প্রতিমাদেবী গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। প্রথমে সুরুলে না গিয়ে উত্তরায়ণে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে এইবারই প্রতিমাদি কয়েকটি কথা বললেন, যে রকম কথা আমি পূর্বে শুনি নি। প্রতিমাদি বললেন, বাবামশায় কিছুদিন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকতে চান না, এমন কি আমাদের সঙ্গে খাবেনও না—এখন দুর্বল শরীরে সুরুলে থাকতে চলে গেছেন। আমাদের পক্ষে এটা একটা সমস্যা—কী করে ওঁর দেখাশোনা করব বল?

আমি বিস্মিত হলাম। এতদিন আমি একটি মুগ্ধ ভক্ত ছোট মেয়ে ছিলাম—আমার মনটা ঘুরত কেবল কাব্যের জগতে—রবীন্দ্র কাব্যের ও ব্যক্তিস্বরূপের উপস্থিতির সৌরভে আমোদিত প্রজাপতির মত পাখা মেলে হাওয়ায় ঘুরে

বেড়াত। বাস্তব জীবনের, সংসারের বা এই অতি প্রিয় পরিবারের সমস্যার কথা সামান্যই জানতাম। এমন কি এখানে যে কোনো সমস্যাও থাকতে পারে তাই কোনোদিন ভাবি নি। এখন আমি সংসারী হয়েছি, এঁদের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী, এখন আমাকে অনেক কথাই বলা চলে। প্রতিমাদি বললেনও অনেক কথা। তবে তার মধ্যে রবীন্দ্র প্রসঙ্গটুকুই আমার আলোচ্য—তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণে থাকলেও রথীন্দ্রনাথের ঠাণ্ডা সুন্দর প্রাসাদোপম 'উদয়নে' থাকতে চান না। শ্যামলীর মত গরম বাসের অযোগ্য বাড়িতে থাকবেন, এমন কি ওঁর রান্না পর্যন্ত পৃথক করতে বলেন--ওঁর নিজের ভৃত্যরা ওঁর জন্য সামান্য কিছু রেঁধে দেবে। উনি ফ্রিজিডিয়ারের ফল খাবেন না। কোনো মহার্ঘ দ্রব্য খাবেন না— এ বাড়ির রান্নাও খাবেন না। প্রতিমাদির অনুরোধ, কবি আমাদের কথা কিছুটা শোনেন, তাই আমি যেন তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সুরুল থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসি।

এই ঘটনা আমি অন্যত্র বিস্তারিত লিখেছি—এখানেও কিছুটা উল্লেখ করছি। অতখানি অসুখের পর একলা থাকার এই অভিধান মোটেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। এবং একদিন নয় কয়েকবারই এ বিষয়ে কবির সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। দুপুরবেলা যখন সুরুল পৌঁছলাম তখন রৌদ্র প্রখর। শান্তিনিকেতন থেকে সুরুলে লালমাটির পথ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলল। বৃক্ষ রোপণ করে করে এখনকার শ্যামল শান্তিনিকেতন যাঁরা দেখছেন তাঁরা সেদিনকার ছবি বিশ্বাস করতে পারবেন না। রুক্ষ জমি প্রখর সূর্যোত্তাপ ধরে রেখে শীতকালের দ্বিপ্রহরকেও তপ্ত করে রেখেছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই সন্ধ্যায় লণ্ঠন জ্বলে। ঐটুকু আলোকে উপেক্ষা করে ঝাঁকে ঝাঁকে রক্তলোলুপ মশা মানুষকে পাগল করে দেয়। কবি বসে থাকেন lemon grass oil নামে একটা তেল মেখে। ঐ তেল নাকি মশক বিতাড়ক। অনেকে কবির কবিতায় 'নেবু ঘাস তেল' কথাটা পাবেন কিন্তু ঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারবেন না।

সুধাকান্তবাবু কাছাকাছি কোনো একটা বাড়িতে আছেন দেখাশোনা করবার জন্য। এই বাড়িতে তত্ত্বাবধায়ক বনমালী। আমি স্থির করলাম এত অল্প সময়ের জন্য যখন এসেছি দু একটা দিন এখানেই থেকে যাব। শশীকে সুধাকান্ত রাত্রে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন—আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু কবি যেতে দিলেন না। বললেন, থাক্ তোর অমৃতের মত বাঁধাকপির ডালনা, খাদ্যবস্তু যা. এই অভাগার আছে তাই ভাগ করে ও খাবে। রাত্রে [illegible] পিছন দিকের একটা ছোট ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল—

ঘরটি বইতে ঠাসা একটি গুদাম বললেই হয়। সমস্ত দোতালাটা খালি—কবি যথারীতি রাত্রে শুতে যাবার সময় ভূতের ভয় দেখালেন, বললেন, শেষ রাতে একটা গান শুনতে পাবে। ভয় পেয়ো না, যখন এ বাড়ি নীলকুঠির সায়েবদের ছিল তখন একটা গাইয়ে লোক অপঘাতে মরে। মরেছে বটে তবে তার গানের শখ এখনও মেটেনি। সে শেষ রাতে গাইতে গাইতে পা-বিহীন পায়ে পায়চারী করে। শেষ রাতে গান শুনেছিলাম ঠিকই তবে সে কোনো চৌকিদারের।

পরের দিন শান্তিনিকেতন থেকে গাড়ি এল। আমি উত্তরায়ণে এলাম। খাবার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছিলাম। সে কথা অন্যত্র লিখেছি। বেশ কয়েকদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। এখানে তার সারমর্ম একত্র করে লিখছি।

অনেকে মনে করেন মাটির বাড়ি বানান এবং ক্রমাগত এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া তাঁর এক প্রকারের ক্ষ্যাপামি। এ কথা বলা চলে উনি পরিবর্তন পছন্দ করতেন। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, এক ঘর থেকে অন্য ঘর, নিদেন পক্ষে আসবাবপত্রের স্থান পরিবর্তন করেও নূতনত্বের স্বাদ পেতেন। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। এ যেন তাঁর ক্রমাগত পালাবার ইচ্ছারই প্রকাশ। যেমন পালিয়ে এসেছেন জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে 'কলকাতার পাষাণপুরী' থেকে এই রুক্ষ উষর জনহীন প্রান্তরে, তেমনি পালাতে চান উদয়ন বাড়ি থেকে —যে বাড়ি রাজপ্রাসাদের মত মাথা উঁচু করে তাঁর আদর্শের ভিৎ নড়িয়ে দিচ্ছে। তা সে বাড়ির স্থাপত্যের সৌন্দর্য যতই থাক। সে দিন থেকে শুরু করে বরাবরই এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে—তাঁর মনস্তাপ যে কত গভীর তা জেনেও লক্ষ্য করেছি একমাত্র পুত্রের প্রতি দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথ মানুষ, সর্বতোভাবেই মানুষ, আদর্শকে তিনি ভালবাসেন কিন্তু আদর্শের সঙ্গে টানাটানিতে প্রিয় পাত্র-দেরই জয় হয়ে যায়।

ক্রমে আমি বুঝতে পারছিলাম রবীন্দ্রনাথের যে সব আচার আচরণ বাইরে থেকে দেখে লোকে সমালোচনা করে, বা তাদের কাছে বৃথা মনে হয় তার কারণ তাঁর অন্তরের প্রবর্তনা অন্যের চোখ এড়িয়ে যায়। স্বর্গীয় কালিদাস নাগ নাকি রমাঁ রলাঁকে বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ শিশুর মতো এবং সম্পূর্ণ নতুন খেলনা, নতুন পরিকল্পনা মনে মনে ভাবতে ভীষণ ভালোবাসেন।" (দিনপঞ্জী) কথাটা সত্য—তবে এও সত্য যে যদি কোনো অনিবার্য কারণে সেই নতুন খেলনা বা নতুন পরিকল্পনা ভেঙেই যায় তাহলে তিনি আশাভঙ্গের কষ্টে বিমূঢ় হন না। সানন্দে নূতনতর খেলনার সৃষ্টি করেন। কেন রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত বাসা পরিবর্তন

করতে ভালোবাসেন, সারা জীবন শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট সহ্য করেও ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ বিদেশে, কেন তিনি বার বার রাজনীতিতে প্রবেশ ও নির্গমন করেছেন এসব অভিযোগ আমরা শুনেছি কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরনিবিষ্ট ভাবতরঙ্গের সঙ্গে একটু পরিচিত তাঁরা জানেন, তিনি যা লিখেছেন তা তাঁর জীবনেরই সঙ্গীত, তাঁর অন্তরাত্মার স্পন্দন। যিনি লিখেছেন "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" বা "আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে" তিনি বানানো কথা লেখেন নি। এ সবই তাঁর নানা মুহূর্তের অনুভব।

ওঁ

Uttarayan
Shantiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

সিন্‌কোনা ক্ষেত্রেই আমাকে গ্রীষ্ম যাপন করতে হবে তোমার এই আবদারটি সুমিষ্ট লাগল কিন্তু আমার গতিবিধির নিয়ন্তা আমি নই। সে ভার তুমি দাবী করলে মঞ্জুর হবে কিনা তাও আমি জানিনে। অর্থাৎ এ সমস্তই অদৃষ্টের কথা। চলাফেরার ব্যাপারে নিঃসংশয় প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নে। মাঝে একটা বয়স ছিল যখন জীবনযাত্রায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছি, এখন ভর দিয়ে চলতে হয় কাছের লোকের পরে—আত্মশাসনের হাল ছেড়ে দিয়েছি, অতএব যাঁদের উপর ব্যবস্থার ভার, তাঁদের বিধানের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে—আমার বয়সের প্রতি দৃষ্টি করে এই দুর্বলতাকে অনিবার্য বলে জেনো। ইতি ২০ মাঘ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাক্ষরিত প্রান্তিক এক কপি পাঠাব।

স্বাক্ষরিত প্রান্তিকখানা এসে পড়েছিল অনেক আগেই। একদিন আমার অনুরোধে প্রান্তিকের ছয় ও সাত নম্বর কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

...............হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষ পাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যেথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর

অজস্র ঐশ্বর্য রাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

২য় নম্বরের শেষ স্তবকটি বড় করুণ—আমি তখন ভেবেছিলুম এই নিঃসঙ্গতা বোধ কেন ? সবাই তো তাঁকে চায় সংসার তো তাঁকে পরিত্যাগ করে নি ! তার উত্তর মংপুতে আসার পর পেয়েছিলুম—মংপুতে ছোট বাড়ি সংসার আরো ঘনিষ্ঠ তাকে দূর থেকে চলচ্চিত্রের মতো দেখতে হয় না।

কিছুদিন থেকে আমি বার বারই মংপুতে আসবার কথা লিখছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি একেবারে অসম্ভব নয়—আসবার ইচ্ছে তাঁর আছে। এখন এ চিঠি পেয়ে আমি চিন্তায় পড়লাম কী জানি কাদের উপর তাঁর গতিবিধি নির্ণয়ের ভার। যদি তাঁরা আমার প্রতি অনুকূল না হন তাহলে তো সর্বনাশ।

Uttarayan
Shantiniketan

কল্যাণীয়াসু

তুমি প্রশ্ন করেছ বর্ত্তমানে আমি কার অধীনে আছি নিমন্ত্রণ গ্রহণে যার সম্মতি নেওয়া আমার অত্যাবশ্যক। তুমি বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞ, অন্তত শাস্ত্রজ্ঞের কন্যা, আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করা সঙ্গত হয় নি। শাস্ত্রে বলে কন্যা বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার এবং শেষ বয়সে পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করবে। পুরুষের সম্বন্ধে যদিও অনুস্বার বিসর্গের যোগে কোনো অনুশাসন প্রচার করা হয়নি তবু পূর্ব্বকথিত নিয়মটি একটু পাল্‌টিয়ে নিলেই চলবে। অর্থাৎ বাল্যে তার অভিভাবক মা, যৌবনে স্ত্রী, বার্দ্ধক্যে বৌমা। অতএব বৌমাকে ডিঙিয়ে আমার কাছে তোমার কোন আবেদন বৈধ হতে পারবে না। বৌমা যদি সহায় রূপে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন তা'হলে কোনো কথাই থাকে না। চেষ্টা চলচে কলকাতা থেকে অনতিদূরে গঙ্গাতীরে আমার জন্যে একটি নিভৃত নিবাসের সন্ধান। বাংলাদেশের মতোই আমার মনটা নদীমাতৃক। পদ্মা থেকে দূরে এসে অবধি আমি যেন নির্বাসনে আছি—দূর হতে প্রায়ই তার ডাক শুনতে পাই। কিন্তু গঙ্গাতীরে আমার গতি হবে কিনা আজ তার কোনো স্থিরতা নেই। আপাতত চণ্ডালিকার নৃত্যনাট্যাভিনয় নিয়ে অবিশ্রাম ব্যাপৃত আছি। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত এ'কে বহন করে নিয়ে চলতে হবে, এর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ব্যস্ততার কারণ ছড়িয়ে আছে।

হিমাচল এখানকার আবহাওয়ার উপরে অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে আশঙ্কা করচি। অত্যন্ত শীত পড়েচে। ইতি ১৯।২।৩৮

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ভয় কেটে গেল। প্রতিমাদির শরণ নিলুম। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তিনি আশ্বাস দিলেন চেষ্টা করবেন আমার কাছে নিয়ে আসতে, তবে বাবামশায়ের কথা কিছু বলা যায় না।

আর রবীন্দ্রনাথের চিঠি এই রকম—

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী শারীরিক মানসিক আবহাওয়ার চাঞ্চল্যবশত কর্ম্মসূচি পাকা করে স্থির করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই এখনকার মতো কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছিনে—কিন্তু মনে রইল তোমার নিমন্ত্রণ যদি সহজে সম্ভাব্য হয় তো হয়ে যাবে। ইতি ৮।৩।৩৮

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসা যাওয়ার কথা চলতেই লাগল। ১৯৩৮-এর গ্রীষ্মকালে কবির আমাদের কাছে আসা যাতে হয় তার জন্যই চেষ্টা করছিলাম। ওঁর আসার ইচ্ছা আছে কিন্তু দ্বিধাও যায় না।

ওঁ

Uttarayan

Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

হঠাৎ শরীরটা ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় বৌমার কাছে থাকাটা অত্যাবশ্যক। কালিম্পঙে যাওয়া যখন স্থির হয়েছে তখন তোমার সঙ্গ পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু জীর্ণ স্বাস্থ্যের ভার তোমার উপরে চাপাতে সংকোচ বোধ করি। যাই হোক ওখানে গেলে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। ইতি ৩১।৩।৩৮

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু (য়াসু)

বীরেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে তাদের কালিম্পঙের বাড়ি চাবা মাত্র তারা উৎসাহপূর্ব্বক দিয়েছে এমন কি অন্য একজন মাতব্বর লোককে দিয়েছে সরিয়ে। বউমাকে ডাক্তার দীর্ঘকাল পাহাড়ের হাওয়ায় রাখতে চায়, তাঁর সঙ্গে পরিচারিকা ও অনুচরবর্গ থাকে, এই উপলক্ষ্যে আমার ভগ্ন শরীরের ভার তার উপর দিতে চাই—আমার এখন দরকার মাতৃশুশ্রূষার। যাই হোক তুমি যখন নিকটেই আছ তখন ক্ষণে ক্ষণে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে যেতে পার্ব্বে—কিন্তু দলেবলে তোমায় গৃহস্থালির মাঝখানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করায় প্রত্যবায় আছে। আমাদের সংখ্যা বহুল, সময় সুদীর্ঘ এবং অবস্থা শোচনীয়। ইতি

৪।৪।৩৮

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি বুঝতে পারছিলাম অনেক লোকজন নিয়ে অন্য কারু বাড়িতে বেশি দিনের জন্য যেতে তাঁর দ্বিধা হচ্ছে। স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মন উদ্বেগে অস্থির। এত কাছে আসবেন অথচ আমাদের বাড়িতে আসবেন না—আমি যে একটু সেবা যত্ন করতে চাই তার সুযোগ পাব কি করে? দেখা তো হবে—গল্পও করব, সঙ্গও পাব কিন্তু আমি যে আশা করে বসে আছি আমার সংসারের মাঝখানে তিনি এসে দাঁড়াবেন আমি একটু আশ মিটিয়ে যত্ন করব—তাঁর লেখার কপির কাজ থেকে কোনো কাজ অন্য কাউকে করতে দেব না। সে সব কী হবে? আমার মন অস্থির ব্যাকুল। যা হোক শেষ পর্যন্ত কলিম্পঙে এসে আমাদের টেলিগ্রাম করে ডাকলেন। তারপরের ঘটনার জন্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য। প্রথমবার ১৯৩৮ সালে ২১শে মে মংপুতে আসেন দুচার দিন থাকব বলে, এসে প্রায় একমাস কাটিয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি কালিম্পং ফিরে যান।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, এখানে (কালিম্পং) এসে শরীরটা শোধরাবার দিকে যাচ্ছে, কিন্তু শত্রু এখনো ভিতরে লুকিয়ে আছে, কাল তা ধরা পড়েছে। প্রতিবেশীর বাড়িতে

চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম ফিরে রাত্রে অনুভব করেছি হৃদযন্ত্রটা এখনো নাড়া খাওয়া সইতে পারে না। আরো একটু সময় লাগবে। তোমার ওখানে যাব সেকথা স্থির নিশ্চয় জেনো কিন্তু ঠিক এই সময়ে গেলে আমি দুঃখভাগী হব এবং তুমি নিন্দাভাগিনী হতে পারো।

একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করো—ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে—আরো কিছুদিন পরে হৃদয় ও হৃদযন্ত্রের দ্বন্দ্ব মিটুক্ তারপরে শুধু যে আমার সত্য রক্ষা হবে তা নয় আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হতে পারবে। ইতি বোধ হচ্ছে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে পূর্ব্বেই লিখেছি আরও কিছুদিন নড়াচড়া চলবে না। একটু শক্তি লাভ করার অপেক্ষা আছে। তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাবো তবে কিনা সত্বই না। ভেবেছিলুম বুধবারে যেতে পারব কিন্তু দেখলুম এখনও ঠিক অবস্থায় আসি নি। এই সপ্তাহটা পেরোতে দাও। নিরাশ হবার কারণ নেই। সোমবার

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর পরের খবর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এ আছে।

মংপু থেকে কালিমপং ফিরে গিয়ে লেখা :—

ওঁ

Kalimpong

কল্যাণীয়াসু

নলিনীরঞ্জন এখানে আসবেন দুতিন দিনের মধ্যেই এই রকম খবর এসেছে। তাহলে নলিনী চলে গেলে তুমি এস—কেননা নৈলে জায়গার টানাটানি হবে। ওরা চলে গেলে তোমাকে খবর পাঠাব। ইতি ১৫।৬।৩৮

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যে জন্যে অপেক্ষা করছিলুম সেটা কোনো কারণে ফেঁচে গেল। অতএব তোমরা ১৯শে ২০শে অথবা তারপরে যে কোনোদিন খুশি যদি আসতে পারো কোনো বিঘ্ন হবে না—খুশি হব। ইতি ১৭।৬।৩৮

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময় বারবার কালিমপং যাওয়া আসা, কবিতা পাঠ ও আলোচনায় যে ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল আজ তার প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে আনতে পারি না। গৌরীপুর লজের বিরাট বাড়ি আসবাবশূন্য নিরলঙ্কার—এখানে কেউ কোনো দিন বাস করেছে বলে মনে হয় না—এখানে এলে কবির বসবার পাশের ঘরটিতে আমাদের স্থান হত। আমার কন্যাটি প্রতিমাদির আদরে যত্নে আনন্দে নেচে বেড়াত।

এখানে আমার সংসারের দায় নেই—প্রতিমাদি উঠে পড়ে লেগেছেন আমাদের আতিথ্যের প্রতিশোধ নিতে। আর আমার কাজ সর্বক্ষণ কবির লেখা শোনা ও কপি করা।

তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকতেন কাউকেই কখনো কবি নিজের নামে ডাকেন নি। সুধাকান্ত ছিল বলডুইন বা সুধোড়িয়া—অনিল চন্দ অক্সোনিয়ান ইত্যাদি—আমারও অনেক নামকরণ হয়েছিল তার মধ্যে সুনয়নী ও মাংপবীই প্রাধান্য পেয়েছিল—কালিমপঙে এসে সুনয়নীকে শুনায়নী করছিলেন। দু একটি কবিতায় এই নামের ব্যবহার আছে। এবং সেখানে আমি যে গদ্য কবিতা পছন্দ করিনা তার জন্য খোঁটা দেওয়াও আছে। আসলে একথা সত্যই যে গদ্যছন্দের কান আমার তৈরী ছিল না। দিনের পর দিন পড়ে পড়ে পরম ধৈর্য্যে সেটা তিনি তৈরী করে দিয়েছিলেন। কথা ছিল মংপুতে আমার ননদ সপরিবারে আসবেন সেজন্য কালিমপঙে কয়েকদিন থাকবার পর মংপু গিয়ে আমি আবার ফিরে আসব, তা হল না তার আগেই উনি নেমে গেলেন পার্বত্যবাস ছেড়ে সমতলের দিকে।

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিনের জন্যে এখান থেকে অন্তর্ধান করব—বৌমাকে রেখে গেলেম প্রতিভূ, অতএব ফিরব তাতে সন্দেহ নেই। বৌমা কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন।

আজ সকালে ভালো আছেন কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখে যেতে পারচিনে।

তোমাদের ঘরের আত্মীয় স্বজন চলে গিয়ে তুমিও বোধকরি ছুটি পেয়েছ। সর্ব্বসাধারণের কাছে আমি ছুটি নিয়েছি কাগজে পড়ে থাকবে। ইতি ২।৭।৩৮

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমারও গাড়ি ভাঙল আমিও চলে এলুম। ভেবেছিলুম সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে আসবে সে সুযোগ হোলো না। জুলাইয়ের অবসানে অগস্ত্য যাত্রার সংকল্প আছে শরৎকালটা পর্ব্বত চূড়ায় কাটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি —যদি কোনো বিঘ্ন না ঘটে তবে যাব। এখানে যে খারাপ লাগছে তা নয়— ঘন শ্যামল বনভূমি আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ। যতটা নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ পাব মনে করেছিলুম এখনও তা সম্ভব হয় নি—আশা ছাড়ি নি—ছিন্ন পত্র ঝুড়িতে বর্ষণ করচি কিছু কিছু থেকে যাচ্ছে, পত্র কার্পণ্যের অখ্যাতিটা যখন নিরন্ধ্র পরিব্যাপ্ত হবে তখন শান্তি পাব। ইতি ৪।৭।৩৮

স্নেহাসক্ত

খুকুকে Kalimur দিয়ে দেখো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মংপু থেকে যখন চলে যান তখনই কথা দিয়ে গিয়েছেন শরৎকালে আবার আসবেন। কিন্তু কথা যে থাকবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ভয় ভাবনা আমাদের ছিল। একবার তিনি বাড়িতে এসে চলে যাবার পর সে শূন্যতা যেন কিছুতেই ভরে না। চলে যাওয়ার সঙ্গে ফিরে আসার কল্পনা গানের ধুয়ার মতো মনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে। আজ আর কথায় লিখে বোঝান যাবে না, তিনি আসার আগের ও পরের আমাদের জীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি কী রকম।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লান্ত, লোক সমাগমেরও বিরাম নেই। এই গোলেমালে তোমার কলকাতার ঠিকানা হারিয়ে তোমার গিরি নিবাসে এই

সংবাদ পাঠাচ্ছি যে অচিরাৎ কালিমপং যাত্রা সম্ভব হবে না—সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে এখানকার ছুটি সেই সঙ্গে আমিও ছুটি পাব। তারপরে— ?

ইতি ২৬৷৮৷৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে প্রতিমাদেবী রথীদা ও পুপু সকলে মংপুতে আমার স্বামীর কাছে ছিলেন যদিও তখন বেশির ভাগ সময়টাই আমাকে কলকাতায় কাটাতে হয়—ও মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যাই।]

কলকাতায় এসে আমার নূতন কবিতার বই "চিত্তছায়া" হাতে পেয়ে গেলাম। সেই বই সম্বন্ধেই লিখছেন "তোমার কবিতাগুলি স্বকণ্ঠে শুনিয়ে যেয়ো।" এই সময় থেকে আমি আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ—কবিকে শোনাবার কোনো বাসনাই আমার নেই—কিন্তু কবিতার কাব্যগুণ ছাড়া অন্যগুণও থাকতে পারে। আমি যে তাঁকে উৎসর্গ করেছি আমার সেই ভক্তি ভালবাসার তিনি মূল্য দেন, কাব্যের গুণাগুণের উপর তা নির্ভর করে না। তার যথার্থ মূল্য কি তা অনুভব করলাম যখন চিত্তছায়ার উত্তরে হঠাৎ এই কবিতাপত্রখানি পেলাম।

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বাসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে।
ব্যথায় ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া।
বেড়ালো যুঝিয়া
উদ্দাম তরঙ্গদল সাথে।
অবশেষে রজনী প্রভাতে
জানে না সে কখন তুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিঃশ্বাসে তার একটুকু মল্লিকার কলি।
উঘারিল গন্ধ তার,

সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে॥

৭ আশ্বিন ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দবাবুকে এই কবিতাটি দিয়েছিলাম আমার নাম না দিয়ে।

এই কবিতাটি পরের বার মংপুতে ওঁর খাতায় লিখে দিলে 'সানাই'-তে প্রকাশিত হয়।

ওঁ

Uttarayan
Shantinikatan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

বর্ষামঙ্গল উৎসব হবে শনিবারে। নিশ্চয় তোমার কন্যাসহ তুমি এসে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলুম ত্রুটি মার্জ্জনা করবে।

ইতি ১।৮।৩৮ স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেপ্টেম্বরে মংপু আসবেন কথা দিয়েছিলেন তাই শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেটা পাকা করে নেব স্থির করলাম। এবং সঙ্গে করে কলকাতা পর্যন্ত নিয়েও এলাম। কলকাতায় দু চার দিন থেকে মত বদলে গেল। বললেন এবার আর যাব না। উপায় নেই—আমরা শূন্য মনে মংপু ফিরে গেলাম।

কল্যাণীয়াসু

চেষ্টা করছি বিশ্রাম করতে—কপালে নেই। দীর্ঘ ভ্রমণে যাইনি ভালোই হয়েছে—পেরে উঠতুম না।

দিব্যি গরম! সর্বদা ঘর্ম প্লাবন চলছে। তোমরা ঠাণ্ডায় আছ কল্পনা করে কতকটা সান্ত্বনা পাই।

লেখনী ধীর মন্দগমনে চলতে সুরু করেছে—খুব উৎসাহের সঙ্গে নয়।

পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, আরাম নেই, মানব-জাতির জন্যে আশা নেই—দানব-জাতির জয় জয়কার। ইতি ১৪।১০।৩৮ রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা আসন্ন হয়েছে। চীনের উপর আক্রমণ চলেছে।

বিভিন্ন বলবান জাতিগুলির ব্যবহার মানবের মধ্যে দানবের এই প্রাবল্য তাঁকে সর্বদাই ক্ষুণ্ণ করে রাখতে।

অর্ধপথে এসে যে ফিরে গেলেন সেজন্য সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল কিন্তু আজ বুঝতে পারি ঐ বয়সে মংপুর দুর্গম পথে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আসাই ছিল এক দুরূহ কাজ। মংপুর পথে পাহাড় চড়াই খাড়া। মংপুতে টেলিফোন নেই, টেলিগ্রাফ অফিস নেই, ডাক্তার নেই। কী অসামান্য করুণায় নির্ভয়ে বারবার এসেছেন আজ যখন তা ভাবি বিস্ময়ের কুল পাই না।

আমার পক্ষে আমার ঘরে তাঁর আসা ও দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতাটা কিরকম তা আমি আমার নিজের ভাষায় বলতে পারব না। সারাদিন ধরে যেন সেই গান "বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে"—গুঞ্জরিত হতে থাকত। এ রবীন্দ্রনাথ সেই দূর থেকে দেখা, নানাজনের আড়ালে ও "কীর্তিজালে ঘেরা" রবীন্দ্রনাথ নন। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘরের মানুষ হয়ে একান্ত আপন হয়ে এসেছেন। অনেক সময় নৈকট্য কাছে আনে না দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার পক্ষে তা হয় নি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও না। বরং তিনি যখন আমার ঘরে এলেন তখন তাঁকে আরো অভাবিত মনে হয়েছিল—সেঁজুতির সেই কবিতার মত। "আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে দেয় নি যে দেখা আজও কোনো খানে"—সেই অভাবিত কল্পনাতীত আবির্ভাব —যার জন্য আজন্ম আমার প্রতীক্ষা।

যখন তিনি পাশের ঘরে বসে লিখছেন আমি যদি সে ঘরে নাও যাই, তবু যেন আমাদের চারিদিক এক অনাস্বাদিত সুখের আস্বাদে, এক অনির্বচনীয় সুঘ্রাণে ভরে যায়। তখন আমার সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশে লেখা তাঁর সেই গানের মর্মবাণী "তুমি পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ, তুমি ফুলের বুকে ভরিয়া দাও সুগন্ধ"…বুঝতে পারি। যে তারে আমার সমগ্রজীবন বাঁধা যেন তাতেই সুর ঝঙ্কার বেজে উঠে শুধু তখন নয় সারাজীবন ধরে আমার অস্তিত্বকে অন্তত আমার কাছে অর্থবান করল।

একটি কবিতা পেলাম—

> প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে
>
> প্রথম দিনের উষা নেমে এলো যবে।
>
> প্রকাশ-পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে
>
> বাতাসে বাতাসে সুর খুঁজেছিল তবে।

আমি বুঝি সেই নব সৃষ্টির কবি
নব জাগরণ যুগ-প্রভাতের রবি,
গান গেয়েছিনু নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে
আলো আঁধারের আনন্দ বিপ্লবে।

সে গান আজিও নানা রাগ রাগিণীতে
শুনাই তাহারে আগমনী সঙ্গীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
দূর নীলিমার পেলব সীমানাটিতে
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।

অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহ ব্যথা যে হানে
করুণ প্রাতের যোগিয়া সুরের রবে
অজানা লোকের অরুণিম উৎসবে॥

ধবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৬ আশ্বিন ১৩৩৫

ধবলী বাড়িটি কোথায় তা ঠিক জানি না।

কলকাতা থেকে আসানসোল ,আসানসোল থেকে পাটনা যাবার পথে—পরেশনাথের কাছে গাড়ি উল্টে সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলাম সেই খবর পেয়ে পরের চিঠিটি। চিঠি পেলাম আমার বাবার মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতে। "মনোহরপুকুর তট বিহারিনী" আমার বোন চিত্রিতাকে বলা হয়েছে। তারিখটা ভুল মনে হয়, তারিখ হবে ৩০।১২।৩৮

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু,

সর্বনাশ! তোমার দেখচি আমার সঙ্গে পাল্লা দেবার মৎলব। আমি

একবার যমের ধাক্কা কাটিয়ে ফিরে এসেছি তোমারও সেই উল্টোরথ-যাত্রারই নকল। বোধ হচ্ছে এই ইতিহাসের কিছু চিহ্ন থেকে যাবে তোমার ভাঙা কপালে। যাই হোক মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ একথাটা সর্বত্র সব সময়ে খাটে না। মরণের চরগুলোর পাশ কাটিয়ে চোলো—রেলের পথ যেখানে সুলভ, সেখানে মোটর চালাবার স্পর্দ্ধা রেখো না। ইতিপূর্ব্বে কোনো এক সময়ে মাংপবীদের এখানে আগমন সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলুম। তার পরিবর্ত্তে এসেছিলেন "মনোহরপুকুর তটবিহারিনী।" অনিলকুমার ছিলেন তখন এখানে।

তোমাকে এখানে আনবার জন্যে যদি লোকের প্রয়োজন হয় তবে তদুপযুক্ত একজন বাহনের ব্যবস্থা করা যাবে। হয়তো সুধাকান্তকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হবে না। ইতি—৩০।২৮।৩৮

কবি সার্বভৌম

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে বিষম ব্যস্ত আছি। এই ব্যস্ততার অশুভ লগ্ন কাটবে এই মাসের মাঝামাঝি। রোজই ভিজিটরের ভিড় চলছে—তার উপর হাজার রকমের কাজ ও অকাজ। এই কাজের তাড়নায় কয়েকদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বরের তাপ দেখা দিয়েছিল সেটা কেটে গেছে কিন্তু তার হেতুটা যায় নি। ত্রিপুরার মহারাজ আসবেন। তাঁর পরিচর্য্যার জন্যে সুধাকান্ত হাজির। বোধ করি আর দিন তিনেক পরে সে কলকাতায় যাবে। এ মাসের মাঝামাঝি যদি তুমি আসতে পারো খুশি হব। ইতি—৭।১।৩৯

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তোমার নিপুণ হাতের তৈরী জামা পেয়েছি—সেটাকে আমি তোমার নিমন্ত্রণ পত্র বলেই গণ্য করে নিলুম। কারণ ঐ পশমি আবরণ মংপুর নিয়

ভূ-ভাগে কোথাও চলবে না। এরকম ভাষাহীন বাণী তোমার মতো উর্ব্বর মস্তিষ্কবতীর পক্ষেই সম্ভব। তোমার এই আমন্ত্রণকৌশল নিষ্ফল হবে বলে বোধ হচ্ছে না—যদি বৌমা আমাকে নিয়ে যান তাঁর আশ্রয়ে, তাহলে রবির উত্তরায়ন অধিকারের ঋতুতে আমিও তাঁর অনুসরণ করতে পারি। এই তো বললেম আমার মনের কথা, কিন্তু শরীর যদি প্রতিবাদ করে বসে তাহলে আমার গ্রহকে গাল দিও আমাকে দোষ দিও না। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম, ব্যস্ত আছি, বোধ করি শেষ পর্য্যন্তই থাকতে হবে। ইতি—২৩।২।৩৯

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"নিপুণ হাতের তৈরী জামা"—অর্থাৎ পশমে বোনা একটি বৃহৎ ঢিলে কার্ডিগান বুনে পাঠিয়েছিলাম। শঙ্খ প্যাটার্ন, সাদা রং, কালো বর্ডার, লম্বা হাত। ওঁকে আমি কখনো হাতে বোনা জামা পরতে দেখিনি। আঁট কোনো জামাই পরতে দেখিনি—সবই ঢিলে। আমার হাতে সর্বদাই পশম আর কাঠি (উনি কখনও উল বলতেন না) দেখে দেখে ঠাট্টা করতেন। বলতেন, জাঁতি আর সুপুরীর যুগ গেছে এখন আধুনিকার হাতে এসেছে "পশম আর কাঠি"—কার জন্য এত জামা বোনা হচ্ছে তা নিয়েও ছদ্ম ঈর্ষা প্রকাশ করতেন। তিনটি কবিতায় এই পশম বোনার উল্লেখ আছে। একটি ময়ুরের দৃষ্টি, আর একটি সানাই-এর নামকরণ, অন্যটি রোগশয্যায় ৩৯ নং কবিতা।

পশম বোনা নিয়ে সর্বদাই কথা হত বলে আমি ঐ প্রায় জোব্বার মত কার্ডিগানটি বুনেছিলাম। এই বইতে যে ছবি আছে তাতে ঐ কার্ডিগান পরে আছেন।

সানাই-এর অনেকগুলি কবিতাই মংপুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকায় বই প্রকাশ হবার আগেই আমাকে তাই ফাইল কপিগুলি বাঁধিয়ে পাঠান।

কালিমপঙে-র বাড়িতে একবার এসে পৌছেছি সেদিন তাঁর শরীর অসুস্থ—আকাশ মেঘে মেদুর, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে এলিয়ে আছেন। আমাকে বললেন ডায়রীটা দাও—আমি এগিয়ে দিতে উনি 'নামকরণ' কবিতাটা বের করে শোনালেন। কবিতার মধ্যে আমার বিশেষ আনন্দের কারণেই আমি তখন অভিভূত। আজ দূর থেকে সেই দিন সেই মেঘলা আকাশ আসন্ন সন্ধ্যা রবির মৃদু আলো, সেই পরিবেশ যখন মনে করি, কবিতাটা সানাই-এর মত ঈষৎ করুণ সুরে বাজতে থাকে।
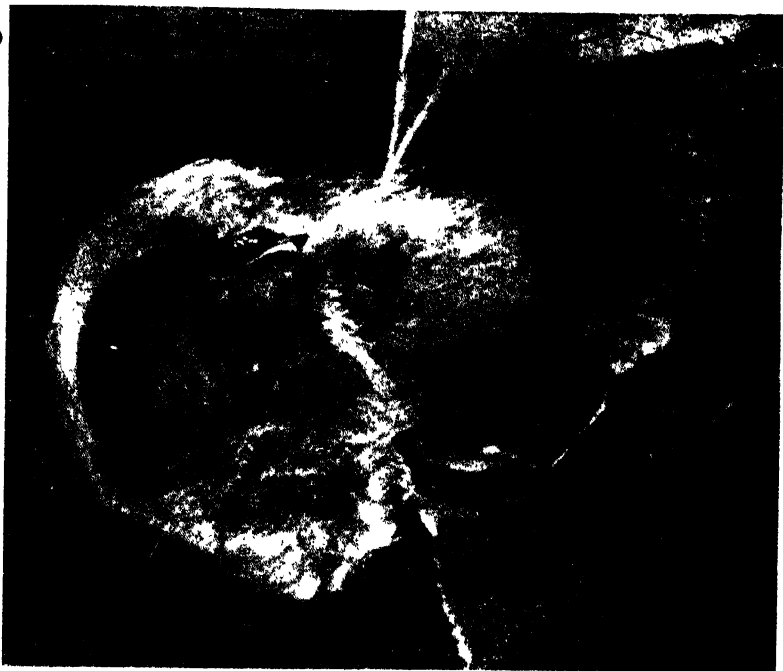
প্রতিমা দেবী

কবির শেষ বয়সের চিঠিগুলি অবলম্বন করে এই যে চিত্রটি রচনা করছি তাতে পাঠক হয়ত কোনো গভীর জটিল তত্ত্ব পাবেন না, কোনো সমস্যার আলোচনাও পাবেন না। রাজনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি কিছুই নেই—আছে এক অস্তোন্মুখ বিরাট প্রতিভার অন্তরাত্মার সাক্ষ্য—রোগে বার্ধক্যে যিনি অপরাজিত—ভালোবাসার অকৃপণ উৎসই যাঁর সমস্ত শক্তি সমস্ত প্রেরণার মূল। আমার পাঠক সেই কবিকেই পাবেন যিনি ক্ষুদ্রতম মানুষের ভক্তি ভালোবাসাকে 'প্রকৃতির দানের' মত 'রসপূর্ণ আকাশের বাণী'র মত গ্রহণ করতে পারেন। যাঁর শেষ কথা—"এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি

এ ভালোবাসাই সত্য এ জন্মের দান।"
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার মধ্যে দুই বিরোধের সংঘাত চলেছে। একদিকে কাজ উঠেছে জমে আর এক দিকে মনের একান্ত কর্ম্মবিমুখতা। কর্ত্তব্যের শাসন থেকে পালানো সম্ভব নয় তাই এসে অবধি বাইরের দিকে ব্যস্ত ও অন্তরের দিকে উত্যক্ত হয়ে আছি।

রথী বোধহয় কাল কলকাতায় যাবে। তোমার জমি সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা হয়েছে—জায়গা পাওয়া গেছে বলেই তো বোধ হচ্ছে তবু তুমি তার সঙ্গে আলাপ করে কথাটা পাকা করে নিয়ো।

এখানকার প্রান্তরের উপরে বর্ষার প্রসন্ন শ্যামল মূর্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখনো ভালো করে তাকিয়ে দেখবার সময় পাচ্চিনে। ডেস্কের উপর থেকে খোলা জানলার কোণের দিকে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি চালাচালি করি। চার দিকের সুরম্যতার সম্বন্ধে আশ্বাস পাচ্চি। আমার খুশী হবার বাধা হবে না। আমার আশীর্বাদ জেনো খুকুকে স্নেহ জানিয়ো। ইতি। ২৪।৬।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় বার মংপু থেকে ফিরে আসার পর :

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়

শুক তারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
আলোর আভাস জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু উদয় তোরণে
তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে—
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি
বনের ছায়ায় লাগায় পরশ মণি
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
অসীমের কাছে মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী ডালি
জাগে সুন্দর জাগে নির্মল
জাগে আনন্দময়ী
জাগে জড়ত্বময়ী
রুধিয়া তোমার দ্বার
বন্ধ করিয়া রেখো না রেখো না
রাতের অন্ধকার।
বহুক উদার বায়ু
শিরায় শিরায় রক্তে তোমার
দুলুক অমিত আয়ু।
বিশ্বলক্ষ্মী পাদ পীঠতলে
আপনারে করো দান
তোমার জীবনে ব্যর্থ না হোক
কবির এ আহ্বান॥

২৬।৬।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর অব্যবহিত পূর্বে আর একটি চিঠিতে এখানে যে কথা পদ্যে আছে তাই গদ্যে লিখেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান কথা এই "যাদের সঙ্গে আমার স্নেহপ্রীতির যোগ আছে তাদের প্রতি যদি আমার কোনো প্রভাব থাকে তবে তাদের কাছ থেকে আমি আত্মবিজয়ী সাধনার প্রত্যাশা করি।..... ২৫।৬।৩৯"

তারপরে—

কল্যাণীয়াসু

তুমি জানো না কী রকম কল্পনাপ্রবণ আমার মন। আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলুম তোমার জীবন বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার চিত্ত কী রকম বিমুখ হয়েছে সংসারের থেকে। তোমার এই অস্বাস্থ্যের ছবি আমাকে প্রবলভাবে ধিক্কার দিয়েছিল। আমার সঙ্গ যে তোমাদের নিরানন্দর কারণ এতে আমি লজ্জা পেয়ে যা মাথায় এসেচে তাই বকেচি।

বুঝতে পারিনি আমি লাঞ্ছনা করেছি নিজেকেই। মন থেকে এই মেঘটাকে কাটিয়ে দিয়েছি। জানি অকারণ ক্ষোভ স্নেহের বেদনাকে অসঙ্গত রকমে বাড়িয়ে তোলে।

এক কাজ কোরো। কাল আসচেন বৌমা। যদি বাধা না থাকে তুমিও এসো। তোমার সহজ স্বাভাবিক সহাস্য ভাব দেখলে আমি আশ্বস্ত হব। মনে কোনো ক্ষত নিয়ে এসো না—এসো তুমি বিজয়িনী। আমি এখন আছি শ্রীনিকেতনে, খুব খুশিতে আছি। আরো খুশি হব যদি দেখি প্রসন্ন আছে তোমার মন। ইতি—২৭।৬।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

প্রতিমাদির সঙ্গে যথাসময়ে শান্তিনিকেতনে পৌছলাম। অনিলবাবু ছিলেন মজা করাবার ওস্তাদ। গাড়ি থেকে নামা মাত্রই বললেন, "গুরুদেবের বুড়ো আঙুল বড় ব্যথা হয়েছে"—আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "কী হয়েছে?" তখন বলে কি, "আপনাকে চিঠি লিখে লিখে"····· আমি বললাম, "অনিলবাবু বৃথা অনুযোগ, না আমি বড় চিঠি কখনো লিখেছি না পেয়েছি।"

সেবারও কবি ছিলেন স্কুলের তেতালায়, সেখানে বুড়ি ও অমিতার (অমিতা ঠাকুর) সঙ্গে দেখা হল। বুড়ি বললে, "দাদামশায়কে দখল করেই ফেলেছ—সর্বদা তোমার প্রশংসা—আমরা তো······।" আমি বললাম, "তোমার তো নিজের দাদামশায়, আমি তো কেড়ে নিতে পারব না—তুমি তো আসল আমি তো নকল, তবে ভয় কি?"

সেবারে প্রতিমাদির যত্নে ও রথীদার সঙ্গে গল্পে গুজবে বেশ আরামেই কেটে ছিল—ওঁরা বারবার বললেন, সেপ্টেম্বরে তোমার কাছেই নিয়ে যাও ভালো থাকেন ওখানে, আনন্দে থাকেন।

রথীদা ও প্রতিমাদির মধ্যে আমার প্রতি কোনো বিমুখতা নেই, আমি যদি কবির সেবা করি তাতে ওঁরা খুব সন্তুষ্ট। কিন্তু অনেকে নয়। এবার রথীদা

সঙ্গে যাবেন। তাছাড়া কালিমপং থেকেও রথীদা প্রতিমাদি মাঝে মাঝে মংপুতে আমার কাছে এসে থাকেন। সন্তানের সেবা যত্ন পাওয়া ওঁদের ভাগ্যে নেই, আমার সৌভাগ্য সেটা কিছুটা আমি করতে পারি। প্রতিমাদির সংসারে আমার পুনর্জন্ম হয়েছিল। ওঁকে শান্তিনিকেতনে সবাই বলে বৌঠান আমি বলি দিদি। রথীদা বলেন, "ভালো সম্পর্ক পাতিয়েছ, দাদার বৌকে কেউ দিদি বলে।" কিন্তু আমি জানি ওঁকে আমার 'মা' বলাই উচিত ছিল।

একবার মংপু থেকে ফিরে গিয়ে প্রতিমাদি লিখছেন :—

মৈত্রেয়ী

এসে ইস্তক এত ব্যস্ত আছি যে লিখে উঠতে পারি নি তবে পুষুর চিঠিতে সব খবর পেয়েছ বোধহয়।······

······বাবামশায় (রবীন্দ্রনাথ), উনি (রথীন্দ্রনাথ) ভালো আছেন। স্কুল খুলেছে বলে আমরা সকলেই এখন ব্যস্ত। এখানে এখন ফাগুন মাসের মত গরম। বাবামশায় যেদিন গরম বেশী হয় বা কম খান যদি আর আমরা খেতে বলি ত বলেন এইবার মংপু চলে যাব। এখানে তাসের দেশ রিহার্সল হচ্চে, ১৩ই হবে। এতদিনে তোমাদের ওখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে বোধহয়। বনমালীর মনও মংপুর পথে। ইতি প্রতিমাদি

কবির স্বভাব ছিল মাঝে মাঝে গল্প কবতে করতে একটা কথা থেকে অন্য কথায় গিয়ে এক বিচিত্র 'বক্‌বকানির' জাল বুনে যাওয়া, তার মধ্যে বীজরূপে কোনো সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত থাকত। নিম্নোদ্ধৃত চিঠিটাতেও আছে তবে সে কাহিনীর বিশেষ কোনো উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

ওঁ

খামের উপরে একপাশে লেখা Private

Uttarayan
Santiniketan

কল্যাণীয়াসু,

কাল রাত্রি সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ চারবার হাঁচতেই আলু ছুটে এল— বল্‌লে ভালো ঠেকচে না। আমি বললুম জহরলালকে তার কল্লা চাই তার সেক্রেটারীকে যেন লুধিয়ানা একস্প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ইনটারভিয়ুর দরকার—কেন না এখনি আরো চারটে হাঁচি আসব আসব করচে। ফজলুল হক সাহেবের কানে কথাটা গিয়েছে তিনি বললেন এরকম হাঁচি কম্যুন্যালিটিক

না হয়ে যায় না—এটা হিন্দুমহাসভার ক্যাচাং, কৌন্সিলে তিনি এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে ছাড়বেন না, মহাগোল বেঁধে গেছে। সত্যেন্দ্র মিত্র বুক ফুলিয়ে বলচেন, সাতাশজন গুণ্ডা ভাড়া করে নস্যি লাগিয়ে হাঁচাবেন—কী হাঁচির মাঝখানে ধ্বনিত হবে বন্দেমাতরম গান। চেম্বরলেন cable করেচেন এখনি appeasement-এর দরকার—কিন্তু ছাতা * খুঁজে পাচ্চেন না। সোভিয়েট গবর্মেণ্ট বলে পাঠিয়েছেন হাঁচিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই যদি সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে এই হাঁচি ঠিক সমানভাবে নাকে নাকে ভাগ করে দেওয়া হয়। টোরি গবর্মেণ্টের ঘোর আপত্তি, হাঁচিই হোক কাশিই হোক তারা মনোপলির পক্ষে, মুখে বলচে ইন্‌টরভেনসন করে নস্যি রপ্তানি বন্ধ করে দেবে—সত্য রক্ষা করেছে, পাঠিয়েছে ধানি লঙ্কার গুঁড়ো ১৭০০ বস্তা। জহরলাল টেলিগ্রাম করেছেন—কবির মগজ থেকে কন্‌গ্রেসি হাঁচির উদ্ভাবন হোক—সে হাঁচি বাঁ নাক দিয়ে বামপন্থীদের লাগাক ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দে তাড়া। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি, সুর সুর করচে নাসারন্ধ্র আর গান গাচ্চি

সখিরে ধারা বহে সারাদিন মান—
নাকের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিয়া দিল প্রাণ

নাকের ভিতরে official secret রক্ষা করবার bill পাশের প্রস্তাব উঠেছে—কিন্তু রাখ্‌তে পারব না।

ডেরাডুন মেলে ধূর্জটি এসে পৌঁচেছেন, বলচেন গুরুদেব, তোমার বিশ্বকম্পায়নি হাঁচি লাগাও খুব কষে রিপোর্ট করে দিই। আজ এই পর্যন্ত—কিন্তু গোপনীয়—৩।৭।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan

কল্যাণীয়াসু

১৯শে তারিখে কলকাতায় যেতে হবে তখন যদি আসতে পারো দেখা হবার বাধা হবে না। থাকতে হবে দুচার দিন। সে পর্যন্ত এখানে থাকবেন আওয়াগড়ের রাজা। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্চে। নইলে তোমার বাবাকে এখানে

---

* Chamberlain ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার সম্বন্ধে রটনা তাঁর হাতে সব সময় ছাতা থাকে।

ডাকবার ইচ্ছা ছিল। আরো একটা কাজ হাতে আছে—বর্ষামঙ্গল নিয়ে আছি লেগে—ইতিপূর্বে বর্ষাধারার অজস্র বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে দুদিন থেকে মেজাজ অপেক্ষাকৃত ভালো। ইতি ৬।৮।৩৯

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আওয়াগড়ের রাজা থাকতে থাকতেই আমি একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম—কবি তখন শ্যামলী বাড়িতে ছিলেন। আওয়াগড়ের রাজা কবির পরম ভক্ত। তিনি তাঁর লেখা কতদূর কি পড়েছেন জানি না। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে একটি বাড়ি করেছেন। এবং এইবার লক্ষাধিক টাকা বিশ্বভারতীকে দান করবেন বলে এসেছেন। একদিন সকালে আওয়াগড়ের রাজা উদয়নের বড় ড্রইংরুমে বসেছিলেন, আলুবাবু কবিকে ধরে ধরে নিয়ে এলেন—আমিও সঙ্গে সঙ্গে একপাশে এসে বসলুম। রাজা হিন্দীতে কবিকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি কে? কবিও হিন্দীতে উত্তর দিলেন—"মেরা দোস্ত"। অভাবনীয় উত্তর সন্দেহ নেই। আমি একই সঙ্গে পুরস্কৃত, লজ্জিত ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বয়স ও অবস্থার পার্থক্য হেতু রাজার কাছেও উত্তরটি অভিনব লেগে থাকবে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন।

এর কাছাকাছি সময়ে শান্তিনিকেতনে সুভাষ বোস আসা-যাওয়া করছেন—পরে মহাত্মা গান্ধীও এলেন। এইরকম কোনো বৃহৎ আয়োজনে আমি কখনো শান্তিনিকেতন আসি নি। উৎসবগুলিতেও লোকের ভীড় হত বলে আমি যেতাম না সেজন্য আমার বেশি কিছু দেখা হত না। পূর্বেই বলেছি একদিক থেকে যথেষ্ট অগ্রসর হলেও অন্যদিকে আমার সংকোচও কম ছিল না। এটা আজ অবিশ্বাস্য ঠেকবে কিন্তু বাইরের বেশী ভীড়ের সামনে আমার সত্যই অস্বস্তি হত এবং সবদা মনে হত এখানে আরো ভিড় বাড়ানো অন্যায় হচ্ছে।

আমি শুধু দুটি বড়ো উৎসব দেখেছি, এক ত্রিপুরার রাজার 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান ও অক্সফোর্ডের ডিলিট প্রদান—সে কথা পরে বলা যাবে।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস খুবই। তিনি মনে করছেন সুভাষচন্দ্রর প্রতি অন্যায় হচ্ছে। তাঁকে তিনি দেশনায়কের পদে বরণ করছেন। যদিও ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রর একটি প্রবন্ধ—My strange illness মডার্ন রিভিউতে ছাপা হবার পর কবি কিছুটা বিরক্ত হন। এবং রামানন্দবাবু কেন এই লেখাটি ছাপলেন তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আগস্ট মাসে মহাজাতি সদনের স্থাপনা হয়। সেপ্টেম্বরে মংপু আসেন। আগস্ট মাসে আমরাও কলকাতায় ছিলাম। মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের কথাবার্তা চলছিল। একদিন প্রতিমা দেবী নিমন্ত্রণ করলেন তাদের সঙ্গে অর্থাৎ কবির সঙ্গে মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের উৎসবে যাবার জন্য। রথীদা অবশ্য সেখানে যাবেন না, তিনি ভীড় সহ্য করতে পারেন না। তিনি আমাদের অর্থাৎ মাসীকে, চিত্রিতাকে ও আমাকে উত্তরপাড়ার ঘাটে বাঁধা পদ্মা বোটে সারাদিনের জন্য পিকনিকে নিমন্ত্রণ করলেন—আমার এমন দুর্মতি যে আমি দ্বিধায় পড়ে গেলুম, কোথায় যাই। কবি শুনে বললেন, রথীর নিমন্ত্রণেই যাও। অত্যন্ত পরিতাপজনক ঘটনা ঘটল, অতবড় ঐতিহাসিক ব্যাপার মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন দেখতে পারলাম না। সারাজীবন এই নিয়ে মনস্তাপে ভুগছি। সুভাষ বোসের সঙ্গে ছবিটি যখন দেখি তখন আপসোস হয়, প্রতিমাদির পিছনে তো আমারও একটু স্থান থাকতে পারত।

১৯৩৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে তৃতীয়বার মংপু এলেন। মংপু আসার অব্যবহিত পূর্বে কবির পরিমণ্ডলে সুভাষচন্দ্রের বিরোধী কেউ ছিলেন যিনি নানাভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রতি কবির মনকে বিমুখ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ 'My strange illness' প্রবন্ধটি তার সহায়ক হয়েছিল। কবির সম্বন্ধে সব কথা অকপটে লিখতে গেলে লিখতে হয় যে, উনি খুব সহজেই কাছের মানুষদের কথায় প্রভাবিত হতেন—সাদা বাংলায় "কানপাতলা" ছিলেন। অবশ্য সে প্রভাব স্থায়ী হত না। যা হোক, কলকাতায় থাকাকালীন ঐ প্রসঙ্গে যা কিছু আলোচনা হয়েছিল তা শনিবারের চিঠিতে ছাপা হবার জন্য অনুলিখন হয়ে এসেছিল। ঐটির পূর্ণ প্রকাশ আমি বন্ধ করতে পেরেছিলাম। অবশ্য লেখাটা ছাপা হয়েছিল ঠিকই তবে সেটা সাধারণভাবে বলা—ব্যক্তিগত খোঁচা বা ব্যক্তিগত লক্ষ্য অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় দেশের রাজনীতি, জাপানের চীন আক্রমণ, ইয়োরোপে যুদ্ধের করাল ছায়া এই সব সর্বদা তার মন অধিকার করে থাকত। যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে লিপ্ত আছেন তারাও এসবে ব্যক্তিগতভাবে বিচলিত হন না। কবির কাছে দেশ-বিদেশ আপন-পর এক। এসব পরিতাপজনক কাহিনী তাঁর শরীরও ক্লান্ত করে দিত।

তবু যে দুমাস মংপু ছিলেন, আনন্দে উল্লাসে ভরে রেখেছিলেন আমাদের চারপাশ। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এ আমি সেই বিষাদগ্রস্ত কবির কথা লিখিনি। লিখেছি তাঁর কথা যিনি চিরনবীন, যাঁর প্রাণলীলার আনন্দ বার্ধক্যেও অপরাজিত।

দুমাস মংপুতে কাটিয়ে ফিরে আসার পর জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রায় 'শেষকথা' পড়া হল—বোধ হয় অনেক দিন পরে এই রকম বিদগ্ধজনের বড় সভা ডাকা হয়। ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীও আসেন। প্রমথ চৌধুরী তখন অসুস্থ—সম্ভবত পারকিনসানস্ রোগে আক্রান্ত। নিজেও স্থির হতে পারেন না, ইন্দিরা দেবীকেও দেন না। কবি তাই অনিলবাবুকে ডেকে বললেন, তুই একটু প্রমথকে সামলাস নৈলে বিবি কিছু শুনতে পাবে না।

আমি পূর্বে লিখেছি যে আমার তারিখ সম্বন্ধে গোলমাল হবার সম্ভাবনা খুবই। আমার মনে বরাবর স্পষ্ট ধারণা ছিল যে যেদিন মহাজাতি সদন স্থাপনা হয় এবং আমরা রথীদার সঙ্গে উত্তরপাড়ায় বোটে পিক্‌নিকে যাই সেই দিনই শুঁয়োপোকার "অপকীর্তি" ঘটেছিল, কিন্তু আজকে চিঠির তারিখ মিলিয়ে আমি বুঝতে পারছি না সেটা "শেষকথা" পড়ার দিন কিনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চিঠির তারিখে ভুল লিখতেন—আর আমি তো এখন তারিখবিহীন দিনের মধ্যে বাস করছি। অবশ্য দুশ্চিন্তার বোনো কারণ নেই, অগণিত রিসার্চ ওয়ার্কার কাজ করছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ সন তারিখ মিলিয়ে ফেলবেন—হয়ত এই বইয়ের ভুল তারিখের উপর একটা থিসিসও হতে পারে।

যা হোক সেদিন কোনো একটা বড় সভা ছিল। হয় মহাজাতি সদন স্থাপন, নয় "শেষকথা" পড়া।

লোকজন চলে গেলে আমরা পশ্চিমদিকের কোণের ঘরে এসে বসলাম। ঐ ঘরে সেবার কবি থাকছেন, উনি বললেন, দেখ আমার দুরবস্থাটা দেখাই। বিশাল জোব্বার হাতাটা তুলতে দেখি ডান হাতটা সম্পূর্ণ লাল দগদগে হয়ে গেছে। এখন যেখানে রবীন্দ্র ভারতীর বাড়ি ঐখানে একটি বিরাট বটগাছ ছিল তার মধ্যে অজস্র শুঁয়োপোকা জড়ো হয়ে ছিল। পাশেই কবির স্নানের ঘর, সেখানে জামাকাপড় রাখা আছে। কবি জোব্বা তুলে গায়ে দিয়েছেন, জোব্বার হাতায় দু একটি শুঁয়োপোকা বসেছিল, তারা শুঁয়ো ঘষে সমস্ত বিষাক্ত করে দিয়েছে। নরম মসৃণ হাত লাল দগদগে হয়ে গিয়েছে। কাউকে কিছু বলেন নি, কিছুই করা হয় নি। প্রায় ১১/১২ ঘণ্টা পর আমরা জানতে পারলাম ও যা কিছু করা সম্ভব, চেষ্টা করলাম। কী করে যে এতখানি কষ্ট নিয়ে অমন নির্বিকারভাবে এত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, এতটুকু বিকৃতি কেউ লক্ষ্য করল না। কি জানি! তাঁর অতুলনীয় চিত্তশক্তি শুধু মানসিক নয় শারীরিক কষ্টও কি সহজে জয় করতে পারত।

শারীরিক কোনো বিষয়েই তাঁর প্রকাশ্যে আলোচনা করতে ছিল কুণ্ঠা।

এমন কি নিমন্ত্রণে ছাড়া স্বল্প পরিচিত কারও সামনে খাবেনও না। আমাকে লাবণ্যদি ও অমিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে; কবির দাঁত বাঁধান কি না তাঁরা বুঝতে পারেন নি, কারণ শান্তিনিকেতনে কবির কাছাকাছি বড় হলেও তারা তো তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন নি। সম্প্রতি রোঁমা রোঁলার যে ডায়েরী বেরিয়েছে তাতে আছে যে গান্ধীজি খেতে বসে তাঁর বাঁধান দাঁত জোড়া আনিয়ে নিতেন ও সর্বসমক্ষে পরতেন। খাওয়া হলে খুলে ফেলতেন। এটি রবীন্দ্রনাথ করতেন না। আমার কাছে অনেকদিন ছিলেন, আমি সেবা করতুম ও সর্বদা কাছে থাকতুম বলেই জানি। একটি লাল বড় কৌটো বনমালী বালিশের পাশে রেখে দিত, রাত্রে তাঁর মধ্যে দাঁত রেখে উনি শুয়ে পড়তেন। এখানে আর একটি খবর লিখে রাখছি। দীর্ঘদিন কবি বিছানায় সোজা হয়ে শোন নি। বালিশে ঠেসান দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে থাকতেন। সেজন্য আমার বাড়িতে খাটের সঙ্গে back rest-এর ব্যবস্থা করেছিলুম—অন্যত্র অনেক বালিশ ও তাকিয়া জড়ো করে রাখা হত। এরকম বোধ হয় অনেক হৃদ-রোগীকেই করতে হয়। আমরা জানতুম রবীন্দ্রনাথের হার্টের দুর্বলতা আছে। উনি আমাকে তাই বলতেন—'এইখান দিয়েই মৃত্যুবান আসবে।' পা ফোলা ছিল। কিন্তু শেষটায় দেখা গেল তা নয়—হার্ট শেষ পর্যন্ত ভালোই ব্যবহার করেছে।

বাঁধান দাঁতের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে অচৈতন্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কালিমপং থেকে কলকাতায় এসে পৌছলাম—সেখানে ছিলাম প্রতিমাদি ও আমি। প্রতিমাদি খুবই অসুস্থ। নিজ হাতে কাজ করবার শক্তি ও কায়িক পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁর নেই—কাজেই সেবার সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছে। কলকাতায় এসে পৌছবার পর আরো অনেকে এলেন। তাঁরাও আমারই মতো। এই সব আনাড়ী নার্সদের দেখে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আদৌ ভালো লাগে নি। যেহেতু আমি এত দিন একাই দায়িত্ব নিয়েছিলাম তাই আমাকে খুব কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "এঁর বাঁধান দাঁত খুলে নাও নি কেন?"

আমিও ঈষৎ উদ্ধতভাবে, "খুলেছি, পরিষ্কার করে আবার পরিয়ে দিয়েছি।"

শাসনের সুরে, "পরালে কেন? তুমি জান না অচৈতন্য মানুষের শরীরে এসব রাখতে নেই?" সত্যিই কথাটা আমার জানা ছিল না। তবে শুনেই বুঝতে পারলাম কথাটা ঠিক। তাই মাথাটা একটু হেঁট হয়ে গেল।

খোলারও অবশ্য বিপদ ছিল। জ্ঞান হয়েই কবি বলতে লাগলেন—আমার

কথা কেড়ে নিয়ে গেল কে? রবীন্দ্রনাথকে বাক্যহারা করে এত কার সাহস?

শিল্পী মুকুল দে বালক বয়স থেকে মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকেছেন। তিনি কোথাও লিখেছেন যে একবার মাসাধিক কাল একসঙ্গে 'পদ্মা' বোটে ছিলেন—নৌকার শোবার ঘরে দুদিকে বিছানার মাঝখানে দেড় ফুট মাত্র ফাঁক। মুকুল দে লিখছেন, তাঁর ভারী শখ ছিল রবীন্দ্রনাথকে খালি গায়ে দেখবার কিন্তু অত নিকট সান্নিধ্যে থেকেও তাঁর সে সুযোগ হয় নি।

আমার বাবার কাছে শোনা আর একটি গল্পও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন বিশ দশকের প্রথম দিকে আমার পিতা ও রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন কোনো একটি বিশেষ আবেদন নিয়ে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন বারান্দায় বসে আছেন এবং একটি ভৃত্য তাঁকে তৈল মর্দন করছে—তিনি বললেন, "কী ব্যাপার রইবাবু"—সেই স্বল্পবাস স্থূলকায় তৈল নিষিক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অন্তরে শিউরে উঠছেন। কিন্তু মুখে নির্বিকার ভাব নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কোনো মন্তব্যই করেন নি, তবু তাঁর মনে হয়েছিল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় ইচ্ছা করেই কবির ধৈর্যের পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর এই সূক্ষ্ম শালীনতা ও রুচিবোধ অনেকের কাছেই রুচিবিলাস মনে হত। রবীন্দ্রনাথ সেটা ভালো করেই জানতেন এবং বলতেন, কিছুতেই পুরোপুরি বাঙালী হতে পারলুম না।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়াসু

নির্বিঘ্নে এসে পৌচেছি। এ পত্র তোমার প্রদত্ত লেখনী সাহায্যে রচিত হচ্চে—এর চালচলন ভালোই। মনোমোহনের খবরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কী রকম ব্যবস্থা হল জানিয়ো।

বর্দ্ধমানে বৌমা ও পুপের সঙ্গে মিলন হলো। পুপে খুব আনন্দিত। তার বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলচে। শান্তিনিকেতনেই বিবাহ স্থির হয়েছে। বোধহয় ডিসেম্বরের শেষভাগে।

গুয়োপোকার স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান আমার দেহ জুড়ে চলচে।

মাসীকে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—
১২।১১।৩৯

স্নেহাকৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

প্রভাত কুমারের লেখা রবীন্দ্রজীবনী বইখানা নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি। এখন দেখচি সেটা পুনসংস্কারের জন্য আমাকেই দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে আর কারো কৃত সংশোধনও ছিল—তাই গ্রন্থকারের পক্ষে বইখানি মূল্যবান। ওটা কোনো উপায়ে ফিরে পেলে কর্ত্তব্য রক্ষার সুযোগ পাব। তোমরা তো এখন দূরবর্তী যাই হোক সেটার প্রয়োজন আছে জেনে একটা উপায় কোরো।

পুপুর বিবাহের আয়োজনে এখানে সবাই ব্যস্ত। আমার ব্যস্ততা অন্য নানা ব্যাপার নিয়ে। ছুটি পাচ্চি নে।—বাঁ হাতের আঙুলে গুয়োপোকার জয়তোরণ স্ফীত হয়ে আছে। তোমরা কি কলকাতায় কিম্বা অন্যত্র। আশাকরি মনোমোহন এখন ভালো আছে। ইতি ১৬।১১।৩৯

কীটদষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan

কল্যাণীয়াসু

অবশেষে জ্বরে পড়েছি। একে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলা যেতে পারে। আর কোনো খবর নেই। সেই গুয়োপোকার অপকীর্তি এখনো পানিগ্রহণ করে আছে। ইতি তারিখ মনে পড়চে না। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

এখানে পুপের বিয়ের কথার উল্লেখ আছে। পুপের বিয়ে কিছুদিন আগে স্থির হয়েছে। পুপে বা নন্দিনীর জন্ম গুজরাটি পরিবারে। সে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা কিন্তু তার বিবাহ স্থির হয়েছে ধনী গুজরাটি

পরিবারে। আরো কিছুদিন পূর্বে তার নাচ দেখে অজিত সিং খাটাও মুগ্ধ হয়েছিল। এই বিবাহে যাঁরা ঘটকালী করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতমা হচ্ছেন মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া। এঁর খ্যাতি তখন থেকেই শুনছি—ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ যখন মংপুতে, তখন প্রতিমাদি গিয়েছিলেন বম্বেতে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে। মংপুতেই আমরা খবর পেয়েছিলুম যে বিবাহ স্থির। এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথকে ধরে পড়া হয়েছিল খাওয়ানোর জন্য এবং একটি রীতিমত ভোজ আদায় করেছিলুম আমরা মংপুতে। কিন্তু সেই থেকে কবির দুশ্চিন্তা পাছে রথীন্দ্রনাথ বিবাহে বেশি ব্যয় বাহুল্য বা জাঁকজমক করেন—এটা যেন তাঁর আতঙ্ক।

রথীদা উচ্চবিত্ত ঘরের মানুষ। তাঁর পিতা সর্বস্ব বিলিয়ে নিঃসম্বল হলেও রথীন্দ্রনাথ জমিদারেরই বংশধর। সেই তুলনায় তিনি এমন কিছু বিলাসী নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশার পূরণ হয় না। তাঁদের এই সুখ বিলাসপূর্ণ সংসারের অনেক কিছুই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনযোগ্য নয়।

মনে আছে একবার রথীদা মংপু এসে পৌছলেন। সঙ্গে দুটি ভৃত্য শিবু ও শম্ভু। দুটি এয়ারডেল কুকুর এবং এক ঝুড়ি মিষ্টি পান পাতা—পান নৈলে রথীদার চলে না আর পানপাতা মংপুর ত্রিসীমানায় নেই—আর ঠিক সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে একটি ছোট গল্প শেষ করছেন। বলে বলেও তাঁকে ওঠান যাচ্ছে না। বলছেন সময়মত পাঠাতে হবে শারদীয়ার জন্য। আনন্দবাজার আমাকে একশ' টাকা দেবে বলেছে।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার জন্য অনেক করেছেন, তাঁর কন্যারা যা করেন নি। পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে তিনি যা পেয়েছেন তা অন্য কোনো আত্মীয় বা আত্মজার কাছে নয়। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ যা নন তিনি তা তো হতে পারেন না।

নন্দিনীর বিয়েতে বেশি ধুমধাম হবে এটা তার দাদামশায়ের একেবারেই অভিপ্রেত নয়। রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত আমাকে ও সুধাকান্তবাবুকে এসব কথা বলেন কিন্তু পুত্রের সঙ্গে সরাসরি কথা হয় না বললেই হয়।

পুত্রও বাপের কাছে বেশি আসেন না, যখন আসেন অনেক দূরে জুতো খুলে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ান। রথীদা যতটা সমীহ করে চলেন প্রতিমাদি তার চেয়ে অনেক সহজ।

তবু রথীদা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর পিতা খরচের কথা ভেবে কতটা উদ্বিগ্ন। একদিন আমাকে বললেন, তুমি বাবাকে নিশ্চিন্ত হতে বল, বিবাহের জন্য খরচ যা হবে তা, যে পঁচিশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্স আছে

তাই থেকেই হবে। সে টাকা তো ঐ জন্যই—আমি তো বিশ্বভারতীর ক্ষতি করছি না। কিন্তু কবি তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না, কারণ ওঁর আপত্তি তো অন্য কারণে—এই ধরনের বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্যতাই ওঁকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে একবার বলেছিলেন, দেখো গান্ধীজির আশ্রম থেকে ফিরে এসে ওরা বলে সেখানে প্যাকিংকেসের উপর বসতে দিয়েছে, কী সিমপ্লিসিটি! এদিকে আমার আশ্রমের আদর্শের ভিত নড়িয়ে দিলে।

মনে আছে একদিন তাঁকে শান্ত করবার জন্য আমি খুব সরলভাবে বা বোকার মতো বললাম যে, রথীদার তো এইটিই প্রথম এবং শেষ কাজ, আপনাদের বাড়িতে এরকম উৎসব আর হবে না। একটু ঘটা হলে তো সবাই খুশি হবে। আমার এই মন্তব্যে কবি ভারী ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, তুমি বল কি মৈত্রেয়ী, আমাকেও কি লৌকিকতা করে খ্যাতি বজায় রাখতে হবে? তোমরা আমায় ভাবো কি? জোড়াসাঁকোয় ঝাঁকজমক করুক বা পতিসরে রাজবাড়ি বানাক ক্ষতি নেই কিন্তু এখানে নয়—আশ্রমে নয়। তাতে কি ক্ষতি হয় তোমরা বুঝতে পার না? তোমরা কি আমার কোনো কথাই বোঝ না?

বিয়েতে ঘটা অবশ্য হল খুব। সামনের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে বিরাট শামিয়ানা, বরযাত্রীদের জন্য বড় বড় গুজরাটি থালাবাটি ইলেকট্রোপ্লেট করে রূপার মত দেখতে হল—সমারোহের অন্ত নেই। কবি শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন—উদীচী বাড়িতে বসে যতটুকু খবর পাচ্ছিলেন তাতে বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এত বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে, বিয়ের ৪।৫ দিন আগে প্রতিমাদির দেওয়া প্রণামী শাড়িখানি নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। রথীদা প্রতিমাদিকে দুঃখ দেওয়া হল খুবই, তার জন্য মনস্তাপও হচ্ছিল। প্রতিমাদি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বাবামশায় তোমাকে কী বলেছেন বল! কবি স্পষ্টতই আমাকে বলেছিলেন, কী জন্য যে কাজ আমার এত অনিচ্ছায় হচ্ছে তাতে তোমরা যোগ দিচ্ছ? সমর্থন করছ? এই গোলমাল দেখে আমি চলে আসাই স্থির করলাম। রানী মহলানবীশও দেখলাম, বিয়ের ২।৪ দিন আগে মাদ্রাজ না কোথায় চলে গেলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলেন নি কিন্তু আমার মনে হয় কারণ একই। সেই সময় আমার ছোট বোনের বিয়েও স্থির হয়েছিল, সে-ও যথেষ্ট সমারোহেই নিষ্পন্ন হবে—কবির তখন বিবাহের ঝাঁকজমক ব্যাপারটাতেই অরুচি। বেশ কয়েকটা চিঠিতে তা বোঝা যাবে। অথচ ওঁর মধ্যে contradictionও কম নয়—নন্দিনীর বিবাহ বাসরে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে কে বলবে যে উনি অসন্তুষ্ট বা অনিচ্ছায় ওখানে বসে আছেন! আরো

মজা এই বিয়ের পরই আমায় একটা চিঠিতে লিখছেন "তুমি থাকলে দেখে খুশি হতে!" অথচ খুশি হবার সুযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট করেছেন নিজেই। যাই হোক এই ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা কোনোদিনও উনি সম্পূর্ণ মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এই সময় আমার স্বামী মনোমোহন সেন সামান্য অসুস্থ হন। ব্লাডপ্রেসার একটু বাড়ে। কবি তা নিয়েও খুবই চিন্তিত। পরের চিঠিগুলিতে তার উল্লেখ আছে।

৬

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

কোনো জরুরী নেই। বইখানি কিছুকাল পরে পেলেও কারো কোনো ক্ষতি নেই। খুব সম্ভব আমাদের অন্য বইগুলোর সঙ্গে সে এক বাহনেই যাত্রা করেছে। তারা সকলেই এখন নিরুদ্দিষ্ট। আলুর বিশ্বাস বইখানা আমাদের বইয়ের সঙ্গলাভ করে এক অদৃষ্টের ভাগী হয়েছে।

আমাব জ্বরের সংবাদ দিয়েছিলুম। আজ আর তার কোনো লক্ষণ নেই। এখন তার ব্যবহার সহজ জীবেরই মতো। কিন্তু মনোমোহনের জন্য মন উদ্বিগ্ন আছে। তাড়াতাড়ি কর্মস্থানে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

এখানকার সর্বপ্রধান সংবাদ হচ্ছে পুপুর বিবাহ। আনন্দে উদ্বেল তার চিত্ত। অন্য মেয়েরা এ অবস্থায় একটু যে সলজ্জ হয়ে ওঠে তার কোনো আভাস তার নেই। ওর ভাবী সম্বন্ধ নিয়ে মুখরভাবেই গর্ব অনুভব করচে।

আমার সামনে একটা ফাঁড়া আছে আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্চে মেদিনীপুরে—বেশ একটু সমারোহ সহকাবে। আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই দিন স্থির হয়েচে। দু তিন দিন থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। এই সমস্ত উপসর্গ আমার পক্ষে সঙ্কটজনক—অথচ অপরিহার্য এর কর্তব্যতা।

আমার পাদুকাযুগল এতদিনে তোমার করতলগত হয়ে থাকবে আবার কোনো সময় আমার পদতলবর্তী হলে আশ্বস্ত হব—যদি সঙ্গী জুটিয়ে আনে আরো ভালো।

এই মাত্র স্নান করে এলুম অতএব কিছু ক্লান্ত আছি। ইতি—১১।১১।৩৯

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ

ও

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তোমার তুর্দিন যাচ্চে। অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। ভালো খবরের জন্য উৎসুক হয়ে রইলুম। এখন মনে হচ্চে রাঁচি তোমাদের পক্ষে ভালো জায়গা হতে পারত। কী জানি। আমার জ্বর ছেড়ে গেছে পূর্বেই লিখেছি। মেদেনীপুরে যাবার তারিখ পড়েছে ১৬ই। ১৮ই-র মধ্যে ফিরতেই হবে কারণ ৭ই পৌষ তখন আসন্ন হবে।

বইগুলো এসেছে। প্রভাতকুমারের সে বইখানা এর মধ্যে নেই। মনে রেখো সেজন্যে ব্যস্ত হওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যখন হোক ফিরে যখন যাবে পাঠিয়ে দিয়ো। বইটা প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু জরুরী নয়।

(কথা ছিল ডিসেম্বরের শুরুতে যাব মেদেনীপুরে কিন্তু তারিখ বদল হল যাব ১৬ই) মতিভ্রম একেই বলে—আবার মেদেনীপুরের তারিখ দিতে যাচ্ছিলুম। বৌমার শরীর অসুস্থ বলে গেছেন শ্রীনিকেতনে। রথী গেছে কলকাতায় পুপুর বিয়ের আয়োজন সংগ্রহ উপলক্ষ্যে। ইতি

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ

ব্র্যাকেটের অংশ লিখে আবার কাটা।

ও

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তুমি জানো আমার একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, কারো অসুখের সংবাদে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। মনোমোহনের ব্যামোর বার্তা আমাকে বিষম ব্যস্ত করে তুলেছিল এ অবস্থায় সুদীর্ঘকাল তোমাদের মৌন আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠছিল—আজ তোমাদের চিঠি পেয়ে এই সকালবেলায় খেজুর রসের আস্বাদনটা বিশেষ উপভোগ্য বোধ হল। ইংরেজ জর্মনের যুদ্ধের খবর এখানে নিরতিশয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে—যেন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক—পুপুর বিবাহ সমারোহের আয়োজনে। সংসারের আর সমস্ত কলরব আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। হিটলারের চেয়েও বেশী করে দৃষ্টি পড়চে ঐ কন্যাটির পরে—খবরের কাগজগুলোর নিরবচ্ছিন্ন তুচ্ছতায় প্রতিদিন বিস্ময়বোধ করচি। তোমাদের ঘরের মধ্যেও

আবহাওয়ার এই রকমই অবস্থা। তাই ভেবেছিলুম তোমাদের বধূ অভিষেক তার "রাজবদ্ধমতধ্বনি"র পিছনে আমাদের দীপ্তিহীন অস্তিত্বের সমস্ত দাবীকে তিরস্কৃত করে দিয়েছে। তাই ভেবে রেখেছিলুম তোমাদের পাড়া থেকে সাড়া পাবার প্রত্যাশা সুচিত্রার বিবাহের অন্তত এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত পিছিয়ে রেখে দেব। তোমার ঘরে দুশ্চিন্তার কারণ যদি না ঘটত তাহলে আমি মৌন অবলম্বন করে থাকতুম।—হঠাৎ আমার লেখনী প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে তোমাদের কাজের ব্যাঘাত যেন না করে। ইতি ৩০ নবেম্বর ১৯৩৯

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

তোমাদের ঘরে সর্বনেশে চুরির খবর শুনে উৎকণ্ঠিত হলুম। পুলিশের প্রযত্নে কিছু তার উদ্ধার হতে পারে সেই বৃথা আশা ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা ছাড়া বোধহয় আর কোনো সান্ত্বনার পন্থা নেই। তুমি লিখেছ চোরদের প্রয়োজন হয়ত তোমার প্রসাধনের প্রয়োজনের চাইতে বেশি সে ভুলটা আবিষ্কার করতে পেরেছ। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রে চোরের ব্যবসায় সবচেয়ে অর্থকরী —ভদ্র চোরের অভাব নেই সমাজে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে। যা হোক ইতিমধ্যে আমাদের এখানে যদি আসতে পারো তাহলে খুশি হব। সেই উপলক্ষ্যে আমার রুশীয় চরণাবরণটা নিয়ে এসো তাহলে নিশ্চিন্ত হই। আমার যতই ঠাণ্ডায় পা কনকন করচে আলুকে ততই তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে অভিসম্পাত দিচ্চি। আমার আয়ুতে যে কটা শীত ঋতু এখনো অবশিষ্ট আছে সে কটার জন্যে ঐ জুতাকে ডাকচি। আয়াহি বরদে দেবি—তার অভাবে অন্য দেবীদের আহ্বান করচি চরণতল মার্জনা করে উষ্ণতা সঞ্চার করতে। কিন্তু সেই ক্ষণকালীন সেবায় যতটুকু তাপ পাওয়া যায় তাতে সেই জুতোর জন্য পরিতাপ দূর হয় না। ইতি ২১।১২।৩৯

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

এখানে যে জুতোর কথা লেখা হয়েছে, রাশিয়াতে 'মোকাসিন' ধরনের ঐ জুতো জোড়া উপহার দিয়েছিল, আমি সেই নকশা দেখিয়ে সবুজ সোয়েডের একজোড়া করিয়ে দিয়েছিলাম। মেদিনীপুর যাবার পথে কবি কলকাতায় এসেছিলেন। অনিলবাবু, টেলিফোন করেছিলেন আমাদের বাড়িতে জানবার

জন্য ওঁদের সঙ্গে আমার মেদিনীপুর যাবার ইচ্ছা আছে কি না। তার ঠিক পূর্বরাত্রে আমাদের বাড়ি থেকে আমার বোন চিত্রিতার বৌভাতের দিন আমার সমস্ত গহনা চুরি হয়ে যায়। আমার কাছে ছিল আমার শ্বশুরবাড়ির সাবেক কালের ভারি ভারি সোনার গহনা।

আমাদের এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিতে কবি কি রকম উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি। এতখানি সম্পত্তি হারিয়ে আমি হয়ত কষ্ট পাচ্ছি এই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়। শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে আমি বিশেষ দুঃখিত বা বিচলিত হইনি দেখে খুবই খুশী হয়েছিলেন। আমাকে পুনর্বার আলমোড়া থেকে রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে ফেরবার পথে মানিব্যাগ হারানোর গল্পটি বলেছিলেন। মানিব্যাগ হারানোর গল্পটি কবি প্রায়ই বলতেন, কারণ সেই অভিজ্ঞতার তীক্ষ্নতা ছিল অন্যরূপ, শুধু টাকা হারানো নয়, রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া। কিন্তু শিলাইদহের কৃষি ব্যাঙ্কে যে অত টাকা লোকসান হয়ে গেল সে কথা কোনও দিনও তাঁর মুখে শুনি নি।

বাহ্যবস্তু, অর্থসম্পদ, সোনা রূপা একদিক থেকে প্রয়োজনীয় হলেও এগুলো সত্যই মানুষের কাছে চরম মূল্য পাবার যোগ্য নয়। যথার্থ মূল্যবান বস্তু কী তা মানুষের সারা জীবন কেটে যায়, তবু চিনতে পারে না। সেজন্য গহনার শোকে যে আমি কাতর নই এটা তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। আমিও প্রথমে কৃপণ কবিতাটা পরে কথা ও কাহিনীর কবিতাটা বলেছিলাম—"দ্বিতীয় কঙ্কনখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে, সাধু কহিলেন আছে ঐ নদী তলে—" কিন্তু আজ বুঝতে পারি আসল ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। সে সময়ে কবিকে নিকটে পাবার, পরমাত্মীয় রূপে পাবার সৌভাগ্যে আমার 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান' বাজছিল। অন্য সমস্তই তখন সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছিলো। সারা দিন মনে মনে আমি যে আনন্দে ভরপুর তার সুর নামিয়ে দেবার মতো শক্তি কোনো সাংসারিক লাভ ক্ষতির ছিল না। "আকাশ জল বাতাস আলো সবারে কবে বাসিব ভালো—হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে—" এই গানের সত্যতা এমন করে আগে কখনো বুঝিনি।

এইবারে ডিসেম্বরে খৃষ্টজন্মোৎসব হবে। এনড্রুজ সাহেব আসবেন। সকাল থেকে কি ভাবছেন। দুপুরবেলা আমাকে বললেন, আমার খৃষ্টের উপর একটা গদ্য কবিতা আছে না? না তুমি তো আবার গদ্য কবিতা পড় না! আমি বললুম, আচ্ছা বের করে দিচ্ছি। পুনশ্চ থেকে 'মানবপুত্র' কবিতাটা

বার করে দিলুম। কবি বললেন, এবার তুমি পালাও আমি এটাতে সুর দেব। সন্ধ্যাবেলা এসে শুনি 'একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে' গানটি তৈরী হয়েছে। কবি বললেন, এটি খৃষ্টদিবসে গাওয়া হবে—সাহেব খুশি হবে।

পরদিন সকালে ডাক পড়ল ইন্দুলেখা ঘোষের। তাঁর গলায় তুলে দিলেন গানটি—তারপর বললেন, এই যে দেখছ—মেয়ে আমার কাছ থেকে গান শিখলে, এর পরে আমি গাইলে বলবে আপনার ভুল হচ্ছে! এমন সময় সাহেব ঢুকলেন ও গুরুদেব বলে গলা জড়িয়ে ধরলেন। যেন দুই বিরাট হৃদয়সমুদ্র এক হয়ে গেল।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়াসু

পুপের বিয়েতে সমারোহের অন্ত ছিল না। আমি যদিও আমার নূতন বাড়ির শিখর কক্ষে দূরে বসেছিলুম তবু কোলাহলের ঢেউ লাগছিল এখানে। সুসম্পন্ন হয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা—দেখলে খুশি হতে।

সুচিত্রার * বিবাহে তুমি বন্ধ ছিলে সেটা আমার উচিৎ বলে বোধ হয় নি। অন্য সকল কাজের উপরে তোমার কর্ত্তব্য ছিল অন্যত্র। যা হোক যথাস্থানে তুমি গেছ কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

আজ এল মাসির উপহারের দ্বিতীয় সংস্করণ; আসবামাত্র তার উদ্ঘাটন ব্যাপারটা পড়েছিল প্রলয় দেবতা মহাদেবেরই হাতে, একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস-রসিকতা—কিন্তু ভাগ্যদেবতা এবার একই উপহাসের পুনরাবৃত্তি করেন নি—জিনিষটা আস্তই পাওয়া গেল। তবু মনে এই দুঃখ রয়ে গেল যে মাসীর দানের এটা পুনশ্চ নিবেদন।

তোমরা অন্য দানগুলোত অক্ষুণ্ণ ভাবে এসেছে। অসম্ভব শীত পড়াতে আজকাল···স্নান বিশেষভাবে দুঃখাবহ হয়ে পড়েছে। মংপুতেও এরকম স্নানকুণ্ঠা অনুভব করি নি। তোমার স্নানরেণু অভিষেকের দুঃখ কিছু লাঘব করবে—কিন্তু আমি অপেক্ষা করচি বসন্তের—তখন এর উপভোগ্যতা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হবে।

বিশ্বভারতীর কর্মচারী কিশোরী সাঁৎরা blood pressure-এর রোগী। যে

* আমার ভগ্নী চিত্রিতার বিবাহ উপলক্ষে অনেক দিন কলকাতায় ছিলাম। তখন আমার স্বামী অসুস্থ ছিলেন সেই কারণে ভর্ৎসনা।

জর্মন ওষুধ খেয়ে সে কিছু আরাম বোধ করেছিল এখন সে আর পাওয়া যাবে না বলে উৎকণ্ঠিত ছিল—আমি তাকে রসুনের ব্যবস্থা করেছিলুম খেয়ে সে অন্য ওষুধের চেয়েও সদ্য ফল পেয়েছে—জর্মন যুদ্ধের জন্যে এখন সে বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ। ইতি ৪।১।৪০

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ

মাসী একটি তিব্বতী চায়ের কাপ কালিমপং থেকে এনে কবিকে উপহার দিয়েছিল। বাক্স থেকে বের করবার সময় মহাদেব সেটি ভেঙে ফেলে, তাই মাসী আর একটি পাঠিয়ে দেয়।

যখন কবি আমাদের কাছে থাকতেন তখন মাসী ও আমি প্রায়ই তাঁকে ছোটখাটো কিছু উপহার দিতাম। মাসী দিত ছবি আঁকবার জিনিসপত্র, আমি এটা ওটা। কলম ছাড়া আর একটা জিনিস খুব পছন্দ ছিল bath salt, নাম দিয়েছিলেন 'স্নানরেণু'। মংপুতে অনেক সময় জোড়াসাঁকোর বাড়ির ম্যানেজার ভোলাকে লিখে চিৎপুরের পুরানো দোকান থেকে পুরানো নানারকম জিনিস আমাদের প্রত্যুপহার দিয়েছেন। সে সব যেন কোন বিস্মৃত জগতের রূপকথার রাজ্য থেকে আনা। আধুনিক কালের উপহার দ্রব্য ওঁর জানা ছিল না।

একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমি ছবি আঁকবার কাগজের ব্লক ও একবাক্স রঙীন কালি উপহার নিয়ে গিয়েছি। কবি জিনিসগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন—"কত দিচ্ছ তোমরা আমি তো লজ্জায় পড়েছি"—তারপর গুণগুণ করে—"প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে".

গানটা সেই মুহূর্তে এত মধুর এত সুন্দর লাগল। এমন যথার্থভাবে আমার মনের কথা বলা হ'ল—এমন করে ধন্যবাদ দিতে আর কে পারবে?

সেদিন কবি বললেন, "আমিও একেবারে অকিঞ্চন নই—আমিও উপহার দিতে পারি—সুধাকান্ত কোথায় তোদের জিনিসপত্র বার কর।"—খাটের উপর একটা মোড়ক রাখা ছিল, সুধাকান্তবাবু সেটি খুলে কবির হাতে দিলেন—শ্যাওলা রঙের উপর সাদা বাটিকের কাজ একটা শাড়ি আর একটা ছোট সোয়েডের ব্যাগ লাল টুকটুকে, তার উপর সোনালী চামড়ার ফুল লাগান। আমি একটু দূরে বসেছিলাম, কবি শাড়িটা ছুঁড়ে দিলেন, 'দেখো পছন্দ হয় কিনা—ওরা অনেকগুলো সাড়ি দেখালে তার মধ্যে একটা ছিল মঞ্জিষ্ঠা রঙের

লাল। আমি বললুম সব রং তো···" "আর বলতে হবে না, আপনি বললেন ও রং আমাকে মানাবে না।" "এই দেখো তোমার বুদ্ধি কীরকম তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, কিছু আর খুলে বলতে হয় না! আরো বলছিলাম—এই কাল যারা সন্ধ্যাবেলা এসেছিল তাদের মতো যদি চেহারা হয় তবেই ও রং মানায়।" আমি বললাম, "এটা আর মোটেই ঠাট্টা হচ্ছে না, খাঁটি সত্য।"

আগের দিন সন্ধ্যায় এসেছিলেন হেমন্তবালা দেবী তাঁর নব বিবাহিতা পুত্রবধূ ও কন্যা বাসন্তীকে নিয়ে। হেমন্তবালা নিজে সুন্দরী নন কিন্তু তাঁর ক।। বাসন্তী শ্রীময়ী আর পুত্রবধূ তো অতুলনীয়া সুন্দরী—অন্তত আমার চোখে সেদিন তাই লেগেছিল।

হেমন্তবালা দেবীকে আমি কবির কাছে দু চারবার দেখেছি। মংপুতে ওঁর দীর্ঘ পত্র আসত, সেগুলোর কিছু কিছু পড়েছি। ক্যালেণ্ডারের পিছনে লেখা, বসুমতীর ছবির পিছনে লেখা, অর্থাৎ যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছেন তার পিছনে এলোমেলোভাবে সাত আট পাতা চিঠি লিখে যেতেন। একবার এই রকম একটা চিঠিতে কবিকে যা লিখেছেন, তা আমার কানে কটু ঠেকল। আমি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই কবিকে বললাম—"এই ভদ্রমহিলা আপনাকে এত বকাবকি করেন কেন?" কবি বললেন, "ওর সঙ্গে আমার মতে মেলে না যে।" "বাঃ তাই বলে আপনাকে এইরকম রূঢ়ভাবে লিখবেন?" "কৈ রূঢ়ভাবে তো লেখেনি।" তারপর মুচকি হেসে—"ঈর্ষা নাকি?" পরের দিনই হেমন্তবালার আর একখানি চিঠি এল—দাদা আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাকে ওরকম চিঠি লেখা আমার অন্যায় হয়েছে। কবি চিঠিখানা আমাব হাতে দিয়ে বললেন "তোমারই জিৎ"—

মংপুর নির্জনতা আমার কিছুতেই অভ্যাস হয় না। বিশেষত কবি যখন দলবল নিয়ে আনন্দের হাট বন্ধ করে চলে যান তখন শূন্যতা আমাকে অবসাদে ভরিয়ে দেয়। এ ছাড়াও আজ বুঝতে পারি, আমার মধ্যে একটা কর্মস্পৃহা বোতলে বন্দী দৈত্যের মত অবস্থায় ছটফট করত। আমি নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়। আমার মানুষ চাই, কর্ম চাই, পথ চাই। আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালোবাসি বটে কিন্তু শুধু তারই মধ্যে বসে আমি আত্ম-আবর্তন করতে পারি না। এখানেও নানারকম কাজ আমি হাতে নিই কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় না।

শেষ বয়সে যখন মানুষের মধ্যে এলাম, নানা ভাবে মানুষের কাজ করবার

সুযোগ পেলাম, তখনই আমি নিজের মধ্যে সার্থকতার স্বাদ পেলাম। আজ আমি জানি এরই জন্য আমার অপেক্ষা ছিল, আমার শূন্যতা ছিল, কান্না ছিল, কবি সে কথা আমার চেয়ে ভালো করে বুঝতেন। আমাকে কি কাজে লাগানো যায় সর্বদা ভাবতেন। একবার ইতিহাস পড়তে বলেছিলেন। আমি প্রচুর ইতিহাসের বই পড়েছিলুম। এবারে কিছুদিন থেকে উনি আমাকে মহাভারত পড়তে বললেন। তখন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারত আমি সমনোযোগে পড়তে শুরু করলাম। পড়ে আমার নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়ল বটে কিন্তু এ বিদ্যা আমি বিশেষ কিছু কাজে লাগাতে পারিনি। কবি হয়ত অনেককেই বলে থাকবেন, অন্যেরা কাজে লাগিয়েছে।

উনি আক্ষেপ করতেন, আমাদের দেশে মেয়েদের কর্মক্ষেত্র এত সীমিত বলে। আমাকে বহুবার বলেছেন, আমি যখন থাকব না তখন শান্তিনিকেতনে এস, কোনো কাজে লেগো, সে আমারই কাজ করা হবে। এখন এসো না কারণ এখন এলে আমার জন্য আসবে, কাজের জন্য নয়।

তাঁর সে ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ করতে পারি নি, কারণ তিনি যেখানে নেই দেখা গেল তাঁর ইচ্ছাও সেখানে নেই।

Founder President	Visva-Bharati	Santiniketan
Rabindranath Tagore		Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

সমুদ্র মন্থন করেছিলেন দেবাসুরে। তুমি মহাভারত মন্থন করচ অনেক অদ্ভুৎ পদার্থ পাবে কিন্তু সাগরোদ্ভবা উর্বশীকে পাবে না। কোথায় তাঁর জন্ম তার কোনো ঠিকানা না পেয়ে অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যে তাঁর সম্ভাবনা নির্দেশ করে দিয়েছি—যদি সন্দেহ কর তাহলে সেইখানে ডুব দিতে হবে।

বিবাহ সমারোহ চুকে গেছে। এখন সব চুপচাপ। সামনে মাঘোৎসব এখন থেকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মহাভারতের কাজ শেষ হয়ে গেলে বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগুলো একবার দেখে নিয়ো। ইতি— ১৪।১।৪০

মহাভারতে সমুদ্রমন্থন পড়তে গিয়ে দেখি সমুদ্র থেকে উঠেছিল লক্ষ্মী চন্দ্র পারিজাত ধন্বন্তরী অমৃত ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা। উর্বশীর কথা কোথাও নেই। অথচ বরাবর পড়ে আসছি—

৮

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে—
ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।

কিংবা বলাকার ২৩নং কবিতা— ৮

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী
স্বর্গের অপ্সরী
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।

যা হোক দেখা গেল উর্বশীর কল্পনা এক মহাকবির আর তার উদ্ভবের কল্পনা আর একজনের।

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

আমাদের সকলেরই সমস্যা একই। জীবনের পথ বন্ধুর এবং বাধাগুলি জটিল। নিজের মনকে শান্ত করতে পারিনে বলে বাইরের সমস্ত সঙ্কট অনর্থক অতিমাত্র হয়ে ওঠে। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধকে সত্য করবার ধারাটাকে যে পরিমাণ সার্থক করতে পারি সেই পরিমাণেই শান্তি পাই—যত বিচ্ছিন্ন থাকি ততই দুঃখ পাই কেননা বিচ্ছিন্নতায় মানুষ সত্য নয়। ব্যক্তিজীবনে বিচ্ছিন্নতা অবসাদ আনে। নেশনগত জীবনে বিচ্ছিন্নতা আনে প্রলয়। আমার মন কবিধর্মী এই মনে কল্পনাবৃত্তির সঙ্গে আছে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য। এই হৃদয়াবেগ

যদি অবরুদ্ধ থাকে প্রাত্যহিক জীবনের সীমায় তাকে যদি কোনো একটা বৃহৎ আকাশের অধিকার না দেওয়া হয় তাহলে সে ডানা ঝাপটিয়ে মরে! আমি তাই কোণের মধ্যে কবিতার নীড় বেঁধে জীবন কাটাই নি—প্রশস্ত করে চলেছি মানুষের সঙ্গে মেলবার আসন। নিজের অন্তর থেকে বা বাইরে থেকে এতে যখন বাধা পাই তখনি দুঃখ আসে। মনকে যদি ছড়িয়ে দিতে পারো তো বেঁচে যাবে। আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে বৃহৎ মিলনের সুযোগ মেয়েদের পক্ষে দুর্লভ। নেপথ্য থেকে যতদূর সম্ভব কাজ করতে থাকো—সে কাজ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। মহাভারত নিয়ে পড়েচ সেও বড়ো সামান্য কাজ নয়।

এখান থেকে বরবধূ চলে গেছে। কিছুদিন খুবই ধুমধাম হয়ে গেল—এ সব ব্যাপারে মনটাকে ঘুলিয়ে দেয়—অনেকখানি মনে হয় যেন অবাস্তবের রঙীন কুয়াশা। ইতি—২৭।১।৪০

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ

Visva-Bharati

Founder President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

Winternitz-এর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। Hopkins-এর বোধ হয় সংস্কৃত Epic এই দুটো বই থেকে কিছু তথ্য পাবে—Harold Richards (এর) কোন বই ভুলে গেছি। মিঠুর চিঠি পেলুম। সে প্রশ্ন করেছে কবে আসব—অক্ষর তার হাতের, কিন্তু ভাষাটা বোধ হচ্চে কোনো বর্ষীয়সীর—দিন ক্ষণ অনিশ্চিত। বসন্ত সমুপাগত। আম্রমুকুলে শাখা ভারাক্রান্ত, পুষ্পিত শিমূল শাখায় মধুপিপাসু পাখীদের ভোজ লেগেচে, পলাশ আর অপেক্ষা করতে পারচে না। ইতি ৭।২।৪০

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিঠুয়া
মৈত্রেয়ী দেবীর যত্নাধীনে—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

মিঠুয়া
দাদুরে যে মনে করে
লিখেছ এ চিঠি

তাই ভাবি দাদুতেও
আছে কিছু মিঠি।
সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি
অথবা চকোলেটের স্মৃতি ?
এ কথাটা সংসারে
নয় খুব সোজা
হয়তো বছর কয় যাবে নাকো বোঝা
তবু যদি লিখে রাখি তাহে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি
আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি—
১৭।৩।৪০ দাদু

মংপুতে একটানা বেশিদিন থাকবার পর যদি বর্ষা নামত তাহলে কবির সমতটে ফেরবার জন্য আগ্রহ হত। যদিও শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে বর্ষাই তাঁর প্রিয় ঋতু—মাঠের উপর দিয়ে ভৈরব হরষে যখন সে আসে কবি হর্ষিত হন। কিন্তু পাহাড়ের ঝিরিঝিরি স্যাঁতসেঁতে বৃষ্টি, শীত শীত ভাব বড় একঘেয়ে হয়ে উঠত। তখন পরিবর্তন প্রয়াসী কবির মন পাহাড়ের বেড়া এবং আমার বেড়া সরিয়ে প্রান্তরে নেমে পড়তে চাইত। কিন্তু ফিরে গিয়েও মংপু প্রত্যাবর্তনের কথা সর্বদাই বলতেন—ছুটিগুলিতে মংপু আসবেন এ একরকম স্থিরই ছিল।

মংপুর প্রকৃতি, বাতাসের স্নিগ্ধতা, অরণ্যানীর শ্যামলতা, সারাদিন কবিতা গান ও নানা ভাবের সমারোহে, কর্মক্ষেত্রের বিবিধ দুশ্চিন্তা থেকে দূরে, দিনগুলো হাল্কা ভারহীন সরস বাতাসে পাল তুলে ফিরে যাচ্ছে অতীতের হারানো জগতে। মংপুতে বসেই 'ছেলেবেলা' লেখা শুরু এবং প্রায় শেষ হয়ে এল। 'ছেলেবেলা' পাঁচ ছয়বার কপি করেছি, কবি কেটেছেন আবার কপি করেছি। অবিশ্রাম কাটাকুটি চলত ইদানীংকার প্রত্যেকটি লেখায়। মংপুতে লেখা নানা কবিতা গল্প প্রবন্ধের মধ্যে সেই আশ্চর্য কবিতা "অসম্ভব" যেখানে কোন পুরানো সুদূর জগতের যূথীবন থেকে ভেসে এসেছে "সুধার স্বাদ"।

মংপু থেকে চলে গিয়েও তাই মংপুকে ভুলে যেতেন না।

হঠাৎ চিঠি পেলাম কবিতায়—মধুর জন্য আবদার করে। মংপুর কমলা-বনের উৎকৃষ্ট মধু ও শীতকালে কমলালেবু আমি পাঠাতাম। লেবুগুলি পাঠ-ভবনের ছেলেদের ডেকে খাওয়াতেন।

ওঁ

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬

Uttarayan
Santiniketan

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মউচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পারো ডাকে
বিলাতী শুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
গুড়ং দদ্যাৎ বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই,—
বিমর্ষ মুখে বলি গুড়ং দদ্যাৎ
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পশ্চাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিঃশ্বাস ফেলে বলে সকলি অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য
গৌড়ী গদ্য হতে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য॥

ইতি রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় দিনই আর একটি চিঠি পেলাম কবিতায়। সত্যিই সে বছর মধু পাওয়া যাচ্ছিল না। পাছে পাঠাতে না পেরে আমার দুঃখ হয় তাই এই কবিতা। আমরা অবশ্য প্রচুর মধু সংগ্রহ করে পাঠাতে পেরেছিলাম।

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তল্লাস করেছিনু হেথাকার বৃক্ষের
চারিদিকে লক্ষণ মধু দুর্ভিক্ষের

মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধু ভাণ্ডার
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবী করবার।
মৌচাক রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই
জাস্তি না মিলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তাহলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিট্‌ক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন, কম বটে গুড়ে তা
পূরণ করিয়া লব টোমাটোয় জুড়ে তা।
এইভাবে করা ভালো সন্তোষ আশ্রয়,
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়।

স্নেহাসক্ত

ইতি ২৭।২।৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কবিতার উত্তরে আমি কবিতায় লিখলাম—

শ্রীচরণেষু

কে বলেছে মৌচাক ধরে নাই বৃক্ষ
হৃদয়ে হয়েছে কার মধু দুর্ভিক্ষ
মৌমাছি গুঞ্জিত কমলার বনময়
কৃপণের ভাণ্ডারে আছে মধু সঞ্চয়
মধুসন্ধানী সেথা যাবে আজ রাত্রে
মাধুরী আনিবে হরি মৃণ্ময় পাত্রে
তারও পরে আরো কিছু আছে অবশিষ্ট
নিঙাড়ি ফেলিতে হবে মধু উৎসৃষ্ট

অতএব দিন দুই দেরী যদি ঘটে যায়
মধুহীন বলে যেন বাদ নাহি রটে যায়
নীল মেঘ ছায়াময় ঘন বনে পাহাড়ের
দেখেছিলে বনফুল বেশি নয় বাহারের
তাহারাও প্রতিদিন কবিবেই স্মরিছে
সে স্মরণে অন্তরে মধু তার ভরিছে—
সেই বনমধু আজ সে পাঠাবে কবিরে
দিনে দিনে সঞ্চিত হৃদয়ের গভীরে।

প্রণামান্তে
মৈত্রেয়ী

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাকহরকরা
আজি হতে তিরোহিত পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্নে পরাহ্নে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে,
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।
যে দাক্ষিণ্য উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রস যোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দিবে তোমারে আমার পরিহাস,
তখন তো জানি নাই গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ দানে।।

৫।৩।৪০

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরো কিছু মধু পেয়ে আনন্দিত কবির জয়গান!

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

দূর হতে কয় কবি
জয় জয় মাংপবী

কমলাকানন তব না হউক শূন্য
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দান পুণ্য।
তোমাদের বন ময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক রচনায় চির নৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখ ভার
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।
আরবার কয় কবি
জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য
রুটি বলে জয় জয়
লুচিও যে তাই কয়
মধু যে ঘোষণা করে তোমারি তারুণ্য।

৭।৩।৪০ কবি

মধু সন্ধানী কবির গন্থে পদ্যে মেশান···কাব্য—

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী—

বিবিধ জাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবী দাওয়া
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পারো
তাহলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে।
ডাক যোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী
মোকাবিলা দেখা শোনা দাম ঢের বেশি।
পন্ত শিখরের পানে কবি মধু সখা

উড়েছিল মধুগন্ধে, গন্ত উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি, স্পষ্ট ভাষণের
প্রয়োজনে, দুরারোহ তব আসনের
ঠাঁই বদলের আমি করিতেছি আশা
সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা।

তোমাকে একদা ছুটির কর্ণধার বলে সম্ভাষণ করেছিলুম, তখন আমার ছুটিও ছিল এবং এক জোড়া রুগ্ন কর্ণও ছিল তোমার অধীনে। ইস্টারের ছুটি আসন্ন, খবর যদি নাও জানবে আমার কান দুটো সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই—অতএব এইবেলা নাম সার্থক না করো যদি তাহলে ওটা তামাদি হয়ে যাবে। সপরিজনে যদি আসতে পার আমরা সপরিবারে আনন্দ লাভ করব। আগমনের প্রত্যাশা যেন সুনিশ্চিত হয়।

আমাদের নাচের দল আসানসোলে গিয়েছিল, তোমার ভাসুর পরিবারের সৌজন্যে তারা মুগ্ধ ও আতিথ্যে তারা পরিতৃপ্ত হয়েছে। ইতি ১১।৩।৪০

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ

তোমার কর্তৃকারককে আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানাবে। আশা করি তাঁর শরীর ভালো। তোমার কন্যাকুমারিকাকে আমার হয়ে স্নেহচুম্বন দিয়ো—আর মাসিকে বোলো আমি তাঁর দর্শন অভিলাষী।

'ছুটির কর্ণধার' কবিতাটির বিষয় 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছি—কবিতাটির বিবর্তনও কিছুটা দিয়েছি। আগে লিখেছি কবির কানের পিছনে 'ড্রাই একজিমা' ছিল সামান্য, বেশী কষ্টকর নয়। অন্তত কোনো দিন বলেন নি যে কোনো কষ্ট আছে, কিন্তু ওটা যে কত বিপজ্জনক ছিল তা পূর্বেই লিখেছি। আগে নিয়মিত ওষুধ দেওয়া হত না। শরীরের অসুস্থতা বা কষ্টের কথা না বললে তার প্রতিকারও হয় না। যথোপযুক্ত মনোযোগও পায় না। ফলে হঠাৎ রোগের আক্রমণ বেড়ে উঠতে পারে। হয়েছিলও তাই। ঐ ক্ষুদ্র ঘুমন্ত একজিমা বিষাক্ত হয়ে গিয়ে ইরিসিপ্লাস রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখনই সন্ধান করে সবাই জানতে পারে কি ঘটেছে। এজন্য তারপর থেকে নিয়মিত কানে ওষুধ লাগাতাম। আমি যখন থাকতাম না তখন এ কাজ কে করত আমি মনে করতে পারছি না। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে কানের শক্তি কমে আসছিল, শুনতে অসুবিধা ছিল। তাই অপরিচিত মানুষের বক্তব্য শুনতে কেবল কানের উপর নির্ভর করতেন না। যেটুকু শুনছেন তার সঙ্গে কল্পনা

মিশিয়ে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে কথা বলে যেতেন যাতে বহিরাগত কেউ বুঝতে না পারে যে শুনতে অসুবিধা হচ্ছে। বুঝতে কেউ পারত না। কখনো কাউকে কোনো কথা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেন না। শারীরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে ভারি সংকোচ ছিল তাঁর। কানের হৃত শ্রবণশক্তি উদ্ধার না হোক বৃদ্ধি যাতে না পায় সেজন্য ওষুধ দিতে হত।

আমাদের সপরিজনে ও সপরিবারে শান্তিনিকেতন প্রায়ই যাওয়া হত। পারিবারিক প্রয়োজনে আমরা মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে আসতাম। ভোগ করে আসতাম প্রতিমাদির সাজান সমৃদ্ধ সংসারের নিপুণ আতিথ্য।

উদয়ন গৃহ দিনে দিনে একটি মিউজিয়ামের মত সুন্দর হয়ে উঠেছিল—উদীচীর সামনে গোলাপ বাগানে বসোরার গোলাপ ফুটছিল—আর উদয়নের ফুলের বাগান জাপানী-বাগান ও মোগল-বাগানের ঐশ্বর্যের মেশামেশি। আমরা অল্পদিনের জন্য যেতাম, এখানকার শ্রী সৌন্দর্যের প্রভাবে আনন্দিত হয়ে ফিরে আসতাম।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। উদয়নগৃহ তাঁর কাছে 'রাজপ্রাসাদ'। তাঁর কোনো ভক্ত মহিলা কবি তাঁকে একটা কবিতায় চিঠিতে লিখেছিলেন "তুমি রাজার দুলাল হয়ে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়েছ"—কবিতাটা মনে নেই কিন্তু ভাবটা বড় সত্য, তাই মনে গাঁথা আছে। তিনি লিখেছেন বটে —গান যে মানুষ গায় দিয়েছে সে ধরা আমার অন্তরে—যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলেনি তার। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং কঠিন পরিবেশে প্রাসাদ থেকে প্রান্তরে এসে, সুখ সম্ভোগ আরাম বিলাসে নিজেকে বঞ্চিত করে, আত্মজনের গঞ্জনা সয়ে দিনের পর দিন পরম সহিষ্ণুভাবে নিজের আদর্শে অটল থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে আত্মদান সে কি দেশের বা দশের জন্য হঠাৎ প্রাণ দেওয়ার চেয়ে কম? তাই কবি যখন লেখেন—

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে—

তখন তাঁর সঙ্গে আমি একমত হই না। খুব তর্ক করেছি এ নিয়ে। তর্ক করেছি ঐ লাইনটি নিয়েও "আমার কবিতা জানি আমি গেলেও বিচিত্র পথে

হয় নাই সে সর্বত্রগামী”—আমি বলতুম কী দরকার ছিল আপনার এ কথা লেখবার। আর কত বহুমুখী হতে পারে রচনা? নিন্দুকরা সুবিধা পেয়ে যাবে, বলবে, উনি তো নিজেই লিখে গেছেন সাধারণ মানুষের কথা উনি লিখতে পারেন নি। কবি হাসতেন আর বলতেন, আমার প্রতিপক্ষদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে, তোমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আর কাউকে না পেলে আমাকেই আমার প্রতিপক্ষ দাঁড় করাবে। সন্দেহ হচ্ছে আমার নিন্দুকের সংখ্যা কমে গেল নাকি!—সত্যি খুব ভয় করতুম রবীন্দ্র-নিন্দুকদের। তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। এখনও কমে নি; তবে এখন আর ভয় পাই না। বালবুদ্ধি কেটে যাওয়ার পর বুঝেছি রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।

যেমন ধীরে ধীরে আকাশের রঙ পালটিয়ে সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তেমনি যেন তাঁর আদর্শগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন। 'সম্মানের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে'। সংসারের কেন্দ্রে তিনি নেই—সেখানকার কলরব শুনতে পাচ্ছি অথচ তার সঙ্গে আমার যোগ নেই, এইরকম একটা ভাব দেখেছি অস্পষ্ট কষ্টের মতো লেগে থাকত। তাঁর লেখায় কিন্তু এ ছাপ পড়ে না—কিছুকাল থেকে তাঁর রচনায় বর্তমানের চেয়ে অতীত বেশি উপস্থিত।

উদীচী বাড়ি তৈরী হয়েছে, দোতালার উপরে একখানি ঘর ও ঘেরা বারান্দা—ঐটুকু সীমার মধ্যে আবদ্ধ সেই মানুষ একদা যিনি অনুভব করেছেন: রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য, মাথার পরে ডাক দিয়েছে মধ্য দিনের সূর্য।

উদীচীর বাগানে প্রথম গোলাপ যেদিন ফুটল সেদিন সকলের কী আনন্দ! কবি তো আনন্দিত কিন্তু সে আনন্দ একেবারে ক্ষোভশূন্য নয়—এই গোলাপ বাগান এখানে কেন? এ কেন লাইব্রেরীর সামনে নয়, এ তো হতে পারত সকলের। নিজের হাতার চৌহদ্দীর মধ্যে এর সীমা দেওয়া কেন? আমার যা কিছু আছে তা সকলের, এই তাঁর সব সময়ের কথা।

উদয়নের বৈঠকখানা বাড়িতে যে তাসের সভা বসে কবিকে তা পীড়িত করে। একে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “ঐ হো-হো সভা জমেছে নাকি?” কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদ করেন না। যাঁদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে নূতন বিশ্ব রচনা করেছিলেন তাঁরাও এখন বৃদ্ধ, দূরে সরে গেছেন। প্রচুর প্রার্থী আসে কিন্তু চারপাশে যারা আছে তারা কেউ ঠিক কাছের মানুষ নয়। বৈদগ্ধ্য নেই, আলোচ্য বিষয়ের সূত্র নেই। গল্প জমে যখন অমিয় চক্রবর্তী আসেন তাঁর

সঙ্গে। অমিয়বাবু খুব ধীরে ধীরে ওঁর শ্রুতিযোগ্য স্বরে গল্প করে যান—শোনার আনন্দে উনি শোনেন, প্রশ্ন করেন না।

মংপু থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তিনি আমাদের বার বার ডাকেন কারণ আমাদের কাছে তিনি তো আত্মীয়স্বজনের সীমায় বদ্ধ নন, তিনি উচ্চমঞ্চে নেই। তাঁকে ডাক দিয়ে এনেছি আমার জীবন দেউলের মাঝখানে—সেখানে তিনি অদ্বিতীয় বিগ্রহ। তিনি কোনো সাংসারিক সম্বন্ধে যুক্ত নন—তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথ। সেই কবি যিনি আমাদের চিন্তার অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন যেমন করে সবিতা আমাদের দেহের অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়ে তার 'তেজোময় অগ্নিকণায়' আমাদের প্রাণ দেয়, উজ্জীবিত করে। তেমনি তাঁর চিন্তার জ্যোতি প্রবেশ করেছে আমাদের হৃদয়ে, সেখানে জাগিয়ে তুলেছে কত সূক্ষ্ম চিন্তার বর্ণচ্ছটা। কত সৌন্দর্য উন্মেষ, কত ভালোবাসা যা মর্ত্যলোকের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি অনির্বচনীয়কে, পেয়েছি অপ্রাপ্যকে, অন্তরতম আনন্দ উৎসের বাঁধ খুলে সুধাসাগরের প্রবাহ নেমে এসেছে তাঁর সংস্পর্শে। আর আমরা পৌঁছেছি 'স্বর্গের কাছাকাছি'।

তবু মাটির মানুষের বন্ধন অনেক—যতখানি সেবা যতখানি সাহচর্য আমার দেওয়া উচিত ছিল তা আমি দিতে পারি নি—বাধা আর কোথাও ছিল না, ছিল আমার নিজের মধ্যে। আমার কর্তব্যের অনেকগুলি কুঠরী আছে। তারা আমায় বন্দী করেছে যেমন দাবার রাজা বন্দী হয়ে যায় কতকগুলি বানানো অর্থহীন নিয়মের পাহারায়।

যে কাজে আমি আমার দেশকে, আমার অন্তর্যামীকে সবচেয়ে বেশি দিতে পারতাম সেখানে আমার ত্রুটি ঘটেছে।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটা অভিধান তোমাকে পাঠিয়েছি—আশা করি কাজে লাগবে জিনিষটা খুব উঁচু দরের নয় যদিও।

ক্লান্ত দশা রয়েছেই, কলম সত্যাগ্রহ করতে চায়। কান মলে কাজ করাই—কিন্তু কর্মবিমুখতা লঙ্ঘন করা বড় কষ্টকর। দোলপূর্ণিমা কাল। যদি আসতে পারতে তাহলে পূর্ণতর হত পূর্ণিমা।

গাত্র মার্জন করে আসচি এই মাত্র। তোমার মংপুর তোয়ালেটা আমার

শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ হয়ে আসচে। তবু আমার শরীরটার মতোই এখনো কাজে লাগচে।

বোতলে কিছু টফি জমেচে। মিঠুয়া কাছে থাকলে বদান্যতার পরিচয় দিতে পারতুম। আশা করি এই পুণ্য কর্মটি অনতিদীর্ঘকালের জন্য মুলতবি রইল।

মহাভারতের গল্পের ভাষা মহাভারগ্রস্ত যেন না হয় ···। বুঝতে পারচি সেটা হবে পিষ্‌পাশের মত, গলা গলা ভাতের মাঝখানে জেগে উঠবে হাড়গোড়ওয়ালা দ্বিজ মাংস। তুমি হলে সংস্কৃত ভাষায় বিদুষী, শব্দরূপ সাধনে নরঃ নরৌ নরাঃ অন্তত আমার মতোই তোমার জানা আছে। তোমার বিল্বংকরকমলে বোপদেবের দান অবিগলিত থাকবে। আমার পরামর্শ এই যে তোমার রচনা মনমোহনকে দিয়ে সংশোধিত করে নিয়ো (সন্ধিতে ওকার লাগাব নাকি? তাহলে ওর বিশুদ্ধ গৌড়ীয় স্বাদ নষ্ট হবে) সতর্ক করে দিচ্ছি সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত— এ চিঠিখানি প্রবাসিনীর জন্যে, প্রবাসীর জন্যে নয়।

বসন্তকাল এল। স্মরণ করাতে হয় না মাধবীলতাকে। কিন্তু—হায়!

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় গ্রহণ করি। ইতি দোলপূর্ণিমা ১৩৪৭

হতাশ কবি রবীন্দ্রনাথ

চতুর্থবার মংপু আসবার সংবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি দিলেন সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী—

18/4/40

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নিবেদন,

মিসেস সেন,

পূজনীয় গুরুদেব আপনার প্রস্তাব মত আগামী শনিবার Darjeeling mail-এই শিলিগুড়ি যাবার চেষ্টা করবেন। রবিবার প্রাতে পৌঁছবেন শিলিগুড়ি। নিতান্ত যদি না পারেন তাহলে North Bengal express দিয়ে পৌঁছবেন, ঐ রবিবার সকালে।

ইতিপূর্বে প্রতিমাদি যে টেলিগ্রাম করেছেন আশা করি তা পেয়েছেন। সঙ্গে যাচ্ছে গুরুদেবের—

আমি

Dr. Ameo Chakraborty.

দুজন ভৃত্য

এবং Cook

সুতরাং গুরুদেবের জন্য যে গাড়ী যাবে তাছাড়া আরো দুটো ট্যাক্সি চা-ই। মালের জন্যই তো প্রায় দুটো গাড়ী চাই, জ্ঞাতার্থে নিবেদন।

বিনীত

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

১৯৪০এর গোড়ার দিকে লেডি রাণু মুখার্জী তার 'ভানুদাদাকে' একটা এয়ার কণ্ডিশনার উপহার দিয়েছিলেন। এখনকার মত এয়ার কণ্ডিশনার তখন ঘরে ঘরে ছিল না। সে অতি মহার্ঘ্য বস্তু। যেমন বিরাট তার দেহ তেমনি বিশ্বকম্পায়নি তার শব্দ, আবার মাঝে মাঝে জল ঢালতে হয়—সে জল উদীচীর ঘরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায়। কবি বলেন, নদী আমি ভালবাসি তবে ঠিক ঘরের মাঝখানে নয়। রাণু হয়ত ভেবেছিলেন গরম কাটাতে বার বার পাহাড় পর্বত ডেঙাবার দরকার কী, বাড়িতেই হিমবাতাস শীতলতা আনুক। কিন্তু কবি ওটি চালালেনই না। ঐ শব্দ, ঐ জল ঢালা, বাইরে গরম ভিতরে ঠাণ্ডা—এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কিছুই ওঁর ধাতে সইল না—উনি যন্ত্রটি উদয়নে বিদায় করে দিলেন। অবশ্য অসুখের সময় ঐ যন্ত্রটি খুব কাজে লেগেছিল। প্রথম যাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিলুম ১৯৪১এর বৈশাখে কবির রোগশয্যার পাশে বসে তার শীতল অভ্যর্থনা লাভ করেছি।

চতুর্থবার মংপু আসার বিঘ্ন হতে পারে কল্পনা করে আমি কিছু লিখে থাকব। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে উত্তরটা এই—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অবে অনুরোধে ঘটে বিপরীত ফল
কবে তার পরিচয় পেলি তাই বল
এ তো অনুযোগ অল্প না।
সাধ করে কণ্টক পথচারিনী
আপনার মর্মপীড়ন কারিনী
কেন এই কটু কল্পনা ?

ইতি ৫।২।৪০ রবীন্দ্রনাথ

আমার মনে হয় তারিখটায় ভুল আছে।

অবশ্য দুশ্চিন্তার কিছু কারণ ছিল না। বাধা বিঘ্ন যাই আসুক মংপু আসবেন এই রকম কথা দেওয়া ছিল—বাধা দেবার মত আমার বন্ধুর অভাব

ছিল না অবশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ সময়ের বেশ কিছু আগে নাতনী নন্দিতার কাছে তাঁর দাদামশায় লিখছেন, "যদি জ্যৈষ্ঠ মাসটা অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে তোমার চিত্তবেদনা সত্ত্বেও আমি মৈত্রেয়ীর ওখানে নিশ্চয় যাব।"—

চতুর্থবার পঁচিশে বৈশাখের শুভ দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ মংপুতে ছিলেন। আমরা তাঁর জন্মোৎসব যে ভাবে পালন করেছিলাম সেই অভিনব উৎসবের বর্ণনা আমি 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছি। এই উৎসবের পরিকল্পনা আমায় দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, সেজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। মজুরদের নিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব আজকে আর তত অসম্ভব লাগবে না। কিন্তু ১৯৪০ সালে সরকারী আবাসে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়িতে সেটা ছিল সত্যি অকল্পিত।

মংপু থেকে কালিম্পং ফিরে গিয়ে অমিয়বাবু আমার স্বামীকে দীর্ঘ-পত্র লিখলেন—তার মূল কথা এই—এখানে আমরা আর জন্মোৎসব করিনি। মংপুতে যে উৎসব হয়েছে তারপর আর কিছুই মনকে স্পর্শ করবে না।

জন্মদিনের দিন সুরেন ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ এল। খবরটা ওঁকে বলা হল পরের দিন। মংপু আসবার ঠিক একদিন আগে কবি তাঁর অতিপ্রিয় অসুস্থ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কলকাতায় মে ফেয়ারের বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলেন। সুধাকান্তবাবুর কাছে গল্প শুনলাম, সেখানে তাঁর মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন। বৃদ্ধ লুপ্তস্মৃতি। দেবরকে ঠিকমত চিনতে পারলেন না। দেবর প্রণাম করে পরিচয় দিলেন, 'আমি রবি'।—সুধাকান্তবাবু বললেন, রবীন্দ্রনাথের প্রণম্য কেউ আছেন দেখতে বেশ লাগল। আর ছিলেন ছোড়দি বর্ণকুমারী দেবী—তাঁকে রবীন্দ্রসকাশে দেখেছি। খুব ফর্সা কিন্তু সুন্দরী নন। তাঁর চেহারার ধরন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদাসুন্দরীর মতো।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ সাধারণত কি কি বই পড়তেন। আমি দেখেছি কেউ কোনো বই পাঠালে কবি সরিয়ে রাখতেন না। উল্টেপাল্টে দেখতেন একটু। পড়বার মতো হলে পড়তেন, ভালো লাগলে খুঁটিয়ে পড়তেন। তৃতীয়বার মংপু থাকাকালে সুরেন ঠাকুরের "বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' বইখানি খুব ভালো করে পড়েছিলেন। ওঁর শঙ্কা হচ্ছিল এ বইয়ের জন্য হয়ত সুরেন ঠাকুরের উপর রাজরোষ এসে পড়বে। জেলও হতে পারে। সে সময় কমিউনিজম নিয়ে খুব আলোচনা হত। রাশিয়াতে কি দেখেছেন বলতেন ও আমাকে দিয়ে মস্কো নিউজ থেকে মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করে 'দেশে' ছাপিয়েছিলেন। যা কিছু পড়তেন তা নিয়ে আলোচনা হত। জীববিজ্ঞান নিয়ে

আলোচনার ফলে আমি 'প্রাণযাত্রা' বলে একটি প্রবন্ধ লিখি, সেটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হলে কবি পছন্দ করেন।

আমার স্বামীর লাইব্রেরীতে পপুলার সায়েন্সের যত বই ছিল তিনি এক এক করে সব পড়েছেন। তারপর ভ্রমণবৃত্তান্তও প্রচুর পড়েছেন। বলতেন, এখন তো পায়ে ভ্রমণ নেই এখন মনে মনে ভ্রমণ। এ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইও সর্বদাই পড়তেন। 'Restless Universe' বইটি একবার নিয়ে যান, বলেন, 'নিশ্চিন্ত থেকো বইটি ফেরত পাবে—বই যাযাবর বটে তবে একে আমি গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনব।' অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বুঝি বিজ্ঞানবিরোধী—একেবারেই তা নয়। তাঁর চিরঅনুসন্ধানী মন বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে নিরন্তর মুক্তি খোঁজে। বস্তুত শেষ দিকে তাঁকে কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস এসব পড়তে বেশি দেখি না—দেখি বিজ্ঞান ও ভ্রমণের বই পড়তে, বায়োকেমিক ও অন্যান্য ডাক্তারী বই পড়তে।

রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে নানা ঋতুর আসা যাওয়ার খেলায় কবি দেখেন জীবন মরণের লীলাকে, উপলব্ধি করেন অশেষকে। প্রকৃতি তাঁর মনোজগতে বিশেষ ভাবে উপস্থিত। বিচিত্র বিশ্বদৃশ্য জাগায় তাঁর অপার বিস্ময়—"বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান"—তেমনি বিজ্ঞানেরও স্পষ্টত একটি স্থান আছে। কেবল জ্ঞানরূপে নয়, জ্ঞান ও ভাবে মেশামেশি হয়ে তারা রবীন্দ্রকাব্যকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে। বিজ্ঞানের সত্য ও অনুভূতির সত্যে, অধ্যাত্ম সত্যে, বিরোধ নেই। তারা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে এক পরম সত্যকে উদ্ভাসিত করে।

প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তন তাঁর রচনায় বার বার উল্লেখিত হয়েছে। দেখা দিয়েছে জীব-বিজ্ঞানের নানা সত্য কাব্যের আলোতে। বিজ্ঞানের সত্যে আর অধ্যাত্ম ভাবনায় ঘটেনি কোনো বিরোধ। এ ছাড়া, রবীন্দ্রকাব্যে প্রবেশ করেছে মহাকাশ—তার চন্দ্রসূর্যের মহিমা, তার তারার মহোৎসব, নিশীথ রাত্রের উল্কাপাত, তাদের বিজ্ঞানের রূপ ও সৌন্দর্য-রূপের সমবায়ে উজ্জ্বল হয়েছে এবং গদ্যে পদ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, উপমায় উপমায় মহাকাশের জ্যোতিষ্ক সভার সঙ্গে তার আত্মার পুলকিত সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত করে। একটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি যে কবিতাটি বার বার তাঁর মুখে শোনা—

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলীতে

এই কথা বলে জ্যোতিষী।... ...

......হে পণ্ডিতের গ্রহ
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই।
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা সন্ধ্যাতারা।
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে
তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

যে সময়ে কবি আমাদের কাছে আসতেন, সঙ্গে থাকত তাঁর নিজস্ব পরিচারক বনমালী—এর চেয়ে বেশি ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বনমালী বেশি কিছু নিজ হাতে করতে পারত না। ওঁর হাত ধোবার একটা বড় পিতলের বাটি ছিল, সেটা ঝকঝকে করে মাজত ও ট্রেতে খাবার বয়ে আনত। আমার কাছে কবি যখন থাকতেন, তখন আমার বিবাহের যৌতুক বড় রূপার থালা বাটিতে সাজিয়ে খাবার দিতুম। মাঝে একবার আগ্রা গিয়ে ঠাকুর-বাড়ির অনুকরণে শ্বেতপাথরের থালা-বাটি এনে তাঁর খাবার ব্যবস্থা করলাম। আগ্রার শ্বেতপাথর খুবই সুন্দর। নূতন বলে আরো প্রিয়। আমি বললাম, বনমালী, এবার আমার কাছে পাথরের বাসন আছে তাতেই কি তোমার বাবামশায়কে খাবার দেবে? বনমালী পাথরকে রূপার মর্যাদা দিতে রাজী নয়—থালা পালিশ করতে করতে বললে, 'কেন দিদিমণি, আপনি বরাবর বাবামশায়কে চাঁদিতেই খোয়ালেন (খাওয়ালেন) এখন আবার পাতর কেন?' এই বনমালীকে সাহায্য করবার জন্য কখনো কানু, কখনো মহাদেব আসত

প্রতিমাদির আগ্রহাতিশয্যে।

এই সময়ে দার্জিলিঙে ছুটিতে মান্যগণ্য যাঁরা আসতেন, তাঁরা ঠিক দুপুর বেলা খবর না দিয়ে গাড়ি ভর্তি করে এসে পড়তেন কবি সকাশে। মংপু নির্জন জায়গা, এখানে অন্য কোনো বন্দোবস্ত নেই, ফলে সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করতে হত বাড়িতেই এবং অল্প সময়ের মধ্যে। তাই কখনো কখনো প্রতিমা দেবী তাদের একজন রাঁধুনীকেও পাঠিয়ে দিতেন, আমার বাবা মাও তাঁদের বাবুর্চিকে পাঠিয়ে দিতেন। সত্যি বলতে কি ভৃত্যকুলের ভার অনেক সময় একটু গুরুভার হয়ে যেত। এতজনের প্রয়োজনও ছিল না। কবির কাজ অতি সামান্য।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, কবি কি খেতেন। তাঁর খাওয়ার কোনো বিশেষত্ব ছিল কি না। তাঁদের জ্ঞাতার্থে তাঁর আহার সম্বন্ধে একটু বিবরণ লিখছি। অতি প্রত্যূষে সূর্য বন্দনার পর—এক পেয়ালা খুব হালকা চা বা কফি খেতেন। তারপর ৭টা নাগাদ প্রাতঃরাশ—তখন থাকত, কখনো আগের দিনে ভিজিয়ে রাখা সরগুজা বা বাদাম। আমি খোসা ছাড়িয়ে দিতাম, এর সঙ্গে দু-চারটে কিসমিস। কখনো বা অঙ্কুর গজানো মুগ। একটা টোস্ট মধু দিয়ে, এক পেয়ালা পাতলা কফি দুধ বেশি দিয়ে। ৫।৭ বছর আগে কলকাতায় আমি তাঁকে সন্দেশ, কলা ও স্যানাটোজেন এক সঙ্গে কাঁটা দিয়ে মেখে মেখে একটি সিন্নি তৈরী করে খেতে দেখেছি। মংপুতেও মাঝে মাঝে এটা খেতেন, আমাকে একবার একটু চাখতে দিয়েছিলেন। অতি অখাদ্য মনে হয়েছিল। কোনো জিনিস খেতে ভালো লাগা বা না লাগা ওঁর মনের উপর যত নির্ভর করত জিহ্বার উপর তত নয়। সেই জন্য আমি বুঝতে পারতাম ওঁর ইন্দ্রিয় বোধগুলি স্বাধীন নয়, তারা সম্পূর্ণ মনের অধীন, লাগাম পরানো, বশীভূত। যেমন অনায়াসে এক গ্লাস নিমপাতার রস খেয়ে ফেলতেন, মুখ বিকৃত হ'ত না। আমাদের যা তিতো লাগে ওঁর তা লাগে না কারণ, উনি স্থির করেছেন, লাগবে না। বেলা দশটায় আমি একগ্লাস ফলের রস করে নিয়ে যেতাম—ফল অর্থাৎ খোসাসুদ্ধ আপেল গ্রেটারে ঘষে নিয়ে চিপে রস করে নেওয়া। নীলরতনবাবু বলেছেন, খোসা ফেলে দিলে কোনো গুণই থাকে না। কিংবা কোনো দিন চালকুমড়োর রস। যে দিন বাতাবী লেবু জোগাড় করতে পারতাম সেদিন আমি খুব খুশি হতাম কিন্তু সব সময় হত না। রস নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে উনি মজা করে একটি উর্দু বা পার্শি গান গাইতেন—কথাগুলো অস্পষ্ট মনে পড়ে, ভুলও হতে পারে—"সাকি নিয়ে সরাবে' মুস্কে বু হ্যায়"—তা সাকিও যেমন সরাবও তেমন, চাল-

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি ভেবেছ যে কী রকম কল্যাণস্বরূপ আমার মন। আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলুম তোমার জীবন বিচ্ছেদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার চিত্ত কী রকম বিমুখ হয়েছে সংসারের থেকে। তোমার এই অবসাদের ছবি আমাকে প্রবল ভাবে পীড়া দিয়েছিল। আমার সন্দেহ যে তোমার বিষাদের কারণ এত আমি লজ্জা পেয়ে যা মনে এসেছে তাই বলেছি। হয়তো যা বলি আমি কল্পনা করেছি নিজেকেই।

মন থেকে এই বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি। জানি সকল ক্ষোভ স্নেহের তোমাকে অসংকোচ রয়েছে জানিয়ে তোমাকে।

এক কথা বলো। রানী আসছেন বৌমা। যদি বাধা না থাকে তুমিও এসো। তোমার সহজ স্বাভাবিক প্রসন্ন ভাব দেখলে আমি আনন্দিত হব। মনে কোরো না কষ্ট দিতে এসো না— এসো তুমি নিমন্ত্রণে। আমি এখন আছি শান্তিনিকেতনে— খুব খুশিতে আছি। আরো খুশি হব যদি দেখি প্রসন্ন আছে তোমার মন। ইতি ২৭।৯।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

ক্লান্তিশাপ রয়েছেই, কলম সত্যাগ্রহ করতে চায়।
অবশেষে শেষ করাই — কিন্তু নাতিদীর্ঘ লেখাও লেখা
বড় কষ্টকর।
দোলপূর্ণিমা কাল। যদি আসতে পারতে তাহলে
পূর্ণতর হত পূর্ণিমা।
স্নান মার্জ্জন করে আসছি এইমাত্র। তোমার সংস্কৃত
তোয়ালেটা আমার শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ হয়ে এসেছে। তবু
আমার শরীরের মতোই এখনো কাজে লাগছে।
বোতলে কিছু টনিক বাকি আছে। মিতুদা কাছে থাকলে তোমাকে
পাঠিয়ে দিতে পারতুম। আমার কাছে এই ক্ষুদ্র কবিতা অনতিদীর্ঘকালের জন্য
মুলতুবি রইল।

কুমড়োর রস—অতিশয় বিস্বাদ বস্তু।

দুপুরবেলা এগারটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনে প্রথম একটি আম নিজে কেটে খেতেন। তারপর আমি থালায় সাজিয়ে শুক্তনি, ডালনা, ডাল, তরকারী ও মুর্গীর ঝোল দিতাম। আমাদের ওখানে টাটকা মাছ পাওয়া যেত না। আর থাকত কোনো একটা মিষ্টান্ন বা পায়েস। কবি সব থেকে অতি সামান্য সামান্য তুলে নিয়ে টেবিল চামচের ঠিক দু চামচ ভাত খেতেন—বিরাট রূপার থালার এককোণে মেখে। আমি থালাসুদ্ধ তুলে রেখে দিতাম, পরে আমার কাজে লাগত।

বিকালবেলা সাড়ে তিনটার সময় এক পেয়ালা পাতলা কফি বা চা, তার সঙ্গে মুড়ি বা স্যাণ্ডুইচ, কখনো ঘরে তৈরী একটা ছোট সন্দেশ। মুড়ির একটা খাবার উনি শিখিয়েছিলেন, শুনেছি ওটা ঠাকুরবাড়ির বিশেষ প্রিয় খাদ্য—তার সবরকম উপাদান এখানে যদিও পাওয়া যেত না তবু মোটমুটি খাড়া করতাম—'সাঁৎলাভাজা'। সাতরকম জিনিস—মুড়ি, চিড়ে আলাদা আলাদা ঘিয়ে ভাজা হত, তার সঙ্গে পোস্ত ভাজা, বাদাম ভাজা, কুসুম ফুলের বীচি নয়ত কুমড়োর বীচি ভাজা মিশিয়ে বাটিতে ঢেলে মাঝখানে একটি শুকনো লংকা ভাজা সাজিয়ে দেওয়া হত।

রাত্রির খাবারে তখনকার দিনে অনেক বাড়িতে বিলাতি রান্নার ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজদের পোশাক, ভাব ও ভাষাই যে শুধু আমাদের আক্রমণ করেছিল তা নয় আমাদের রন্ধনশালায়ও তাদের প্রবেশ ঘটেছিল। অবশ্য বিলাতী রান্নার অর্থ ইংরেজের রান্না নয়, পর্তুগীজ রান্নার প্রভাবই ছিল বেশি, তার মধ্যে মোগলাই-এর ছোঁয়াও যে লাগত না তা নয়। কিন্তু এসব কবি বিশেষ পছন্দ করতেন না। এক প্লেট ভেজিটেবল স্যুপ, দু-তিন খানা লুচি, সামান্য একটু তরকারী, একটুখানি পুডিং—এই ছিল মোটামুটি রাত্রের খাদ্য। কবির সঙ্গে আসতেন দুজন সেক্রেটারী—সুধাকান্তবাবু, অনিল চন্দ, কিংবা অনিল চন্দ, আলুবাবু কিংবা সুধাকান্তবাবু ও অমিয় চক্রবর্তী। সুধাকান্তবাবু ও অনিল চন্দ দুজনেই খাদ্যরসিক। অনিলবাবুর ছিল উঁচুদরের পছন্দ, বিলাতী মেনু। কিন্তু অমিয়বাবু একেবারে অনাহারী। অত কম খেয়ে কি করে একজন মানুষ এত ঘোরাঘুরি, লেখালেখি করতে পারে, আশ্চর্য। সকালবেলা আধখানা টোস্ট, আধখানা ডিম ও আধখানা কলা হলে তাঁর আইঢাই। আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ চিকেন লিভার, এক চিলতে আলু ফিঙ্গার ও এক টুকরো গাজর, চায়ের চামচের দু চামচ পুডিং হলে তাঁর ভুরিভোজন।

এখানে কবির জন্য করবার কাজ সেক্রেটারীদের বিশেষ ছিল না। কপি করবার কাজ যথাসাধ্য আমিই করতাম। এ ছাড়া ভৃত্যদের কাজও আমি করবার চেষ্টা করতাম, তাদের জন্য পেরে উঠতাম না।

রাত্রে তাঁর ঘরে কোনো পরিচারক থাকতে দিতেন না। সে তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। উদীচী বাড়িতেও কবি সম্পূর্ণ একলা ঘরেই থাকতেন, কোনার্কেও। এখানে আমাদের ছোট বাড়িতে অবশ্য সবই কাছাকাছি। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরে কখনো এত বয়সের মানুষকে একলা রাখতে চাই না। আমার তাই ভারি দুশ্চিন্তা হত, যদি সেবারের মত রাত্রে কোনো বিপদ ঘটে। উনি অবশ্য বলতেন, রাত্রে মূর্ছা যাবার দরকার হলে তোমাকে খবর দিয়েই মূর্ছা যাব।

আমাদের ঘর ও কবির ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ছিল। আমি বলতাম আপনার দিকে ছিটকিনি লাগাবেন না। খোলা রাখবেন! মাঝে মাঝে আমি বা আমার স্বামী এসে দেখে যেতাম—ঝড় বৃষ্টি হলে তো বটেই। কবি বলতেন, বেশ তো বিচার! তোমাদের দিকে দরজা বন্ধ, আমার দিকে খোলা। তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছামত যাওয়া আসা আর আমার বন্দীদশা! কিন্তু কোনোদিন বিশেষ কিছু দরকার হত না। আমাদের কখনো বলা হয় নি যে ওঁর একটা দারুণ অসুখ আছে, যে কারণে মাঝে মাঝে জ্বর হয়। আমার তো মনে হয় সুধাকান্তবাবু বা অনিল চন্দও প্রস্টেটগ্ল্যাণ্ডের সমস্যাটা ঠিকমত জানতেন না। অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে যে বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিলেন না, অন্তত আমাকে কেউ বলেন নি। রথীদা যখন আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তখনও বলেন নি।

ডাক্তারী ওষুধ বেশি খেতেন না। শেষরাতে ওঁর ঘরে ঠুকঠাক শব্দ শুনলে জানলার কাচ দিয়ে দেখতুম, ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে Enos fruit salt তৈরী করছেন। দুটো ফ্লাস্কে জল থাকত, নিজেই করে নিতেন। এ সময়ে আমরা কেউ সাহায্য করতে যেতাম না। আমি জানতাম, এ সময়টা উনি নিজের মনে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছেন। তারপর মুখ ধুয়ে বারান্দায় সূর্যাভিমুখী হয়ে যখন বসতেন আমি তৈরী হয়ে এসে চেয়ারের পিছনে বসে তাঁর সঙ্গে মনে মনে যোগ দিতুম। তাঁর সেই প্রত্যূষের সূর্যাভিষেকের বর্ণনা আমি অনেক জায়গায় বার বার লিখেছি, এখানে আর তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সকালের কাজ শুরু হয় চিঠির উত্তর লেখা দিয়ে। তারপর সারাদিন ধরে নূতন লেখা লিখছেন, সন্ধ্যায় পুরানো লেখা পড়া হচ্ছে, গানে গল্পে উৎসবের

মতো প্রত্যেকটি দিন বয়ে চলেছে—আবার মাঝে মাঝে দেখেছি ক্লান্ত, বিমর্ষ। মনে নানা ভাবের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলেছে—কখনও প্রফুল্ল, কখনও চিন্তাগ্রস্ত। কখনও পাহাড়ের বিশুদ্ধ বাতাস ভালো লাগছে, কখনও পাহাড়গুলো চোখের সামনে দেয়ালের মত আড়াল করেছে। স্পর্ধাভরে আমায় বন্দী করেছে। কোন্ সূক্ষ্ম কারণে কবির মনে উৎসুক বা বিমুখ ভাব আসে তা বোঝা বড় শক্ত। কিন্তু আমি বুঝে সুঝে চলবার চেষ্টা করতাম।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা দিত জ্বরভাব। সুধাকান্তবাবু বলতেন, দুর্বলতার জন্য ঐরকম হয়ে থাকে। বায়োকেমিক ঔষধ খেতেন নিজেই। কিন্তু এতটুকু হেরফের দেখলেই আমি রথীন্দ্রনাথকে চিঠি দিতুম। এই রকম একটা চিঠির উত্তরে লেখা রথীদার চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি, এতে কবির দৈনন্দিন ভাব কতকটা বোঝা যাবে। পুত্রের কথা খুবই মানতেন কবি। রথীদাকে পিতৃসকাশে দেখলে গত যুগের পিতাপুত্রের সম্বন্ধের কথা মনে আসে। প্রতিমা দেবী অনেক সহজ ছিলেন শ্বশুরের সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ বাবার কাছে আসবার সময় অনেক দূরে জুতো খুলে ধীরে ধীরে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াতেন, অতি মৃদুস্বরে কথা বলতেন। 'তুমি' করেই কথা বলতেন বটে কিন্তু এত মৃদু স্বরে এত বেশি সমীহ করে যে মনে হত কোনো দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের সামনে তাঁর অপরাধী প্রজা !!

একবার সামান্য অসুস্থতা ও ঈষৎ বিমর্ষভাব দেখে রথীদাকে আসতে তাড়া দিয়েছিলাম, তার উত্তরে লিখছেন—

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
১লা জুন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের চিঠি পেয়ে একটু দুশ্চিন্তায় রয়েছি। বাবার শরীর তো প্রথম দিকে বেশ ভালো ছিল—। কেন আবার ভালো থাকছে না। একটা বিষয় দেখেছি আজকাল সাবধান হওয়া দরকার। যদিচ বাবার হজম করবার শক্তি যথেষ্ট—কিন্তু বয়সের দরুণ এখন আগেকার মত সব জিনিষ খেয়ে হজম করতে পারেন না। অথচ সেটা নিজে বুঝতে পারেন না। বয়সটা তো কখনই কোনো দিক থেকে স্বীকার করতে চান না। অতএব যাঁরা কাছে থাকেন তাঁদেরই সাবধান হওয়া দরকার। ওঁকে খাওয়া নিয়ে উপরোধ না করাই ভালো

এবং simple খাওয়ার উপরই রাখতে চেষ্টা কোরো। আর একটা কারণ হতে পারে মংপুর জল ভালো কিন্তু constipating। সে বিষয়ে steps যথারীতি নেওয়া দরকার। হার্টের কোনো গোলমাল নেই—দার্জিলিংয়ে যখন হয় না তখন মংপুর ৪০০০ ফিটে কোনো ভয় পাবার নেই। হজমের গোলমাল, flatulence প্রভৃতি হোলে মনে হতে পারে সেইরকম।

মনের দিক থেকে cheerful রাখবার ব্যবস্থা পারিপার্শ্বিক লোকদের উপর সব সময় নির্ভর করে না। তবে এইটুকু জেনে রেখো উনি যাই বলুন লোকজন পসন্দ করেন—বিশেষত বিকেলের দিকে। সেই সময় বদলে ২ তু চারজন যা available লোক ওঁর কাছে এনে দিও গল্প করার জন্য। serious আলোচনাই যে উনি পসন্দ করেন সব সময় তা নয়। জানো তো কবির মন সব সময়ই পরিবর্তন চায়। নতুন Surroundings, নতুন লোক সর্বদাই দরকার। আর কিছু না পার ঘরের furniture গুলো উল্টো-পাল্টা করে দিয়ে—বা শোবার ঘর বসবার ঘর বদলাবদলি করে দিলেই উনি আবার কিছুদিন খুসী থাকবেন। কিন্তু দোহাই তোমার—এই চিঠির বিষয় তুমি ওঁকে জানিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছি জানলেই ভয়ানক রাগ করবেন। তোমার পক্ষেও তখন কিছু ব্যবস্থা করা শক্ত হবে।

আমার যাবার নিতান্ত দরকার হোলে নিশ্চয়ই যাব—কিন্তু ৩।৪ দিন এখানে এখনো না থাকলে যে জন্য কষ্টভোগ করে এতোদিন রইলুম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে বাবার শরীর যদি দেখো সত্যিই খারাপ যাচ্ছে তাহলে জানিও আমি পত্রপাঠ চলে যাব। ঐখানেই কোনো ব্যবস্থা করা ভাল—এখন কলকাতায় নামলে ভয়ানক কষ্ট পাবেন। ভীষণ গরম চলছে।

বাগান থেকে আরো আম কিছু পাঠালুম।

ইতি রথীদা

রথীদার এই চিঠিখানায় 'সাল'-এর উল্লেখ না থাকায় একটু অসুবিধা হলেও মনে হচ্ছে এটি দ্বিতীয়বার গ্রীষ্মে মংপু থাকা কালে লেখা, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে। এই সময় রথীন্দ্রনাথও পরে এসে মাসখানেক পিতার সঙ্গে মংপু বাস করে গিয়েছেন। রথীদার শিল্পদৃষ্টি অদ্ভুত। পথে চলতে প্রত্যেকটি গাছ প্রত্যেকটি পাতা তাঁর লক্ষ্য হয়। তিনি দেখান কোন বন্যগাছটির পরিণতি কি হয়েছে। অরণ্যের কোনো এক কোণ থেকে একটু ধোঁয়া মত উঠছে, রথীদা প্রশ্ন করলেন, ওটা কি? আমরা ওরকম মাঝে মাঝে দেখেছি বটে, অর্থ জানি না। শুনলাম

কোনো বন্যগাছের ফল ফেটে তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উড়ে যাচ্ছে। অন্যত্র জীবন লাভ করবে বলে। রথীদার সঙ্গে বনে বেড়িয়ে আমি গাছ, ফুল, পাতা চিনতে শিখলাম। দেখতে শিখলাম অরণ্যের বিচিত্র শোভা।

চতুর্থবার মংপুতে জন্মদিনের উৎসব শেষ করে কালিমপং চলে গেলেন। সেখানে প্রতিমা দেবী অপেক্ষা করে আছেন। কয়েকদিন কালিমপং থেকে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন এইরকম কথা, তাই দু বাক্স গরম জামা কাপড় রইল আমার জিম্মায়।

কালিমপং পৌঁছে লিখছেন—

ও

কল্যাণীয়াসু

পথের মধ্যে অপঘাত হয় নি—হাড়গোড় সমস্তই যথাস্থানে আছে। সুধা সমুদ্র ড্রাইভারের পাশে আরামের জায়গায় ছিল সেখানে ছিল ছায়া। আমি আমার আকাশের মিতার নিবন্তর করক্ষেপ ভোগ করেছি। কিন্তু নালিশের কারণ ঘটেনি। কোনো একদিন অকস্মাৎ এখানে উপস্থিত হয়ে যদি তোমার প্রতিমাদিকে চমৎকৃত করে দাও তিনি বিপন্ন হবেন না। ইতি ৯।৫।৪০

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দিবানিদ্রা দিচ্ছিলুম—উঠেই তোমার কাগজে মোড়া বই পাওয়া গেল। ক্ষণে ক্ষণে উল্টে পাল্টে দেখা গেল। কিছুদিন পরে তুমি আসতে পারবে এ খবরটা এখনকার যুদ্ধের খবরের চেয়ে ভালো। বাঘ শিকারের মতো কোনো adventure-এর বই থাকে তো সঙ্গে এনো—হয়তো এখনকার লেখার কাজে লাগবে। বনমালী আমার রাতের প্রহরী। আমার পতন নিবারণের জন্যে আছে। সেই জন্যে নির্ভয়ে নাবার ঘরে সোজা চলে যাই। ইতি ১৫।৬।৪০

রবীন্দ্রনাথ

যে বইটা তখন লিখছিলেন সেটা 'ছেলেবেলা'—

কালিমপং থেকে লেখা—

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

হু হু শব্দে মাথাব চুল উঠে যাচ্ছে মাথায় চেপেছে সুধাকান্তকে অনুকরণের ঝোঁক। অত্যন্ত ভুল করেছি Silvicrine-এর শিশি ফেলে এসে। উৎকণ্ঠিত আছি। আশা করি খুচরো জিনিসের সঙ্গে সিলভিক্রিন আসচে। ওটা ডাকে পাঠাতে বিশেষ উৎপাত নেই তো। পেটমোটা সাহিত্যের বই পাঠানো অনাবশ্যক। ওটাতে আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। ওটা অমিয়কে পড়তে দেব মনে করেছিলুম কিন্তু সে চলে গেছে—এ যাত্রায় আসবে না। যাবার পথে গাড়িতে দ্বিজেন মৈত্র তার সঙ্গী ছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে মংপুর আতিথ্য স্মৃতি বিজড়িত ছিল।—এখানে আমার শরীর ভালোই চলচে। কল বিগড়েছিল—হয়তো শুধ্‌রে যাবে। এখানে জল খাই বৃষ্টির জল, হাওয়া পাই শুকনো আর বৌমা উৎসাহিত হয়ে লেগেছেন আমাকে মাংস খাওয়াতে। ইতি ৩০।৫।৪০

ওঁ

কালিংপং

কল্যা

ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্রের কাছে শুনেছিলুম তিনি তোমার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণে মংপু যাচ্চেন।

এইবার আমার নিমন্ত্রণ জানাই। গৌরীপুর ভবনে আমাদের সাহচর্যে তোমাকে কিছুদিন যাপন করতে অনুরোধ করি। বৌমারও এ প্রস্তাবে সস্নেহ সমর্থন আছে। মনোমোহনও মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক অবকাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন। তোমাদের প্রসন্ন করবার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আজ রৌদ্রপ্লাবিত আকাশ নির্মল দ্যুলোক ও ভূলোকের রবি তোমাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হচ্চে।

তোমাদের ওখানে এণ্ড্রিন এক পুটক ফেলে এসেছি, আসবার সময় সঙ্গে এনো তাহলে নাসারন্ধ্রযোগে আমার চিকিৎসার সহায়তা করবে বর্তমান দুর্যোগের যুগে ওষুধপত্র দুরায়ত্ত হয়েছে। আরো একটা প্রার্থনা আছে। তোমার ওখানে

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বইটা দেখেছিলুম সেটা যদি ঋণ স্বরূপ দিতে পারো আমার অশিক্ষা কিছু পরিমাণে সম্মার্জিত করবার সুযোগ হবে।

শরীর ভালো বোধ করচি। ইতি তারিখটা কী মনে পড়চে না, পত্রোত্তরে জানাতে ভুলো না। ইতি

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

সম্ভবত সেবারে আমার কালিম্পং যাওয়া হয় নি।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যানবাহনের আকস্মিক অপঘাতে তোমার পথ রোধ করে দিলে। মানুষের শরীর যন্ত্রেরও এই দশা ঘটে। সুরেনের মৃত্যু কিছুতে ভুলতে পারি নে— কিছুদিন পূর্বেই তার সৌজন্যমণ্ডিত সৌম্যমূর্তি দেখেছি, সেই তার মধুর চরিত্রের হঠাৎ অবসানে প্রকৃতির নির্মম উপেক্ষা যেমন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়ে দেয় এমন সাধারণ কোনো মৃত্যুতে করে না। আমি তো এসেছি আয়ুর শেষ ঢালু তট-সীমার উপরে। একটা সামান্য ধাক্কায় অতলে অকস্মাৎ পড়ে যাব যেমন একদিন পড়েছিলুম। এ অবস্থায় স্বজন পরিজনের দৃষ্টিগোচরে না থাকলে হঠাৎ কখন একসময়ে তাদের পরিতাপের কারণ ঘটতে পারে বলা যায় না। যে জীবন আশীবছর বয়সের জীর্ণ আশ্রয়কে অবলম্বন করে আছে তার সদ্যঃপাতিত্ব তোমার গাড়ির ভঙ্গুরতার মতো অত বেশি অচিন্তিত নয়। আমার খুচরো জিনিষপত্র পাঠাবার জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না। যথাসময়ে তার ব্যবস্থা অনায়াসে হতে পারবে। আপাতত কুমারসম্ভব যদি ডাকে পাঠাও তাহলে একটা দায়িত্ব থেকে রক্ষা পাব। ও বইটার সমালোচনার জন্যে তাগিদ আছে। ইতি ২৮।৫।৪০

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেনেদের বাড়িতে শনিবারের
চিঠির উৎপতনের কথা
সুধাকান্তবাবু কিছুই জানেন না।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সুরেনের বইখানা তোমাদের ওখানে পড়ে আছে। পাঠিয়ে দিতে বিলম্ব

কোরো না। ভূমিকা লিখতে পারচিনে। মেঘে আকাশ অন্ধকার হৃদপদ্ম সূর্যালোকের জন্য উৎসুক স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, মংপু থেকে খবর নিয়ে রানী আমাকে লিখেছে যে তোমার শাশুড়ির অসুখ নিয়ে তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতায় এসেছ। শুনে মনটা পীড়িত হল। সবসুদ্ধ কেমন আছ এক লাইন লিখে পাঠিয়ো। এবার অসুখের জের নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম, এখন কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু অশান্তি মনে সারাক্ষণ জাগছে। শ্রাবণ এসে পড়ল অথচ বৃষ্টি নেই। চাষীরা হতশ্বাস হয়ে পড়েছে। এই জাগতিক নিষ্ঠুরতার জন্য কাকে দোষ দেব ভেবে পাইনে। মানুষের ঔদাসিন্য এবং মূঢ়তা যে অনেক পরিমাণে এর কারণ তাতে সন্দেহ নেই। যে দেশে চাষের উৎকর্ষের জন্যে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সর্বদা উদ্যত তারা সৌভাগ্যবান। কিন্তু মানুষের মূল্য এদেশের অধিনায়কদের কাছে যৎসামান্য। তাই আকাশের দিকে তাকানো মিথ্যে মানুষের দিকে তাকিয়েও কোনো ফল পাইনে। মাঝের থেকে মনের মধ্যে কিছুতেই স্বস্তি পাইনে। যারা অকিঞ্চিৎকর তারা বেঁচে থাকবে না এইটাই হলো অভিব্যক্তিধারার বিধান। সেই কথা মনে রেখে প্রকৃতি চুপ করে থাকতে বলেছে।

"সানাই" প্রকাশের কাজ এগোচ্ছে শ্রাবণের শেষের দিকে তার আবির্ভাব হবে। ক্রেতামহলে নবজাতকের প্রতিযোগিতা পাছে করে—এজন্যে তাকে চেপে রাখা হয়েছিল। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৪৭ স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

কবি কালিমপং থেকে চলে যাবার পর প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবীশ মংপুতে সুরেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে আসেন। কবির বার বার আগমনের কারণে মংপু তখন একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে এসে গেছে—অনেকেই আসতে চান। ভূপতি সেন মহাশয়ও সস্ত্রীক আসেন।

আমি একটা কথা পূর্বে লিখেছি রবীন্দ্রনাথের দিনগুলো ঋতু দিয়ে বিভক্ত ছিল এবং সেই ঋতু শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলে না তা চাষীর জীবনকে স্মরণ করায়। রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি মাটির মানুষ তা তাঁর এই কৃষিকেন্দ্রিক চিন্তায় ধরা পড়ে।

২৬।৭।৪০ তারিখে সুধাকান্তবাবু লিখছেন আমার আজ যাওয়া হয়ে উঠল না যাব ৩।৪ দিন পরে সেইজন্য ডাকযোগে গুরুদেবের পত্রটি যথাস্থানে চলল।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, সুধাসমুদ্র কলকাতায় যাচ্ছে। তার হাতে এই চিঠি দিচ্ছি। রোগীপরিচর্যা নিয়ে কেমন আছ জানতে উৎসুক আছি। এতদিন পরে শ্রাবণ "রাজব দুন্নতধ্বনির" নেমেছে—বর্ষামঙ্গল ব্যর্থ হবে না।

কতকগুলো কী জিনিষপত্রের ফরমাসে বনমালী তোমাকে বৃথা উত্তেজিত করেছে। সেগুলো কী যে তা জানিও নে, সংসারে তার অভাব যে কোনখানে তাও এ পর্যন্ত বুঝতে পারচিনে।

বৌমা কলকাতায় গেছেন—বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তাঁর কাছ থেকে তোমাদের খবর প্রত্যাশা করচি।

প্রবাসীতে তোমার লেখাটা ভালো লাগল। আরো একটুখানি বড়ো করে শিক্ষা সংসদের জন্য প্রাণীতত্ত্ব যদি লেখো তো ভালো হয়। তোমার ভাষা বেশ সহজ এবং সরস হয়েছে। তুমি এখানে এলে সানাই-এর অপ্রকাশিত ফাইল তোমার হাতে দেব লিখেছিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার এখানে আসা হয়তো সম্ভব না হতে পারে মনে করে বইটা বিনা সর্তে পাঠাচ্ছি।

ইতি ২৪।৭।৪০ স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

যে লেখাটির কথা বলা হয়েছে সেটা 'প্রাণযাত্রা' নামে এভলিউশন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ।

বিশ্বভারতী

Founder President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

অসুস্থ শরীর নিয়েই এসেছিলুম এবং অসুখের জের টেনেই চলেছিলুম। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দেখছিলেন। নিজের মতও চালাচ্ছিলুম। অনেকটা ভালো হতেই চলে এসেছি। এবারে দেহটা কষ্ট পেয়েছে। একটা ভালো কথা এই যে গরম নেই। এমনকি রাত্রে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

আকাশটা অত্যন্ত নির্মম। মেঘ করেই আছে। বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা। যুদ্ধের জন্য ভাবব না চাষীদের জন্যে? পৃথিবীর এত দুঃখের জন্য দায়ী কে ভেবেই পাইনে। তোমাদের ওখানে বোধহয় জলে ভেসে যাচ্চে। "ছেলেবেলা" লেখাটা কলকাতায় খানিকটা পড়ে শুনিয়েছিলুম। লোকের ভালো লেগেছে, বলচে আরো লেখা চাই। মা গৃধঃ। বেশি করে দিলে দাম কমে যায়।

রবারের মুণ্ডওয়ালা পেন্সিল একটাও পাচ্চি নে। ওটা আমার পক্ষে দরকারী কানু বলচে মংপুতেই আছে। যদি থাকে অন্তত একটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

বৌমার পায়ে হয়েছে সায়াটিকা। ভালো লাগচে না। আশা করি ভাল আছ। সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভালো থাকবার মতো জায়গা কোথাও নেই। বোধকরি পর্বত শিখরে আছে।

স্নেহাকৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan
Shantiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

প্রকাশক সংঘ স্থির করেছেন এবার পূজাবকাশে "ছেলেবেলা" বের করা হবে—সানাই বাজবে অঘ্রাণ পৌষের শুভলগ্নে। কিন্তু যে হেতু বইটা ছাপা হয়েই আছে ওর একটা ফাইল বানিয়ে তোমার হাতে দিতে পারব যখন তুমি এখানে আসবে। স্থানাভাবের কথার আভাস দিয়েছ তোমার পত্রে—সেটাতে আমাদের প্রতি দারিদ্র্যের কলঙ্কারোপ করা হোলো—লজ্জিত হলুম। দুর্ভাগার স্থান সঙ্কীর্ণতার ক্লেশ তুমি না হয় আমার সঙ্গে ভাগ করেই নেবে। সেটা দুঃসহ হবে না। আসতে পার যদি খুশি হব। দেখতে পাবে জীর্ণবৃন্তে সদ্যঃপাতী শাল্মলী ফুলের মতো কিঞ্চিৎ দোলায়মান সংশয়িত ভাবেই জীবনটা চলচে।

পদক্ষেপের অনিশ্চয়তাকে কীরকম সাবধানে সর্বদা সম্বরণ করে নিতে হয় সেটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বাইরে থেকে দেখতে সেটা যতটা উদ্বেগজনক ততটা উদ্বেগের কারণ তার মধ্যে নেই।

আমার পরিত্যক্ত বেশবাস আমার কাছে পাঠাবার জন্যে জোড়াসাঁকোর ভোলানাথবাবুর উপরে ভার দিতে পার। সবচেয়ে সন্তোষের বিষয় হবে যদি সেগুলি হাতে করে আনতে পারো। যদি অসম্ভব হয় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও

তার ক্ষতি আমি অনুভব করব না। অভাবের উপলব্ধি যে কতটা আপেক্ষিক সে সম্বন্ধে তুমি যদি মনস্তত্ত্বমূলক একটা প্রবন্ধ লিখতে পারো সেটা অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনার যোগ্য হতে পারবে। কোনো কিছু লেখবার মতো অবস্থা আমার নয়। ইতি ৮ শ্রাবণ ১৩৪৭

স্নেহাসক্ত রবীন্দ্রনাথ

এই সময়ে Oxford থেকে ডকটরেট্ উপাধি দেবার প্রস্তাব হচ্ছে। ৭ই আগস্ট এই উপাধিদান উৎসব, কে জানত তার ঠিক এক বছর পরে এই দিনে তিনি চিরবিদায় নেবেন। আগেই লিখেছি সচরাচর আমি শান্তিনিকেতনে কোনো উৎসবে বা বেশি লোকের ভীড়ে যেতে চাইতাম না। কিন্তু এবারে আমার বিশেষ ভাবেই যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কবির এই চিঠির সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীরও সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কবির শরীর যে বেশ খারাপ যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম কিন্তু তার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি হয় নি। ওঁর বয়স যে আশির কাছে সেটা একেবারেই আমাদের মনে থাকত না।

পরের চিঠিতে যথারীতি মত পরিবর্তন, এখন এস না, পরে এস—কিন্তু তত দিনে প্রতিমাদিরাও নিমন্ত্রণ করেছেন। পুপের বিয়ের সময় ওঁর কথা শুনে যে অন্যায় করেছি, তার আর পুনরাবৃত্তি করব না মনে করে আমার ভাগ্নী রেণুকে নিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হলাম। ট্রেনে আমাদের সহযাত্রিনী ছিলেন শ্রীযুক্তা লতা রায়।

ওঁ

Uttarayan
Santinikatan Bengal

কল্যাণীয়াসু

৭ই আগস্টের আসন্ন সমারোহের উদ্বেগে মন ভারাক্রান্ত। বড়ো বড়ো লোকের অভ্যর্থনার ফাঁড়া কেটে গেলে নিশ্চিন্ত হব। সগর্বে স্থানাভাবের অপবাদ অস্বীকার করেছিলুম—মধুসূদন হেসেছিলেন অভাব আছে সে কথা কবুল করচি। অতএব সাতই তারিখটা পেরিয়ে যদি আস সেটাতে সুবুদ্ধি প্রকাশ পাবে।

এতদিন পরে শ্রাবণ আপন পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করে কাল এসেছিল। এখন কেবল প্রার্থনা এই যথাসময়ে এই উৎসাহ যেন সংযত করা হয়। দেবতার বিদ্রূপ এক এক সময়ে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

"ছেলেবেলা" ছাপার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। তুমি এখানে এলে অন্যান্য আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। ইতি ১।৮।৪০

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুপুরবেলা গিয়ে পৌঁছলাম—কবি উদীচীর দোতলায় বসেছিলেন, সহাস্যে বললেন, গাড়ি গিয়েছিল তো? তোমাদের সঙ্গে লতা এসেছে? আমি বললুম, লতা কে আমি তা জানি না। আমি দেখতে এলুম আপনার স্থানাভাব কী রকম হয়।—আরে তুমিও যেমন! কিছুই অসুবিধা নেই, এই বারান্দায় একটা চৌকি বিছিয়ে নিতে পারবে আর সারারাত আমার উত্থান পতনের চৌকি দেবে!

আমাদের বন্দোবস্ত হয়েছিল শ্যামলীতে। পুনশ্চতে ছিলেন সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ সপরিবারে বা সবান্ধবে—তাঁর দলে কে কে ছিলেন মনে পড়ছে না—তবে বিরাট আড্ডা জমত। আর এসেছিলেন সার মরিস গয়ার—তিনিই অক্সফোর্ডের পক্ষ থেকে উপাধি দেন। তাঁর ব্যবস্থা হয়েছিল উদয়ন বাড়িতে। তিনি উত্তরায়ণ ঘুরে দেখে বলেছিলেন, এমন বাড়ি আমি দেখিনি—There is thought in every corner—আমি কবিকে এ খবর দিয়ে গৃহ ও বাগানের সজ্জার জন্য প্রতিমাদির প্রশংসা করলে পুত্রবৎসল পিতা বললেন—রথীকে বাদ দিচ্ছ কেন—এসব তো রথীরই কল্পা!

উদীচীর নীচের তলায় ছিলেন রানীদি ও মীরাদি। তাঁরাই একটু চৌকি দিতেন—বেশি লোক যখন তখন কবির কাছে ভীড় করে কিনা। একদিন হারীতকৃষ্ণ দেব একটি বিরাট ম্যানাস্ক্রিপট নিয়ে কবির দ্বিপ্রহরের খাবার একটু আগেই উপরে উঠে গেলেন, তারপর আর নামেনই না—অবশেষে রানীদি ও মীরাদি কবির খাবার নিয়ে উপরে গিয়ে তাঁকে একরকম উঠে যেতে বাধ্য করলেন। কবি কিন্তু এতে ভারি ক্ষুব্ধ—তোমরা বড় অসহিষ্ণু, না হয় একটু দেরীই হত খেতে—ও কতদিন ধরে কত কষ্ট করে লিখেছে, আমি ছাড়া আর কেই বা শুনবে।

আমাদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল শ্যামলীতে, প্রতিমাদি বললেন, হয়েছে ভালো, গুরুদেবের প্রিয় শ্যামলী ঘরে একবার থেকে দেখো। তবে মাঝরাতে দরকার হলে উত্তরায়ণে চলে আসতে দ্বিধা কোরো না। হলও তাই। রাত দশটায় ঘরে ঢুকে দেখি প্রচণ্ড গরম। মাটির ঘর তো ঠাণ্ডা হয় জানি—এই

গরমে কবি কি করে থাকেন জানি না—আমি ও রেণু বালিশ বগলে, প্রতিমাদি পুষুর বড় ঘরে ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলাম। কদিন রাত্রে বিরাট ডিনার পার্টি হল, আমি সেখানে বড় একটা যেতে চাইতাম না—উদীচীতে কবির ঘরেই খাবার আনিয়ে নিতাম—একদিন সন্ধ্যায় রথীদা ভৃত্যদের দিয়ে কি বলে পাঠিয়েছিলেন, বুঝতে পারি নি। পরের দিন সকালে ওদের বড় ঘরে গিয়ে দেখি দুজনে রাগ করে বসে আছেন। প্রতিমাদি মুখ ফিরিয়ে রইলেন। রথীদা গম্ভীর মুখে বললেন, আমি দু একটা কথা বলতে পারি, কিন্তু তোমার বৌঠান রাগ করছেন, কথা বলবেন না। কাল তোমাকে ডিনারে ডাকতে পাঠালুম। আগের দিন রানী hostess হয়েছিল, কাল তুমি হবে তা তুমি এলেই না, সেই যে উদীচীতে ঢুকেছ, খালি ঘর আর বারান্দা!

আজ মাঝে মাঝে রথীদা ও প্রতিমা দেবীর সেই সুন্দর মধুর দিনগুলো মনে পড়ে—তাঁদের বড় ঘরে দুটি খাটে পরিপাটি বিছানায় সিল্কের কাঁথা। ঘরে প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্যের বিশেষত্ব, মাথার কাছে রূপার থালে কয়েকটি জুঁই ফুল। সমস্ত জড়িয়ে যে পরিবেশ তার মাধুর্য বেষ্টনে একদিন যে তাঁদের দেখেছিলাম—পরের দুঃখকর পরিতাপজনক ঘটনায় ভগ্ন সংসারের ভস্মরাশি তাকে আবৃত করতে পারে না।

উপাধি প্রদান উৎসব সিংহসদনে হল, সন্ধ্যায় নৃত্যনাট্য "শ্যামা"। কিন্তু এই ঘটনা আমার মনে কোনো বিশেষ ছাপ রাখে নি। রবীন্দ্রনাথকে আবার উপাধি কে দেবে এবং সেটি তাঁর কি কাজেই বা লাগবে।

আমার কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে আসছে—আগস্ট মাসে উৎসবান্তে মংপু ফিরে গেলাম—যখন বিদায় নিতে যাই আমার মনে সংশয় হচ্ছিল, এবার আর আসতে পারবেন কিনা। আমি কাঁদছিলুম। উনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মনে কোনো দ্বিধা রেখ না, একমাস পরে নিশ্চয় তোমার কাছে যাব। আমি তো তোমায় বলেছি শেষ কটা দিন না হয় তোমাদের কাছেই কাটাব।

প্রতিমাদি আগেই এলেন ও কয়েকদিন আমার কাছে থেকে কালিমপং চলে গেলেন।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

অক্টোবরে ছুটি আরম্ভ হবে তখন তোমাদের আশ্রয়ে যাব। ইতিমধ্যে বৌমার খবর মাঝে মাঝে দিয়ো।

আমার খবর শোনবার যোগ্য নয়। কখনো জ্বর কখনো অজ্বর কখনো ভালো কখনো মন্দ।

রথী যাচ্ছেন পতিসরে। আমি রইলুম সঙ্গীত ভবনের একেশ্বর দূরের থেকে। আমার গরম কাপড়গুলো বিক্রি করে ফেলো না দুটো একটা থাকলে কাজে লাগবে। রবীন্দ্রনাথ

দু বাক্স গরম কাপড় আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন, আবার আসবেন বলে।

আমার কাছে আসবার কথা কিন্তু জ্বরটা আমাদের ভালো লাগছে না। সে জন্য আমরা চিন্তিত। মংপুতে ডাক্তার নেই। টেলিফোন নেই। টেলিগ্রাফ আপিস নেই। এরকম জায়গায় অসুস্থ মানুষকে আনা হঠকারিতা। কিন্তু উনি যে আসতে চান—প্রতিমাদিকে লিখেছেন—"হংস বলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস সরোবরের দিকে। মংপুতে মাগুর মাছের সরোবরের তীরেও শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম।"

মাগুর মাছের সরোবর কথাটির ব্যাখ্যা আছে। আমার বাগানে একটি ঝরণার উৎস ছিল, সেটিকে ঘিরে একটি জলাশয় বানিয়েছিলুম। রথীদা পতিসর থেকে কই মাগুরের চারা কয়েকটি কলসীতে ভরে আমার গাড়িতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৪০ এর সেপ্টেম্বরে আমার কাছে আসা মোটামুটি ঠিক, তারিখটা তখনও জানি না। এমন সময় আমার মার কাছ থেকে চিঠি পেলাম, কবি কলকাতায় এসে পৌছেছেন। ডাঃ বিধান রায় ওঁর সব রিপোর্ট দেখে বলেছেন, এখন পাহাড়ে যাওয়া ঠিক নয়। মীরাদি ছিলেন, আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে এখন মংপুতে জানাতে হয়। মীরাদি বললেন, বাবা যখন যাবেন স্থির করেছেন, যাবেনই। আমার মা আমাকে সাবধান করে লিখলেন, কবি তোমার কাছে যাবেন স্থির করেছেন। ডাক্তার বারণ করছেন। আমরা বারণ করতে পারলাম না কিছুতেই—তুমি বারণ করে লেখ। কিন্তু আমারও লেখা হল না। কী লিখি ভাবতে ভাবতে কয়েকদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে সুধাকান্তবাবুর চিঠি এলো আমার স্বামীর কাছে—

6, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta
19.9.40

প্রীতিভাজনীয়েষু

সবিনয় নিবেদন।

পূজনীয় গুরুদেব আজ রওনা হচ্ছেন by Darjeeling mail কালিমপং-এর পথে। কারণ চিকিৎসকগণ (Sir Nilratan and Dr. B. C. Roy) বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, শরীর যেরকম দুর্বল এবং দৈহিক অস্বাস্থ্যহেতু এমন জায়গাতেই changeএ যাওয়া শ্রেয়, যেখানে হাতের কাছে অন্তত first aid দেবার মত ২।১ জন M. B. ডাক্তার পাওয়া যায়। As a matter of fact Dr. Bidhan Roy তো পাহাড়ে যাবার-ই বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু বলতে পারলেন না। অতএব গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী পর্বত যাওয়ার অনুমতি পেলেন। কিন্তু আপাতত কালিমপং যাওয়ার অনুমতি। সুস্থ হলে পরে মংপু যাবেন। আশা করি কুশলে আছেন।
ইতি—

আপনাদের
অনুগত
শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই কালিংপং থেকে কবির চিঠি এল। আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষর শরীরের দুর্বলতা প্রকাশ করছে—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু মিত্রা

শরীর খারাপ। ডাক্তার এখানে আসতে নিষেধ করেছিলেন—কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় সমতট অত্যন্ত অসহ্য। শরীরের দুর্লক্ষণের না উপশম হওয়া পর্যন্ত নির্ডাক্তার দেশে যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি যদি আসতে পার খুশি হব আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে। গল্পটাও শোনাবার অবকাশ হবে। দুটো গরম জামা এবং লুঙি শীতবস্ত্ররূপে আমাকে দান করলে পুণ্যভাগিনী হবে—যদিও যথেষ্ট কাপড় আছে। যথেষ্ট ঠাণ্ডাও লাগচে না। লেখা পড়া দুই বন্ধ করে জীবন্মুক্ত অবস্থায় আছি।

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ

এরপরে কালিমপং পৌছলাম আমার কন্যা, তার পরিচারিকা সুখদা ও ভাগ্নী রেণুকে নিয়ে। কালিমপঙের সেই অধ্যায়ের বর্ণনা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখেছি। এখানে তার পুনরুক্তি করব না। অন্যান্যবার সঙ্গে সুধাকান্তবাবু বা অনিলবাবু আসেন, এবার সেরকম কেউ নেই, খালি আলুবাবু। উনি আমাকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন, বললেন, তুমি কি আর থাকবেই না? রুগী দেখে ভয় পেলে কি? একটু সেবা কর। আবার আমার স্বামীর অসুবিধা হবে সেটাও ভাবছেন—ডাক্তারকে আসতে বল—গল্পটা শোনাই। গল্পটা ল্যাবরেটরি।

তারপর ১০ই সেপ্টেম্বর আমরা কলকাতায় নামলাম। কয়েকটা দিন প্রায় একলাই আমাকে সামলাতে হয়েছে—সে যে কি অবস্থা তা আজ আর ভালো করে মনে করতে পারি না। আমার বর্তমান বইয়ের পাঠক অনুগ্রহ করে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর পঞ্চম পর্ব যেন পড়ে নেন।

কলকাতায় পৌছে দেখি জনারণ্য—প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন গলা কাঁপছে—"সুধাকান্তকে বললাম শিবরাত্রির সলতে-টুকুকে নিয়ে যাসনে নিয়ে যাসনে"—

তারপর ইন্দিরা দেবী ও বীরবল ঘরে ঢুকলেন—বীরবল তখনই বেশ অসুস্থ, পা টেনে টেনে চলছেন—ইন্দিরা দেবী হাতপাখা নাড়তে নাড়তে—"প্রশান্ত বলে মৈত্রেয়ী জোর করে পাহাড়ে নিয়ে গেল—" তাঁর গলা ধরে এল। এদিকে আমি পূবের বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠপুত্তলি হয়ে গেছি—আমার শরীরে জ্ঞান আছে, মনে নেই। হঠাৎ দেখি মীরাদি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তুমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছ কেন মৈত্রেয়ী—বাবার কাছে বোসো গিয়ে—একি তুমি কাঁদছ কেন? এখন তো অনেক ভালো আছেন। ও বুঝেছি—তিনি আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন বারান্দার অন্য প্রান্তে খাবার ঘরের সামনে যেখানে সবাই বসে আছেন—বিবিদিকে লক্ষ্য করে—তোমরা কী বলছ বলত—বাবাকে যে দিন বিধান রায় বারণ করেন সেদিন তো আমি এখানে রয়েছি—বাবা বললেন—আমি নিশ্চয় যাব। বাবা যদি যান তো ও বেচারা কি করবে। তখন খাবার ঘর থেকে প্রতিমাদি বেরিয়ে এলেন—"আমি নানা কথা শুনছি—কিন্তু স্পষ্টই বলছি, 'মৈত্রেয়ী যদি কালিংপং এসে না পড়ত তাহলে কী যে হত আমি ভাবতে পারি না—অনেকে আমায় বলছে, যে থাকত সে-ই করত। আরে করতে তো পারা চাই।" আমার ব্যথা জুড়িয়ে গেল—আমি মীরাদির কথামতো রোগশয্যার পাশে গিয়ে বসলাম। কিন্তু আমার যা মনে আসছিল

তা বলা হল না, তা এই যে, আমার কাছে মংপুতে যদি যেতেন তাহলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না। কারণ, আমি যতদূর শুনেছিলাম, যে দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার আগের দিন ঠাণ্ডা লাগবার কারণ, স্নানের ঘর থেকে খালি গায়ে বেরিয়ে এসে বেশ খানিকক্ষণ জামার জন্য ডাকাডাকি করতে হয়েছিল। ওঁর একটি খেয়াল ছিল, কোন্ জামা পরবেন, কোন্ তোয়ালে ব্যবহার করবেন সে সম্বন্ধে মনে মনে একটা ঠিক করে নিলে অন্যরকম ব্যবহার করবেন না, অথচ কাউকে বলবেনও না যে, এইটা দাও—বুঝে বুঝে করে দিতে হত। আমার কাছে থাকার সময় স্নানে যাবার আগে আমি প্রত্যেকটি জামা-কাপড় দেখিয়ে দিতাম—তারপর বন্ধ দরজার বাইরে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। যদিও আমাকে কেউ কখনো বলে নি, ওঁর কত বড় অসুখ আছে। কিন্তু আমার মনে হতো, এত বৃদ্ধ মানুষকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে দেওয়া উচিত নয় এবং কাছাকাছি থাকা দরকার। ওঁর একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও এগুলি নিয়ে আমি জোর করতাম।

কলকাতায় আসার পর বুড়িই নার্সিং-এর প্রধানা হল, সুরেন কর প্রধান—অমিতা ঠাকুর এলেন। কিছুদিন পর অনিল চন্দ রানীকে নিয়ে এলেন। বললেন, গুরুদেব রানী এসেছে, আপনাকে প্রণাম করবে। উনি চোখ বুজে ছিলেন, বললেন, কে? অনিলবাবু বললেন, রানী, তবে আসল নয়, নকল। এইবার চোখ খুলে হাসলেন, "আসল নকলের যাচাই করে কে রে?"

রানী চন্দকে এর আগে কবির কাছে বেশি আসতে দেখি নি। এখন থেকে রানীও সেবিকার দলে ভর্তি হল—শেষ ক'দিনের একটি সুন্দর ছবি তার একটা লেখায় আমরা পেয়েছি।

আমরা সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কলকাতায় নেমে এলাম। অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রইলাম। এই ক'দিন প্রাণভরে সেবার সুযোগ পেয়েছি। দিনে দুজন, রাত্রে দুজন থাকা হত। রাত্রে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে। আমার সঙ্গে প্রায়ই বীরেন সেন থাকতেন। ওঁর সঙ্গে কাজ করে তৃপ্তি পেতাম। আমি শান্তিনিকেতনের কেউ নই বলে ওঁর কোনো অবজ্ঞা ছিল না। যেটা অন্যদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। কবির ঘরের পাশে রথীদার ঘর, তার পরের ঘরে মাটিতে জাপানী ঢালা বিছানা। আমরা মেয়েরা যে যখন সময় পেতুম ঘুমিয়ে নিতুম। ওরই এক পাশে আমার কন্যা মিট্টু ঘুমাতো। সে একদিন প্রতিমাদিকে বলছে, মা যে রাত্রে উঠে কোথায় যায় ভগবান জানেন—আর কোনদিন একটুক্ষণ দেখতে না পেলে কবি বলতেন,

"তুমি ক্ষণে ক্ষণে যাও কোথায়, মংপু নাকি ?"

ঐখানে একদিন আমার একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দুপুরের দিকে কখন এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি শুভ্রবেশা, শুভ্রকেশা, মহিমান্বিতা সরলা দেবী আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বাতাস করছেন। ওঁদের হাতে তখন সর্বদা জাপানী হাতপাখা থাকত, যখন-তখন নিজেদের ব্যজন করতেন। সরলা দেবী সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল, তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, একটু কঠোর স্বভাবা। কিন্তু সেদিন তাঁর স্নেহকোমল মাতৃমূর্তি আমাকে অভিভূত করেছিল—আমি তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করলাম, "আপনি কেন ?"

"আহা তাতে কি ? সারারাত জাগো, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই···"

পুরুষরা থাকতেন বিচিত্রা ঘরের দিকে। ডাক্তার রাম অধিকারী কিছুদিন ছিলেন। প্রধানত তিনিই মাঝে মাঝে কবিতা বলতে পারতেন। আর পারতেন বীরেন সেন। বীরেন সেন খুব সাদামাটা গলায় কবিতার পর কবিতা বলে যেতে পারতেন। এঁরা ছাড়া তাঁর চারপাশে আর কাউকে বেশি দেখিনি যাঁর রবীন্দ্রসাহিত্য ভালোমত মুখস্থ।

অতটা অসুস্থতার মধ্যেও যুদ্ধ সম্বন্ধে খবর রাখতেন। একদিন প্রশান্তবাবু এসে খবর দিলেন, রাশিয়ানরা জিতছে—সেদিন কি আনন্দ! ওঁর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে আলো ভরে গেল। বললেন, এ আমি জানতুম, শেষ পর্যন্ত ওরা জিতবেই।

যে কয়জন মেয়ে সেবা করতেন তাঁরা একই থাকতেন কিন্তু পুরুষদের মধ্যে প্রায়ই বদল হত—রথীদা ২।৪ দিন অন্তর নূতন নূতন লোক নিয়ে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ একেই সেবা নিতে অভ্যস্ত নন, তারপর যার তার কাছে অনাবৃত হতে দুঃখ পেতেন। যে মানুষ অনায়াসে পুত্রশোক সহ্য করেছে আজ তাঁর কথায় কথায় চোখে জল আসত। একদিন শ্রীনিকেতন থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। শুনলাম তিনি রাত্রে থাকবেন। ঘরে গিয়ে দেখি কবির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমার হাত ধরে বললেন, "রোজ রোজ নূতন নূতন লোকের কাছে আমাকে অপমানিত কর কেন ?"

আজ সেদিনের কথা ভাবতে বসে ছোট ছোট কত কথাই না মনে পড়ছে—বেশি মনে পড়ছে সেই রোগশয্যার পাশের রাত্রিগুলি। আসন্ন মহাপরিণামের সামনে জেগে বসে থাকার একটা বিশেষ spiritual উপলব্ধি আছে, যা কথায় ধরা যায় না। নিঃশব্দ জগতে একটা ছোট ঘড়ির শব্দ টিক টিক করে মহাকালের পদশব্দর অনুকরণ করে—মানুষ যে কত একা কত নিঃসঙ্গ, সে যে কোন্ দূর পথের চির পথিক, সেই অমোঘ সত্যটি নিঃশব্দে অন্তরে প্রবেশ করে। আমি

অনেক সময় খাটের পাশে বসে সেই মৃত্যুচুম্বিত, আচ্ছন্ন, অনিন্দ্য শরীরের উপরে একখানি হাত রেখে চোখ বুজে এক অন্য জগতে চলে যেতাম—উনি যা এতদিন শিখিয়েছেন, তাই ভাবতে চেষ্টা করতাম। আমাদের ভালোবাসার সমুদ্রের উপর দিয়ে এই মহাপুরুষের সত্তা যেন নির্বিঘ্নে ভেসে চলে যায়, যেন কোনো আসক্তির বীচিভঙ্গ সে যাত্রাতে বাধা না হয়। যেখান থেকে বাক্য ফিরে আসে, যেখানে মন পৌঁছায় না, হে ঈশ্বর সেখানে আমার কান্নাও যেন না পৌঁছায়।

তখন নূতন সালফা ড্রাগ এম বি সিক্স নাইন থ্রি বেরিয়েছে। নীলরতন বাবুর প্রেসক্রিপসনে ঐ ওষুধ খেয়ে অনেকটা ভালো আছেন। কিডনির ইন-ফেকশন কমে গেছে, জ্বর নেই। প্রায় একমাস হল আমি এসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছি, এবার যথাস্থানে যেতে হয়। আমি রথীদাকে বললুম, এবারে ফিরে যাই। রথীদা বললেন, এখন তো ভালো আছেন, তাই বরং যাও, আবার মাস-খানেক পরে এসো। প্রতিমাদি বললেন, কিন্তু বাবামশায়ের তোমার জন্য মন কেমন করবে। আমি বললাম, তা আমি জানি। কি করব বলুন। রথীদা বললেন, এখন তোমার যাওয়াই ভালো। মনোমোহন একলা আছেন, তুমি কয়েকদিন পর আবার এস শান্তিনিকেতনে। আমি তখন রথীদার হাত ধরে বললুম—'রথীদা, শেষ সময়ে যেন খবর পাই। আমাকে ভুলে যাবেন না তো?' রথীদা বললেন, 'মৈত্রেয়ী আমি কি এতই দায়িত্বজ্ঞানহীন, এতই নিষ্ঠুর—তোমাকে খবর দেব না?'

যাবার টিকিট করে সকালবেলা প্রাতরাশের পরে কবির কাছে সুধাকান্তবাবু আমার যাবার কথাটা পাড়লেন—অনেক ভনিতা করে কথাটা বলা হল। একেবারে টিকিট হয়ে গেছে শুনে খুব দুঃখ পেলেন—চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সেখানে বীরেনদাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুধাকান্তবাবু ও তিনি চলে যেতে উনি বললেন—নিজে বলতে পারলে না, ওকে দিয়ে বলালে কেন? কেন তুমি সবার সামনে আমাকে অপমানিত করালে কেন?

সেদিনের কথা মনে পড়লে আজ অনুশোচনায় দগ্ধ হই। আমার একেবারেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল না। শেষ এই দশটা মাস ওঁর কাছেই থাকা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু বয়স কম ছিল, চরিত্রে দার্ঢ্য ছিল না। কর্তব্য অকর্তব্য, কে কি বলবে না বলবে, এইসব ছোট ছোট কথা বড় হয়ে দেখা দিত। একমাস পরে শান্তিনিকেতনে আসব বলে বিদায় নিয়ে গেলাম।

আমার ফিরে যাওয়া ঠিক হলে আমার স্বামীকে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিটা রানী চন্দ লিখে দিলেন, সই করলেন কম্পিত হস্তে রবীন্দ্রনাথ।

কলিকাতা ৭ কার্তিক ১৩৪৭

কল্যাণবরেষু

মৈত্রেয়ীর সহযোগে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে তোমাদের সেবা উপহার দিয়েছো এবং দীর্ঘকাল সাংসারিক অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও সহিষ্ণু ভাবে এই দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছ—এতে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেছে। তোমাদের এই অর্ঘ্য চিরদিন আমার মনে থাকবে। তোমরা আমার সর্বান্তঃ-করণের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। আমি বর্তমানে স্বাস্থ্যের অভিমুখে উত্তরোত্তর অগ্রসর হচ্ছি। এখন আর পূর্বের মতন নিরন্তর সেবার প্রয়োজন হয় না। এখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে একবার তোমাদের দুজনকেই যদি দেখতে পাই তাহলে অত্যন্ত আনন্দলাভ করব। আশীর্বাদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠির হাতের লেখা রানী চন্দর, কম্পিত হস্তের সই কবির। এই সময় থেকে রানী চন্দই বেশির ভাগ চিঠিপত্র লিখে দিতেন। কিছু কিছু দিতেন সুধাকান্ত। আর শান্তিনিকেতন ফিরে যাবার পর দেখতুম অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা রানী পিছনে বসে টুকে নিচ্ছেন। এইভাবে 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইটি লেখা হয়।

মংপুতে পৌছে কলকাতার খবর পেতাম অমিতা ঠাকুরের চিঠিতে। অসূয়াশূন্য ঐ মেয়ে আমাকে নিয়মিত খবর দিয়েছে। তার চিঠি থেকে দু একটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

ভাই মৈত্রেয়ী··· 22.10.40

তুমি যেমন দেখে গেছ ঠিক তেমনি আছেন। খাওয়া-দাওয়ার পরিবর্তন কিছু হয় নি। জ্বর সেই সামান্য একটুখানি মুখে যেমন ওঠে—সেটা ঠিক জ্বর বলা যায় না। তোমরা চলে গিয়ে চুপচাপই বেশীর ভাগ থাকেন। আমরা যে তেমন কথা কইতে পারি না ভাই···তোমার কথা ভাই সেজন্য আমার খুব মনে হয়।··· ···

ভাই মৈত্রেয়ী

···খাওয়া-দাওয়া ওষুধপত্র সব সেই রকম চলছে, রাত্রে ঘুম ভালই হচ্ছে মোটের উপর ভালো আছেন জেনে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ো। তোমার কথা প্রায়

বলেন রোজই। তোমার স্বামীর শতমুখে প্রশংসা করেন। তোমাকে সৌভাগ্যবতী বলেন।· ··· অমিতা

30. 10. 40

ভাই মৈত্রেয়ী

···তুমি সব খবর জানতে চেয়েছো। খবর ভালো। জ্বর খুব অল্প সময়ের জন্য ৯৯° / ৯৯°২ ওঠে, ঘুম ভালো হয়। খাওয়ায় ভীষণ অরুচি সেটা একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।···

···যাই হোক মোটের উপর ভালো আছেন তার প্রমাণ যে আগামী রবিবার ওঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হবে কথা হচ্ছে। একজন ডাক্তার পাওয়া গেছে ওঁর কাছে সদা সর্বদা থাকবেন তিনি।

···তোমার নাম প্রায়ই করেন। একদিন বললেন, লিখে দিতে তোমায় যে তাঁর কানের সেবা তুমি অনেকদিন করেছ, তিনি তাঁর কান আর কারো হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নন। তোমার অনেক প্রশংসা করেন। তুমি ভাই সব দিক দিয়েই ভাগ্যবতী।

মিষ্টু কেমন আছে? আমাদের কথা কিছু বলে কি? তোমার যে কত খারাপ লাগছে তা ভাই বেশ বুঝতে পারছি। এবার সবাই চলে গেলে আমারও সেই দশাই হবে।···

ইতি

তোঃ অমিতা

রোগ শোকের বাড়িতে আনন্দও যে ছিল না তা নয়, যিনি রোগাক্রান্ত তিনি নিজেই আনন্দময়। সর্বদা রোগীর ঘরকে হাস্যে পরিহাসে উজ্জ্বল করে রাখতেন। আমি যতদিন ছিলুম ততদিন কবিতা মুখস্থ বলে বলে ওঁকে খুশি রাখতুম। মাঝে মাঝে রাম অধিকারী ও আমার প্রতিযোগিতা চলত, সেটা উনি খুব উপভোগ করতেন।

মুখে অত্যন্ত অরুচি। বললেন, যশোরে চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল খেয়েছিলেন। শাশুড়ির রান্না ওরকম দ্রব্য আর তো কোনো দিন খাওয়া গেল না। মামাবাবু ছিলেন কবির শ্যালক, তিনি চৈ নিয়ে এলেন—সেই প্রথম ঐ মশলাটি দেখলুম, ঝাঁঝাল একটি লতা—যত্নে কৈ নয় বাংলাদেশের চৈ রান্না হল। সবাই প্রসাদ পাওয়া গেল। কিন্তু কবির মুখে তাও আর পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে আনল না।

সেরে উঠে শান্তিনিকেতন যাবেন, আগে থেকেই বড়মাকে সবাই ধরেছে খাওয়ানোর জন্য। বড়মা ভোজের আয়োজন করলেন। আমি চলে আসার পর আমাকে কবিতায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন—

আনন্দ ভোজ

এসো মৈত্রেয়ী স্বামীর সনে
আসন্ন ভোজের নিমন্ত্রণে
মিঠুরেও এনো সঙ্গে করি
ভোজ তালিকায় তারেও ধরি
সেবা করি যাঁরে হয়েছ ধন্য
তুমি না আসিলে হবেন ক্ষুণ্ণ
আমাদের মন ব্যথিত হবে
সেরা-সেবিকায় না পেলে তবে
পড়িয়া রয়েছে সোজা রেলপথ
কিনিলে টিকিট পুরে মনোরথ
আরো যদি দ্রুত আসিতে চাও
বিমানে চড়িয়া হও উধাও
নব যুগে নব যানের গতি
হারায় চপলা হারায় মতি।
আগামী সোমের সন্ধ্যাবেলা
বসিবে হেথায় ভোজের মেলা
আনন্দ ভোজের আনন্দ আসরে
এসো যদি তুমি ক্ষণকাল তরে
হইবো সকলে সফল কাম
তুষিয়া মোদের রাখ মৈত্রী নাম।

বড়মা
৮ই কার্তিক ৪৭ শ্রীহেমলতা দেবী

এইসব চিঠি পেয়ে কতকটা আশ্বস্ত হলাম। মনে হল সবাই আনন্দ করেই ফিরে যাচ্ছেন। প্রতিমাদিও লিখলেন—

…বাবামশায় ভালো আছেন, জ্বর ৯৯° করে বিকেলে এলেও ডাক্তার বলছেন ওতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, ক্রমশ যাবে। এখন চেহারা অনেক

ভাল।···তোমার কথা বাবামশায় প্রায় বলেন। এখন যে রকম আছেন তাতে আর ১৫ দিনের মধ্যে ডাক্তাররা বোধহয় শান্তিনিকেতনে যাবার অনুমতি দেবেন।···

·উনি ভালো আছেন বলে আমার মামাশ্বশুর ডাক্তারদের খাওয়াচ্ছেন সঙ্গে সেবক সেবিকারাও অবশ্য। বুঝতেই পারছ আহারের পর তুমুল জমবে রামবাবুকে নিয়ে।··· ২৮ অক্টোবর ১৯৪০

বুঝলাম নভেম্বরের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতন পৌছাবেন। তাহলে মাস দেড়েক মংপু থেকে আমি শান্তিনিকেতন যাব। এই রকম স্থির করলাম।

মংপু পৌছেই শান্তিনিকেতনে এক বাক্স লেবু পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তরে কবিতা এলো—অন্য কেউ লিখেছে, সই এবং সংশোধনী কবির।

নগাধিরাজের দূর নেবু নিকুঞ্জের
রসপাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা।
অজানা নির্ঝরিনীর
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায়
হিরণ্ময় লিপি,
সুনিবিড় অরণ্য বীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।
রোগপঙ্গু লেখনীর বিরলভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্ব্বাদ তার।

শান্তিনিকেতন ১৫।১১।৪০ রবীন্দ্রনাথ

আমি কবিকে আর বেশি চিঠিপত্র লিখতাম না, আমার সংকোচ হত—চিঠি লিখলেই উত্তর দেবার জন্য ব্যস্ত হবেন, সবাই হয়ত ভাববে বিরক্ত করছি। চিঠিপত্র সব প্রতিমাদি ও রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলত। তাঁরা দুজনেই ভালো চিঠি লিখিয়ে, দীর্ঘ পত্র লিখতেন। এখন জানি, এটা ভুল হয়েছিল। কে কি ভাববে তাতে আমার কি! কিন্তু আমার আজকের মনটা তো সেদিন ছিল না। যে জন্য আরো একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে—যখন কবি মংপুতে ছিলেন,

আমার প্রায়ই মনে হত, এখানে একটা সম্পূর্ণ দিন কবি কি করে কাটান তার film তুলে রাখবো। ফিল্ম তোলান আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমার দুই মামা film জগতে দিক্‌পাল—এক হিমাংশু রায়, অন্য প্রমোদ রায়। এঁদের বললে এঁরা ব্যবস্থা করে দিতেন, হয়ত খরচও লাগত না। কিন্তু আমি বললাম না—আমার কেবল মনে হতে লাগল, লোকে বলবে রবীন্দ্রনাথ ওর বাড়ি গেছেন কিনা তা জাহির করবার জন্য এই সব হচ্ছে!—এই কথাটি সেদিন সত্যজিৎ রায়কে বলেছিলুম—তিনি বললেন, রাখলে ভালো করতেন, তবে লোকে বলতও ঠিক।

ষাট বৎসরের প্রান্তে পৌঁছে আমি সেই "লোকে বলার" উৎপাতটা দুহাতে ভেঙে দিয়েছি তবে তার ফলে হাত যে ক্ষতবিক্ষত হয় নি তা নয়।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমে আবার এক বাক্স কমলালেবু পাঠালাম। তার উত্তরে অনেক দিন পর একটি স্বহস্তে লেখা সম্পূর্ণ চিঠি পেলাম। হাতের লেখা সামান্য বাঁকা হলেও খুব নিপুণ ভাবে লেখা।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার কমলালেবু উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এখন আমার প্রধান পানীয় এই কমলালেবুর রস।

আরোগ্যের পথে ধীরে ধীরে এগোচ্চি কিন্তু এখনো চারিদিকে শুশ্রূষার দ্বারা বেষ্টিত আছি—স্বাধীন শক্তিতে এখনো আমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারিনে—তাই রোগের প্রত্যন্ত দেশে বন্দী আমি।

চীন দেশের রাজদূত এসেছিলেন, কাল গেলেন।. প্রাচীন চীনের সৌজন্যের প্রতিমূর্তি—প্রসন্ন শান্তি তাঁর সহাস্য মুখশ্রীতে প্রকাশ পাচ্চে—দেখে আমাদের শিক্ষা হয়।

আকাশ নিরালোক মেঘাচ্ছন্ন, একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে। মেঘমুক্ত সূর্যালোকের জন্য মন অপেক্ষা করে আছে। তোমার শাশুড়ি কেমন আছেন। তাঁর দীর্ঘকালের রোগভোগ তোমাদের মনকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে বুঝতে পারচি। তাঁর আরোগ্য কামনা করি।

লেখা এখনো আমার পক্ষে সহজ হয় নি। ইতি ১৩.১২.৪০

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

মনোমোহন কি এখনো মংপুতে?

কবির এই চিঠির সঙ্গে একই দিনে আলাদা খামে সুধাকান্ত লিখছেন—

Santiniketan P. O.
E. I. Ry Coop
Dist. Birbhum

প্রীতিভাজনীয়াসু

মিসেস্ সেন, আপনার প্রেরিত কমলালেবু দেখে গুরুদেব যে কী আনন্দ পেয়েছেন সেটা ভাষায় বলতে পারব না। লেবুগুলো দেখেই আমাকে বললেন "বেচারী আমাকে চিঠি লেখে না, পাছে আমার পড়তে বা তার জবাব দিতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমার জন্য সর্ব্বক্ষণ ভাবছে। সত্যি, মৈত্রেয়ীর এই যে শ্রদ্ধা ভক্তি এটা বড়ই touching আমার সেবা ও করে আন্তরিকতার সঙ্গে সে সেবার পিছনে কোনো রকমের বাহবা পাবার উদ্দেশ্য নেই। বেচারী, নানা বিয়ে জড়িয়ে গেছে।" ইত্যাদি।

আজ গুরুদেব সকাল থেকে বেশ সুরের নেশায় (সুরার নয়) ভোর। একটা কবিতায় সুর দিয়ে পরীক্ষা করছেন, ওটা গাওয়া যায় কি না। আজ এরাজ্যের আকাশ মেঘলা, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু পথের ধুলো মারবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

এ ক'দিন আমাদের হৈ চৈ করে কাটল H. E. Tai-Chi-Tao-কে নিয়ে। চমৎকার লোক, চীন দেশের সত্যিকারের culture-এর জ্যান্ত প্রতীক।

আপনাদের উভয়কে প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি। মিঠু কেমন আছে?

আপনার শাশুড়ি ঠাকুরানী কেমন আছেন?

ইতি আপনাদের
শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

এই কমলালেবু সংক্রান্ত আর একখানি চিঠিও উদ্ধৃত করছি। এই চিঠি-গুলি এখানে যে দিচ্ছি, তার কারণ আমার পাঠক পাঠিকারা বুঝতে পারবেন বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের বহু-গুণের মধ্যে মহত্তম গুণ ছিল তিনি মানুষের স্নেহ ভালোবাসাকে এক গভীর মমতায় গ্রহণ করতেন। তাঁকে যেটুকু আমরা দিয়েছি, প্রত্যুত্তরে পেয়েছি অনেক বেশি। নিজেকে অজস্রভাবে দান করার ক্ষমতা দেখি কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে। আবার তেমনি আর এক দিক ব্যক্তিগত জীবনে। রোগে ভুগে ভুগে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়—ত ছাড়া নানান সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কত ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে দেখেছি ছো

বড় অনেক রুগীকে। কিন্তু উনি যতটুকু পান তার জন্য কত কৃতজ্ঞ—এ কোনো তৈরী করা লোকভোলানো কৃতজ্ঞতা নয়—এ এক নিরন্তর উৎসারিত ভালোবাসা যা চারিদিকের মানুষের প্রতি মমতায় আর প্রকৃতির প্রগাঢ় সৌন্দর্য সম্ভোগে—তাঁর চারপাশের মানুষকে আর তাঁর অনাগত পাঠকদের সঙ্গে নিজেকে চির প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছে। মানুষের বন্ধন ক্ষয় হবে সেইজন্যই তা লিখে রাখা।

প্রতিমা দেবীর চিঠি—

শান্তিনিকেতন
১৩ই অগ্রাণ

কল্যাণীয়াসু

দুই বাক্স কমলালেবু পেয়ে বাবামশায় খুব খুশী হয়েছেন। এখন বাবামশায় এখানে এসে ভালো আছেন। তবে নিয়ম মাফিক সেবা সমভাবেই চলেছে। এখন বুড়ি ও বানী এবং মেয়েদের মধ্যে সরোজ স্থরেনবাবু বিশু (নন্দবাবুর ছেলে) পালা করে তাঁর সাহায্য করে। আমি রান্না ও খাওয়ার দিকটা দেখি, রান্না নিজেই করি সকালে—

·· মীরাদি কলকাতায় আছেন। বাবামশায়কে রোজই তোমার কমলালেবুর রস করে দিই। তোমার ফলের বাক্স থেকে একটি পা রাখা চৌকি করে দিতে বলেছেন সেই টুলটি ব্যবহার করবেন। তুমি যে ওঁর সব খবর নিচ্ছ চিঠি লিখেছ সব বলেছি। তোমাকে কলকাতায় এখন বোধ হয় কিছুদিন থাকতে হবে। অবসর হলে এস···

ইতি প্রতিমাদি

এই সময় আমার শশ্রুমাতা দারুণ অসুস্থ হওয়ায় আমি কলকাতায় ছিলাম। প্রতিমাদির চিঠি পেয়ে আর কমলালেবুর বাক্সের টুলের কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। উপহারের উত্তরে কবির কাছ থেকে একটা কবিতা প্রত্যাশা করা যায়, তাও শরীরের এ অবস্থায় অনেকখানি—তারপরে সেই উপহারের বাক্স দিয়ে টুল বানিয়ে তাতে পা রাখবেন এ কি কেউ ভাবতে পারে? টুলের উপর রাখা সেই চরণ দুখানি আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করলাম।

আমি পাঠিয়েছিলুম সামান্য কয়েকটি লেবু, প্রত্যুত্তরে পেলুম এই অসামান্য দান—এই তাঁর এক বিস্ময়কর শক্তি, পৃথিবী তাঁকে যা দেয় তাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে পূর্ণতর মহিমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন। 'আমারে দিয়েছো স্বর'

শান্তিনিকেতন
১৩ই অঘ্রাণ

কল্যাণীয়াসু

দুই বাক্স কমলা পেয়ে বাবা মশায় খুব খুশী হয়েছেন। এখন বাবা মশায় এখানে এসে ভাল আছেন। তবে নিয়ম মাফিক সেবা সমভাবেই চলেছে এখন খুকী ও রানী এবং মেয়েদের মধ্যে আর সত্যেন সুরেনবাবু, কিন্তু; (নন্দবাবুর ছেলে) পালা করে তাঁর সাহায্য করে। আমি রান্না ও খাওয়ার দিকটা দেখি রান্না নিজেই করি সকালে। আজ কাল খাওয়া অনেক উন্নতি হয়েছে। খান ভাল করেই। মীরাদি কলকাতায় আছেন। বাবা মশায়কে রোজই তোমার কমলা লেবুর রস করে দিই। তোমার মালের বাক্স থেকে একটা পা রাখা চৌকী করে দিতে বলেছেন। সেই টুলটা ব্যবহার করবেন। তুমি যে শুরু সব খবর নিয়ে চিঠি লিখেছ সব পড়েছি। এখন জ্বর মাঝে ২ হয় আগে আবার পা. হা. দু. তবে একটা ওষুধ আছে সেটা খেলে জ্বর বন্ধ হয়। ডাক্তার যিনি সঙ্গে আছেন, লোক ভাল। ওদিকেতে খাবার খুব হচ্ছে আবার ডাক্তার রা বলেছেন তবে এখানে আছেন। রাম বাবু মাঝে ২ এসে দেখে যান। মনোমোহন বাবু কেমন আছেন তিনুর খবর কী তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে এখন কিছুদিন থাকতে হবে। অবসর হলে এখানে এস। আশা করি তোমার শাশুড়ি ভালই থাকবেন। রেনুর খবর কী? এখানে এবার বেশ গরম এসেছে, পাহাড়েও শীত কমেছে সেই রকম শীত এখনো পড়েনি। আমরা ভাল।

ইতি প্রতিমাদি

লিখে দিতে তোমায় যে তাঁর কাজের সেবা তুমি [illegible]
করেছ তিনি তাঁর কাজ আর কারো হাতে ছেড়ে দিতে
রাজী নন। তোমার অনেক প্রশংসা করেন। তুমি তাই সত্যি
সবদিক দিয়েই ভাগ্যবতী। তোমার সৌভাগ্য অটুট থাকুক।
মিতু কেমন আছে? আমাদের কথা কিছু বলে কি?
তোমার যে কত আরাম লাগছে তা তাই বেশ বুঝতে
পারছি। এবার সবাই চলে গেলে আমারও সেই দশাই
হবে। আমার গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা
গ্রহণ কর। মিতুকে আমার অনেক আদর জানাচ্ছি।

ইতি
তো: অমিতা

অমিতা ঠাকুরের লেখা পত্রাংশ—জোড়াসাঁকো থেকে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে ১৯৪০

আমি তারও বেশি করি দান আমি গাই গান।'...

কোনো রকমে ব্যবস্থা করে শান্তিনিকেতন পৌঁছলাম—তখন ৭ই পৌষ আসন্ন। উদয়ন গৃহের নীচের তলায় বন্দোবস্ত হয়েছে, বড় ঘরে আছেন। শুনলাম খুব ইচ্ছা উদীচীতে যান কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না।

এবারে কয়েকদিন ওঁর কাছে থাকা ও সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেক পড়া, অনেক গল্প হত। সবচেয়ে যা হত, গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে নানা গান শোনা। উনি ওঁর ভিতরের সুরকারকে জাগাতে চাইছিলেন। একেক দিন কোন সুর মনের মধ্যে আসা যাওয়া করত, ঠিকমত গলায় আনতে পারতেন না। রেকর্ড শুনতেন। একদিন হতাশভাবে চোখ বন্ধ করে বললেন—'অর্জুন আর তার গাণ্ডীব তুলতে পারছে না—'

এই সময়ে একটি সেবিকা রাখা হয়েছিল, তার নাম ভদ্রা।

আগের চেয়ে অনেকটা ভালোই দেখলাম শীতকালে। কিন্তু ওঁর সবচেয়ে যে কষ্ট তা নিঃসঙ্গতা। আমায় মনে পড়ে সাতই পৌষের দিন ভোরবেলা কনার্ক থেকে অনিলবাবু এসে চাতালে দাঁড়ালেন। ওঁকে বলেছিলুম সকালবেলা মন্দিরে যাব ওঁর সঙ্গে। অনিলবাবু তাই এসেছেন। "কী মৈত্রেয়ী দেবী তৈরী হয়েছেন?" আমি কবির মুখের কাছে একটা গ্লাস ধরেছিলাম. উনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে অনিলবাবুর দিকে শঙ্কিত চোখ তুলে প্রায় আর্তস্বরে বললেন, "না না অনিল, তুই ওকে কোথাও নিয়ে যাস নে। আমার কাছে থাকবে কে?" অনিলবাবু অপ্রস্তুতভাবে "না না উনি এখানে থাকুন" বলে দ্রুত চলে গেলেন। আমি মনে করলে আজও সেই মুহূর্তটি, সেই দৃষ্টি দেখতে পাই।

৭ই পৌষ সন্ধ্যার সময় উদয়নের পূবদিকের চাতালে বসে ছিলেন! সেবারে এখানেই বেশি বসতে দেখতুম। সেদিন সুধাকান্ত, আমি ও প্রতিমা দেবী নানা গল্প করছি, এমন সময় অমিয়বাবু এসে যোগ দিলেন—এই বর্ণনা সুধাকান্ত রায়চৌধুরী খুব ভালো করে লিখে নিয়ে প্রবাসীতে প্রকাশ করেছেন। অমিয়বাবু "আনন্দবাজারের" ছেলেদের ডাকাতি এড়াতে পারেন নি। কবি বলছেন, "একবার ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল একটা দোকানে চা খাওয়াবে বলে, ওরা বেশ জানত আমি কিছুই খাই না তাই নিশ্চিন্ত মনে অনেক রকম খাদ্য সাজিয়ে এনে দিলে সামনে। তারপর একেবারে পাঁচ টাকা আদায় করে নিলে। এবারে তো আমি যেতে পারব না. তা আমার বৌমার (প্রতিমা দেবীর) কাছে

আমার পাঁচ টাকা জমা আছে। আমার অভিভাবিকাকে (নন্দিতা) বলব সেই টাকা আনন্দবাজারের দোকানীদের দিয়ে আসবে। বেশ লাগে এদের এইদিনের আনন্দ।"...অমিয়বাবু তখন ইটালিতে জার্মানী মিত্রবেশে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নামিয়েছে, সেই কথা পাড়লেন। যুদ্ধের কথার মত ওঁকে আর কোন কথাই তেমন উত্তেজিত করে না। আর অক্ষম কষ্টে কাতর হয়ে পড়েন। এত অসুস্থ রুগীকে এসব কথা বলে লাভ কি আমি তাই ভাবি, কিন্তু অমিয়বাবু কথা দিয়ে কথা টেনে আনেন অতি সুন্দরভাবে। সেদিন বহু কথা হয়েছিল, তা লেখা আছে। এখানে আমি সামান্য একটু তুলে দিচ্ছি যাতে শারীরিক বিষম দুঃখকর পরিস্থিতি এবং মনুষ্য সমাজের বিবিধ দুষ্কৃতির মধ্যেও তাঁর মনের অনির্বাণ আশাবাদের পরিচয় আছে—

"মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মত, কি ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখ। একদিকে এই অমানুষিক অত্যাচার কিন্তু এরই পাশাপাশি দেখ একদল মানুষ এই সব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে।...এই যে তোমার মনে বাজছে, আমার মনে বাজছে, আরো কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে এর কারণ কি? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই। তোমরা এটাকে স্পেকুলেশন বলতে চাও বল। আমার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে টের পাই—এক বিরাট মানব সত্তা আছে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জুড়ে যে সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা। আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সেই বিরাট মানুষ সত্তার তপস্যার যে একটি বেদনা আছে তার প্রতিক্রিয়া চলেছে। তার কারণ, সেই তপস্যার মধ্যে রয়েছে ভালোর পরম পরিণতি। সে তপস্যার মধ্যে চলেছে মনুষ্যত্বের একটা পূর্ণতার আয়োজন। সে আয়োজনের উদ্দেশ্য অশান্তির মধ্যে শান্তিকে শিবকে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।..."

শান্তিনিকেতনে আমি থাকতে থাকতে আর এক বাক্স কমলালেবু মংপু থেকে মনোমোহন পাঠিয়ে দিলেন। কমলালেবু শেষ হয়ে এসেছিল। বিকেল বেলা ঘরে ঢুকে দেখি দুজন ভৃত্য মিলে প্যাকিংকেস থেকে কমলালেবু ডালায় ডালায় ভাগ করছে ওঁরই নির্দেশ মত। আমায় দেখে বেশ অপ্রস্তুত—"দেখো মনোমোহন আবার কমলা পাঠিয়েছেন, তা তুমি কিছু মনে কোরো না, এত লেবু তো আমি খেতে পারব না, তাই বোর্ডিং-এর ছেলেদের কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওরা আনন্দ করে খাবে।"

আমি হাসছি, "আমি কেন দুঃখিত হব, এ ত আপনারই সেবা হল।" সেই থেকে উনি চলে যাবার পরও যতদিন মংপু ছিলাম—পাঠভবনের ছেলেদের জন্য

শীতকালে লেবু পাঠিয়েছি। তারা হয়ত জানতো কে পাঠিয়েছে, জানত না কেন পাঠিয়েছে।

কবি বললেন, ঘুম ভেঙেই দেখি এতো কমলালেবু। তুমি এখানে, ভাবছি কে পাঠালো। শেষে দেখি এম্‌ সেন পাঠিয়েছেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে !!

কখন ঘুমিয়েছিনু
জেগে উঠে দেখিলাম
কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে
কল্পনায় ডানা মেলে
অনুমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি নাই জানি
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।

এই যে শেষ লাইনটি "এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি"...এটির ব্যঞ্জনা বড় খাঁটি—তখন যেন ব্যক্তিবিশেষ এক হয়ে গেছে নামশূন্য শুধু ভাবের প্রতীক। যাদের স্নেহ করেন তারা যে কেউ চলে যাবে শুনলে মন কষ্টে ভরে যায়, চোখে জল আসে। যাকে কখনো কোনো বঞ্চনাতেই এতটুকু কাতর হতে দেখি নি, আজ আমাদের জন্ত এই তাঁর কাতরতা আমাকে ভারি বাজত। আমরা কে, আমরা কী তাঁকে দিতে পারি, কিছুই না!

গহন রজনী মাঝে
ক্লেশীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন

আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে—
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তারপরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
১২।১১।৪০ রাত্রি দুইটা

এই সময় আমার চোখে একটা অসুখ করেছিল, তার নাম শুনলুম spring catarrh—কষ্টকর অসুখ—এই নিয়ে তাঁর ভারি ভাবনা চিন্তা। বড় বড় ডাক্তাররা আসতেন কলকাতা থেকে, তাদের আগে আমার চোখ দেখতে হবে। আমি ভারি অপ্রস্তুত বোধ করতাম

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্নেহরসটুকু একেবারে পুরোপুরি নিংড়ে নিতে হলে অসুখ করলে ভারি সুবিধা হয়। অনেকে সে সুবিধা পূর্ণমাত্রায় আদায় করেছেন। কেউ বা সত্য অসুখে, কেউ বা ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। আমার আবার বড় একটা অসুখ করেই না। তা এবার একেবারে চোখে। ডাক্তাররা কবিকে বুঝিয়ে বললেন, এই অসুখটা 'হে ফিভারের' মত কোনো ফুলের রেণু লেগে হয়েছে। এই সময়টা কেটে গেলে সেরে যাবে, আবার প্রতি বছর হবে। ফুলের রেণু লেগে চোখের অসুখ শুনে কবি সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন, এই সুকুমারীকে দেখ, পুষ্পশরে আহত!

পৌষের শেষে মংপু ফিরব, জন্মদিনের আগে আগে আবার আসব এই রকম কথা রইল। আসবার সময় আবার সেই একই অবস্থা, নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে আসতে হয়।

কিছুদিন ধরে মংপুতে আমার কন্যার শিক্ষা ও আমার সঙ্গিনী হিসাবে কাউকে পাঠাবার জন্য কবি ব্যস্ত হয়েছেন। সুযোগও হল। মিস এলেন একজন কোয়েকার মহিলা ইংরেজ। দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশে অনেক কাজ করেছেন। মিস্ সাইকস্ তাঁকে এনেছিলেন কবির দেখাশোনা করার জন্য কিন্তু

তিনি বৃদ্ধা এবং প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। কবির ওসব "বিজাতীয়" সেবাও পছন্দ নয়—সেবক সেবিকাদের সঙ্গে কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা না হলে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। সেই মিস্ এলেনকে তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং সর্বদা খোঁজখবর নিতেন তাঁকে দিয়ে কতটা কি সুবিধা হল।

সেবার পুরো ভার বুড়ি নিয়েছে বটে তবে সবটা তার করে ওঠা মুশকিল। দিনের পর দিন বলেই আরো মুশকিল। দাদামশায়ের নয়নের মণি দিদিমণি কত নামে ডাকেন। বেঁটে ছাতাউলি, চড়ুই পাখি ইত্যাদি। কিন্তু খুঁটিনাটি নিয়ে লেগেও যায়— এক একদিন কথায় কথায় এমন হয় যে উনি খাব না বলে মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন বুড়িও গট্‌গট্ করে চলে যায়। আবার তখনই দাদামশায়ের চোখে জল—বেঁটে ছাতাওয়ালীকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তো সামান্য, প্রতিমাদিও তখন সাহস পান না তাকে ডাকতে। আসল কথা কি, বুড়ির কাছে তো তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, তার নিজের দাদামশায়! তাই যখন রাগ হয় দাদামশায় দিব্যি বলেন, "আমার রক্ত তোমার শরীরে আছে, নৈলে তুমি এত নিষ্ঠুর হবে কেন!"

মংপুতে যখন কবি ছিলেন তখন সে হয়ত আমাদের মতো 'নকল' নাতনীদের কথা কিছু লিখে থাকবে, তার উত্তরে কবি লেখেন—

"নকল নাৎনিরা যদি আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় সেটাতে তাদেরি রুচি প্রকাশ পায়। তারা নকল হতে পারে কিন্তু খাঁটি জিনিসের আদর তারা বোঝে আর আসল নাৎনিরা এত বেশি নিশ্চিত, স্বত্বের দাবী নিয়ে নিশ্চিন্ত যে উদাসীন বললেই হয়—" (চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড)।

দাদামশায়ের সঙ্গে নাতনী কেনই বা মহামানবের মতো ব্যবহার করবে।

যাক্, প্রতিমাদি কেবল বলছেন বুড়ির ভার লাঘব করা চাই। আমার কাছে মিস এলেন গেছেন। তাদেরই সংঘের একজন মহিলা ইটারসি হাসপাতালে অনেকদিন নার্সের কাজ করেছেন। তার নাম বারবারা হার্টল্যাণ্ড। এ বাড়িতে নাম হয়েছিল বাসন্তী। তাঁকে রাখা হল, কিন্তু তিনি বুড়ির (নন্দিতা) ভার বিশেষ লাঘব করতে পারেন নি। দাদামশায় ও নাতনী কারোরই তাঁকে তেমন পছন্দ হয় নি।

আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া ছিলেন নার্সিং-এ পটু। এ সম্বন্ধে বেশ কিছু শিক্ষা ও দক্ষতা তাঁর ছিল। আমি কবিকে তাঁর কথা বলতে তিনি খুবই উৎসাহিত হলেন, প্রতিমা দেবীও। তাঁর নাম শঙ্করী। তাঁর পিতাও কবিরাজ। আমি অনেকদিন থেকে মনে মনে মতলব আঁটছি কবিরাজি চিকিৎসা করাব কিন্তু

সে সব ওষুধ অনুপান ইত্যাদি যাঁরা কাছে আছেন এঁরা পারবেন কিনা সন্দেহ। আমার সাতপুরুষ কবিরাজ, কবিরাজিতে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা। এখন যেমন এ বিদ্যা লুপ্তপ্রায় তখন তা নয়—তখন দিক্‌পাল কবিরাজরা অনেকেই জীবিত। কিন্তু আমি নিতান্ত পর এবং নকল। আসলদের দিয়ে এ কাজ করাই কি করে।

যা হোক শঙ্করী নার্সিং করতে এলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মংপু যেতে পারি। কবিও খুব রাজী—তোমার পছন্দ মতো লোক এনে দাও।

আজ বহুদিন পর সেই মেয়ে যে আজ আমারই মতো বৃদ্ধা, সেই সময়কার চিঠিপত্র আমায় দিয়ে গেল।

ডিসেম্বরের শেষে আমি তাকে লিখছি—

ভাই শঙ্করী

…আমি তোকে একটা দরকারে লিখছি, কাগজে দেখেছিস নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, তাঁর ওখানে তাঁর সেবার জন্য একটি মেয়ে তাঁরা চান। ঠিক দস্তুরমত নার্স বা ইয়োরোপীয়ান নার্স তিনি পছন্দ করেন না। তিনি চান একটি ঘরের মেয়ে যে সত্যি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে। আমার তোর কথা মনে হল। ওঁর কাছে থাকতে পাওয়া একটা পরম সৌভাগ্য। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না রে সেজন্য সর্বদা কষ্ট পাই…ভয় পাস না, সে বাড়িতে সকলের ব্যবহার এত চমৎকার তা না দেখলে বুঝবি না।

……২৮শে ডিসেম্বর

ভাই শঙ্করী

…তুই কিছু ভাবিস না, তোকে বেশি কিছুই খাটতে হবে না তিন জন ভৃত্য তোর কাছে সর্বদা থাকবে আরও দুজন ভদ্রলোক পালা করে সাহায্য করবেন তাঁরা সকলেই খুব ভালো লোক। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে আরামে থাকবি শুধু ওঁর কাছে থেকে ওঁকে বুঝতেই দিবি না যে বাইরের কেউ, ঘরের মেয়ের মত থাকবি। রাতে মাঝে মাঝে উঠতে হবে, কিন্তু জাগতে হবে তাও দু ঘণ্টা পালা করে। …দূর থেকে বোঝান যায় না গেলেই সব বুঝতে পারবি।…কত যে ভালো লাগবে শঙ্করী তা বলতে পারি না, একটু করলে উনি দশবার তা বলেন, কাউকে কোনো দিন এতটুকু দুঃখ দেন না! আমিও তো অনেকদিন করলাম—আমি তাঁদের লিখেছি যে তোকে আমি অনেকদিন ভালো মত জানি।…

এরপর সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে তার চিঠিপত্র চলতে লাগল। ৩।১।৪১ তারিখে

সুধাকান্তবাবু লিখলেন বেতনাদি সম্বন্ধে জানিয়ে। আবার ৭।১।৪১ তারিখে তাড়া দিয়ে লিখলেন, "পুনরায় জানাইতেছি বিশেষ অসুবিধা না হইলে অবিলম্বে আপনি চলিয়া আসিলে পূজনীয় গুরুদেব খুশী হইবেন। বেতনাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী যে রকম আভাস নির্দেশ দিয়াছেন সেই অনুপাতেই পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

গুরুদেবের সেবায় আপনার সুবিধা অসুবিধা এবং আপনার সেবায় তাঁহার সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া লইতে নিশ্চয়ই বেশী সময় লাগিবে না। আপনি আসিবেন জানিয়া গুরুদেব খুশী হইয়াছেন।·· "

আবার ৯।১।৪১ তারিখে পথের নির্দেশ দিয়ে সুধাকান্তবাবু লিখছেন—"আপনি শীঘ্রই আসিতেছেন জানিয়া পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সুখী হইয়াছেন।" আমি বুঝতে পারছি কবি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন আর একজন সেবিকার জন্য।

মংপুতে আমিও তাঁর স্বহস্তে লেখা চিঠি পেলাম।

আমার কাছে ৯।১।৪১ তারিখে সুধাকান্তের ঐ সেবিকা সংক্রান্ত চিঠি এল। আর তার সঙ্গে এল কবির একখানি স্বহস্তে লেখা কবিতা। অনেকদিন পর এত নিখুঁত হাতের লেখায় এতবড় একখানি চিঠি বা কবিতা পেলাম।

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে
খেয়াতরী অপেক্ষায় বিদায়ের ঘাটে আছি বসে—
নিজের যে দেহটারে নিঃসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেরেই করে পরিহাস।
সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়
আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয়।
সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা
যারা পাশে দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে
নাম নাই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।
তাহারা দিয়েছে মোর সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়
ভুলায়ে রাখিছে তারা দুর্বল প্রাণের পরাজয়।
এ কথা স্বীকার তারা করে
খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সুযোগ্যের সক্ষমের তরে;
তাহারাই করিছে প্রমাণ
অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই দান

সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতিরে খাজনা দিতে হয়
কিছু সে সহে না অপচয়।
সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্যে প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিত্রা সেই যে মেয়েটির খবর দিয়েছিলে তারপরে আর তো কিছু শুনলুম না। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। বুড়ি বেচারিকে নিরন্তর শুশ্রূষায় ক্লান্ত করে দিয়ে মন খারাপ হয়ে আছে। তার ভার লাঘবের যদি কোনো আশা থাকে জানিয়ো। কোথায় আছ ঠিক জানিনে। নিশ্চয় ভালো আছ। আমার উত্থান পতন চলছে। আশীর্বাদ।

তারিখ জানিনে রবীন্দ্রনাথ
শান্তিনিকেতন

তারপরেই চিঠি এলো—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিত্রা, শঙ্করীদেবী জ্বরে সর্দিতে কাশীতে অভিভূত তাই আসতে পারবেন না। আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কেন না আমার সেবার লোক বেড়ে গেছে। এর উপর বাইরের লোক এলে অসুবিধা হবে। ইতিপূর্বেই ভাবছিলুম কি করে তাঁকে নিরস্ত করা যায়। আশা করি সে প্রশ্নের সমাপ্তি হোলো। তাঁকে জানিয়ে দিয়ো যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন ঘটে তবে তোমাকে পত্র লিখে তাঁকে জানিয়ে দেব। শরীর প্রকৃতিস্থ হতে বিলম্ব করবে বলেই বোধ হচ্ছে। অনিবার্যকে উদাসীনভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তোমরা দোঁহে আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি মাঘ ১৩৪৭
শান্তিনিকেতন

শঙ্করীকে আমার মা লিখেছিলেন, একাজ যদি করতে পার তোমার সারা জীবনের পাথেয় হবে, মহাসৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু সকলের তো সৌভাগ্য নেই—ওর অদৃষ্টে ছিল না। এদিকে কবিও মত বদলালেন। মত উনি সর্বদাই বদলান তবে এক্ষেত্রে অন্য কি কারণ ছিল জানি না।

আমি ডিসেম্বরে চলে আসবার সময় আমাকে চামড়ার বাক্সে অনেকগুলি সই করা বই আমার স্বামীর জন্য দিলেন। এই রকম উপহার সমস্ত ডাক্তারদের পাঠানো হল। আমার স্বামীও ডাক্তার বটে, তবে চিকিৎসক নন। কি গুণে তিনি পেলেন তা সঙ্গের চিঠিতে আছে—

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয় মনোমোহন

বাক্সবন্দী করে তোমাকে কয়েকটি বই পাঠাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু কিছু আছে যার ছন্দে মংপুর স্মৃতি বিজড়িত। তোমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নীরব সৌজন্যে আমি মুগ্ধ।

এই উপহারটি তারই সামান্য নিদর্শন

ইতি ৭ই পৌষ ১৩৪৭
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার স্বামীকে কবি সর্বদাই Perfect gentleman বলতেন। এই সেদিন ক্ষিতীশ রায় আমাকে লিখেছেন, রথীন্দ্রনাথ বলতেন Nature's own gentleman. আমার মনে হয় পুত্রের বিশেষণটিই বেশি ঠিক। তাঁর Gentle-manliness-টা ছিল স্বভাবজ—cultivated নয়।

মংপু ফিরেই এই চিঠি পেলাম—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাকে হতাশ্বাসভাবে চিঠি লিখেছি আজ বৌমার কাছ থেকে যথা-সম্ভব খবর পেয়েছি—অতএব সে চিঠি ক্যানসেল্ড। তোমারও অনেক খবর পাওয়া গেল—সব কথা আলোচনা করবার মত শক্তি নেই। অতএব চুপ করলুম। আমার ভ্রমণ এক ঘর থেকে আর এক ঘরে। এবং ঘর থেকে বারান্দায় সারাদিন কেদারাটাতে বসে তোমাদের সচলতাকে ঈর্ষা করি। বড় ঘর থেকে এসেছি কাঁচের ঘরে। বসে আছি নির্জনে। জানলার ভিতর দিয়ে আলো আসচে—দুর্দিনগ্রস্ত রোগীর পক্ষে সে একটা পরম লাভ। জীবনের

মহাদেশ থেকে আমাকে দ্বীপান্তরে চালান করা হয়েছে—একলা ঘোর একলা!

চললুম, সেলাম। ইতি ৭।১।৪১

তোমাদের নির্বাসিত

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিত্রা তিন সঙ্গী তোমাকে পাঠাবার জন্যে কলকাতার আপিসে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বোধ করি ঐ বইটার মধ্যে কুৎসিত কথা কিছু আছে মনে করে ভদ্রমহিলাকে না দিয়ে ওরা ভদ্রতা রক্ষা করেছে। আমার হাতের কাছে যে বইখানা ছিল পাঠিয়ে দিলুম। মনের মধ্যে ক্ষমাগুণ রক্ষা করে পোড়ো।

১১।১।৪১

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ

'কুৎসিত' অর্থাৎ ল্যাবরেটরি গল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

মংপুর কথা ওঁর সর্বদা মনে পড়ত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মংপুতে থাকতে যদিও মাঝে মাঝে নির্জনতা ও প্যাচপ্যাচে বৃষ্টিতে হাঁপিয়ে উঠতেন, কিন্তু দূরে গিয়ে তার আনন্দটাই যেন বড় হয়ে উঠেছিল। আমাকে বার বার বলতেন আর যাওয়া হবে না। দিনের পর দিন যাবে, কত লোক তোমার ঘরে অতিথি হবে কিন্তু রবি ঠাকুর আর নয়।

আবার ফিরবেন মনে করে চতুর্থবার মংপুতে দু বাক্স কাপড় রেখে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে তা থেকে ২।১ খানা কালিম্পঙে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রথীদা বলে বলে সেই বাক্স আনিয়ে নিলেন। তখন ছেলেমানুষ এবং ভীতু বলেই সেগুলো ফেরত দিলুম। যখন বাক্সগুলো এসে পৌঁছাল কবি খুব দুঃখিত হলেন। বিমর্ষ মুখে বললেন, আমি এক মনে করে রেখে এলুম, তুমি আর এক মনে করে ফিরিয়ে দিলে! অর্থাৎ তাঁর আর যাওয়া হবে না। সেদিন বড় কষ্ট পেয়েছিলুম।

ফেব্রুয়ারীতে কবিতায় একটি চিঠি পেলুম। কবিতার উপরে 'মিত্রা' সম্বোধন ও নীচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সই নিজের হাতে। কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি সম্ভবত রানী চন্দের হাতের লেখা। কবিতাটি নানা জায়গায় ছাপা হয়েছে, তবু সঙ্গতি রাখার জন্য এখানেও তুলে দিলাম—

মিত্রা,

মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটীর,
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে,
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয় ঘোষণার কালে
অন্তরে আসিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্য স্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম না জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্র হিম রেখাঙ্কিত মহা নিরুদ্দেশে
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।
গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে।
পার্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে
রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে
আতিথ্যের সখ্য জাগে

ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানা রঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগ যুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা

উদয়ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, বিকাল

কবিতায় এই চিঠি পেয়ে আমার মনে হল ওঁর অসুখ বোধ হয় একেবারে সেরে গেছে। এত পরিষ্কারভাবে প্রত্যেকটি কথা মনে পড়া তো সহজ নয়। ক্যাক্টরিতে যখন ঘণ্টা বাজত তখন জিজ্ঞাসা করতেন, ঘণ্টা এখন কি বলল—এসো না যাও? সিঁড়ির উপর ফুলের টবের কথা লিখেছেন। ছিল জিরেনিয়াম, ফুসিয়া, ডবল পিটুনিয়া, রোজ একবার করে নাম বলতে হত। জিরেনিয়ামের পাতা ভেঙে দিলে কাঁচা আমের গন্ধে অবাক হয়ে যেতেন। এই কবিতায় সেই ফুলের টবের কথা আছে, আর আছে আমার অপার সৌভাগ্যের ইতিহাস।

এর পরের চিঠি রানীর হাতের লেখায় এবং সই অত্যন্ত কম্পিত। যেদিন শরীর খারাপ থাকত সেদিন এই অবস্থা। নিজের হস্তাক্ষর দেখে নিজেই কাতর হতেন—

শান্তিনিকেতন
৩০।৩।৪১

ওঁ

মিত্রা

এতদিনে আমার বই পেয়ে থাকবে। গিরি লঙ্ঘন করতে পঙ্গুর বিলম্ব হয় আর হিমাচলের কাছে তার মুখ ফুটতে চায় না। আমরা নিম্নভূমিবাসী 'প্রাংশু লভ্য' ফলের আশা সত্বর সফল হয় না, বিশেষত যখন তার দক্ষিণ হস্ত থাকে রোগের আঘাতে আড়ষ্ট। আমার অবস্থা এর থেকেই বুঝতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁদের জন্য লিখছি, কালিদাসের রঘুবংশ থেকে এই বাক্যটি নেওয়া—শ্লোকটি এই রকম: 'প্রাংশুলভ্যে ফলে যথা লোভদুদ্বাহুরিব

বামনঃ। অর্থঃ উঁচু ডালে যে ফল আছে, যা লম্বা মানুষের যোগ্য, বামন যদি তাতে লোভে হাত বাড়ায় তবে যে রকম (হাস্যাস্পদ) হয়, তাৎপর্য এখানে এই যে তুমি হিমাচলের উচ্চে আছ আমরা নিম্নভূমিবাসী—তোমাকে নিয়ে আনব কি করে?

এই চিঠি পেয়ে বুঝলাম, কতটা চাইছেন যে আমি এখন নিম্নভূমিতে নেমে যাই তাই এপ্রিলের প্রথমেই শান্তিনিকেতন এলাম আবার। আমার পাহাড় থেকে নামা ওঠা দৌড়াদৌড়ি চলেছেই। তখন আমার সংসারযাত্রার নানা প্রয়োজনে বারে বারে চলে আসতে হয়, সেই প্রয়োজনগুলো আজ এত নিরর্থক হয়ে গেছে যে সেগুলো কি তা মনেও পড়ে না এবং মনে পড়বার দরকারও দেখি না।

খুব গরম পড়েছিল সেবার। গরমে আবার শরীর খারাপ হচ্ছিল। আমি যে কদিন ছিলাম,রাত্রের ভার নিয়েছিলাম। সঙ্গে অবশ্য পুরুষ একজন কেউ থাকত।

এইবার সৌম্যেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি। একদিন দুপুরে আমি কবির ঘরে বসে মীরাদির কতকগুলো আচারের রেসিপি লিখছি। সৌম্যেন ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। দীর্ঘ দেহ, লম্বা চাদর গলায় ঝোলান—সুপুরুষ। ইনি তো তখন আমাদের কাছে লেজেণ্ড। জার্মানীতে জেল খেটেছেন। কবি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। 'রবিদা রবিদা' করে ডাকতে চোখ খুললেন—কে সৌম্য? এখন যাচ্ছো নাকি!—সৌম্য বললেন, রবিদা, তুমি যন্ত্রের বন্দনা করেছ—'নমো যন্ত্র' 'নমো যন্ত্র' লিখেছ, এবার মানুষের বন্দনা কর। মানুষের জয়গান গাও।

আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেছি। এ ব্যক্তি বলে কি? ইনি সারা জীবন মানুষের জয়গানই তো গাইলেন। যাই হোক পরদিন সকালে আমাকে কাগজ কলম আনতে বললেন ও আমাকে dictate করলেন সেই আশ্চর্য গানটি —ঐ মহামানব আসে। ১লা বৈশাখ কবির জন্মোৎসবের দিন। 'সভ্যতার সংকট' পড়া হবে, তারপরে গাওয়া হবে এই গানটি।

শান্তিদেবকে ডেকে আনা হল সন্ধ্যায়। তারপর তাঁর সঙ্গে গলা রেখে সুর সংযোজনা করলেন। শরীরের ঐ অবস্থায় কি রকম অনায়াসে এই সুর সৃষ্টি হল দেখে বিস্মিত হলাম। গানটান শিখিয়ে তারপর বলছেন, আমার জন্মদিনের উৎসবে গানটা গাওয়া হবে, তারপর এই বোকার দেশে সকলে বলবে না তো যে নিজেকেই মহামানব বলেছে।

প্রতিমাদি ১লা বৈশাখ ভাল খাবারের আয়োজন করেছিলেন। কবি ভালো-বাসতেন তপসে মাছ। অনেকবার বলতেন তপসে মাছ বেশ শুদ্ধ আর ইলিশ

মাছটা বড্ড মেছো। কলকাতা থেকে খুব বড বড় তপসে মাছ এসেছিল। কিন্তু রান্না করে যখন ডাক্তারকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হল ডাক্তার মুখে দিয়ে বললেন, খারাপ হয় নি, তবে একেবারে টাটকাও নয়। ওঁকে দেওয়া চলবে না। শেষে রথীদা ও আমাকে সেই মাছ দিলেন প্রতিমাদি। বললেন, 'তোমরা খাও, তোমাদের ভালোবাসেন, তোমরা খেলেই তৃপ্তি পাবেন।'

জন্মোৎসবের দিন আমাকে সুরুলের তৈরী অপরূপ সুন্দর একটি শতরঞ্চি উপহার দিয়েছিলেন প্রতিমাদি, আর আমার সঙ্গে সেবার মাসীও এসেছিল, তাকে একটা Pottery-র ফুলদানী। মাসী লজ্জিত হয়ে বলছে, আমাকে আবার কেন! ওকে দিচ্ছেন বলেই আমাকে দিতে হবে, এর কোনো কারণ নেই। প্রতিমাদি বললেন, কেন তোমাকে দেব না বল? তোমার কি সৌভাগ্য কম, বাবামশায় তোমাকে 'মাসী' বলেছেন!

'সভ্যতার সংকট' পড়া হল উদয়নের প্রাঙ্গনে শামিয়ানা টাঙিয়ে—এই আশ্চয রচনা ঐ শরীরে লিখেছিলেন এবং ইচ্ছেও ছিল পড়বার, তা সম্ভব হল না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী পাঠ করলেন।

'সভ্যতার সংকট'-এ যে উদাত্ত ধ্বনি বেজেছিল তাতে সমস্ত দেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। শুনতে শুনতে আমার মনে পডছিল সেই অল্প বয়সের সদর স্ট্রীটের উপলব্ধি—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

সেই গীতধ্বনিই যেন উদার সুরে ক্রমবর্ধমান হয়ে এঁর সারা জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে! আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের দেশের কথা ভাবছেন না, ভাবছেন সমগ্র মানবজাতির কথা।

চীন, জাপান, পার্শিয়া, আফগানিস্তান, স্পেন, সোভিয়েট রাশিয়া সব দেশের কথা মনে পড়ছে তাঁর। ভাবছেন সমগ্র মানবজাতি কোন পরিণামের দিকে চলেছে তার কথা। চীনের সঙ্গে সহানুভূতি ও মিত্রতা অনেকখানি অগ্রসর হলেও সেখান থেকে কম আঘাতও পান নি একদিন, কিন্তু আজ যাবার সময় মনে ভেসে আসছে কেবল সেই পরম মানব সত্য—যা প্রকাশ পায় মানুষের ভালোবাসায়। তাই শেষ শয্যায় শুয়ে মনে পড়ছে চীন দেশের প্রীতি।

> জন্মবাসরের ঘাটে
> নানা তীর্থে পুণ্য তীর্থবারি
> করিয়াছি আহরণ।

একথা বহিল মোর মনে
একদা গিয়েছি চীনদেশে
অচেনা যাহাবা ললাটে দিয়েছে চিহ্ন
তুমি আমাদের চেনা বলে
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পবের ছদ্মবেশ
দেখা দিয়েছিল তাই
অন্তবেব নিত্য যে মানুষ
অভাবিত পবিচয়ে।

জীবনেব মধ্যাহ্নকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এশিয়া থেকেই এক অধ্যাত্মবাদী সভ্যতাব উদয় হবে। জড়বাদী বণিকবৃত্ত সভ্যতাব অধিকাব থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে নূতন সভ্যতা, যা লোভের চক্রে ঘূর্ণ্যমান নয়। কিন্তু আজ শেষ সময়ে ভয়ানক নবঘাতী যুদ্ধের হুংকাবে ও এশিয়ার অগ্রসর দেশ জাপানের অত্যাচারীর ভূমিকায় মর্মাহত চীনেব উপব তাব নিষ্ঠুব আক্রমণে পবিতপ্ত হলেও মানুষেব উপব বিশ্বাস বাখতে পেবেছেন এবং সেই চিরদিনেব আশীবাদ নিয়ে তখনও মনে কবছেন, "আশা কবব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যেব মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসেব একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়েব দিগন্ত থেকে।"

এই সময়ে অর্থাৎ জন্মদিনেব কাছাকাছি সময়টাতে কবি ক্রমাগত আলোচনা কবতেন ইযোরোপের দিনগুলিব। সমস্ত বিশ্ব যে তাঁর মনে তখন ঘনীভূত তা বোঝা যায় 'সভ্যতাব সংকট' বচনায়। বামানন্দবাবুর কাছে লেখা ওঁব কতগুলি চিঠি তখন ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। একদিন আমাকে বললেন, 'কাগজ কলম নিয়ে বসো, বামানন্দবাবুকে একখানা চিঠি লেখ।' আমি শান্তি-নিকেতন পৌঁছবার পূর্বে অর্থাৎ ২৯।৩।৪১ একখানা এবং তারপব আব একখানা চিঠি লেখেন, তাতে এই একই কথা ছিল যে যুরোপেব সেই উজ্জ্বল দিনগুলির কোনো স্থায়ী ইতিহাস রইল না। এই চিঠি প্রকাশ হলে প্রশান্তচন্দ্র অভিযোগ করে বথীন্দ্রনাথকে লেখেন। বথীন্দ্রনাথ তার উত্তরে যা লেখেন তাব মর্মার্থ এই যে, 'বাবাব correspondence দেখে দেওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়। উনি নিজে যে সব চিঠি লেখেন বা dictate করেন সেগুলো তখুনি পোস্ট করার জন্য এত impatient হয়ে ওঠেন যে ধরে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আজকাল বেশী রকম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। safe guard-এর ব্যবস্থার দিক থেকে যতই কিছু করি ওঁর জন্য কোনোটা টিঁকে না।'

আমার পাঠকদের জন্য যে-চিঠি নিয়ে এই আলোচনা সেই চিঠি দুটি পূর্ণ তুলে দিচ্ছি— সেটি কি কোনো অসহিষ্ণু লোকের অস্বাভাবিক অবস্থার পরিণতি কিংবা আশ্চর্য বৈদগ্ধ ও চিন্তার প্রকাশ তা বুঝে দেখবেন। এবং তাঁর হয়ে এই চিঠি লিখে দিয়ে আমিই বা কি অন্যায় করেছি তাও বুঝবেন।

প্রবাসী ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ওঁ

২৩শে চৈত্র, ১৩৪৭

প্রিয়বরেষু,

একদা য়ুরোপ থেকে আপনাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলাম সে সম্বন্ধে সেদিনকার চিঠিতে আমার মন্তব্য কিছু বলেছি, সেটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে না বললে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে। সেই একটি সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত জন-মনে আমাকে উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়, বোধ হয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতী পুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তখনকার মহাযুদ্ধের পরবর্তী য়ুরোপে মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের এই কবির অভ্যর্থনার ভূমিকা ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ যাই হোক ঘটনাটা ছিল অচিন্তনীয় সুতরাং নিজের মুখে তার আভাস মাত্র দেওয়া অত্যন্ত সঙ্কোচজনক। এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। মনে আছে এই সময় কৌতূহলবশত লর্ড সিংহ একবার আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন, জানি তিনি বলেছিলেন যদি তাঁর এ রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না ঘটত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রথীন্দ্রনাথ বার্লিনে আরোগ্যশালায় শয্যাগত ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করবার শুভ অবসর হারিয়ে গেল। আর আমার অন্য স্বদেশ-বাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর কোনো ভারতবাসী এত অন্তরঙ্গভাবে করতে পারে নি। উপযুক্ত সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই বরাবর শোভন মনে করেছি। এই রকম নীরবতার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ সেদিন আমার যাত্রাপথে পদে পদে যে প্রবল উত্তেজনা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে সমগ্র ব্যাপারের একটা স্পষ্ট দৃশ্য দেখতে পাওয়া এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে বলা দুঃসাধ্য ছিল।

আমার জীবনের সেদিনকার এই যে আশ্চর্য ঘটনা সহসা অত্যুজ্জল হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আমি কে? আমিই তো ছিলেম সেই ব্যাপারের উপলক্ষ্য, আমিই তো ছিলেম তার কেন্দ্রস্থলে। এস্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র আভাস আমার তরফ থেকে দেওয়ায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ হবার আশঙ্কা আছে। অতএব একদিন কোন মহালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল। হয়তো তাই থাকাই ভালো। আমি এ সম্বন্ধে কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করতে একান্ত অনিচ্ছা বোধ করি। কেননা সেদিনকার সেই ভ্রমণ ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গ সহায়তা পেয়েছিলুম তাঁদের অক্লান্ত সেবা ও সতর্কতা নিরন্তর না পেলে আমার পক্ষে এক পা চলা অসম্ভব হতো। তাঁদের কাছে থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুশ্রূষা পেয়েছিলুম তা অত্যন্ত মূল্যবান, তাঁরা যদি য়ুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির ছিন্ন চিহ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে না সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি। বস্তুত আমি জানি সেদিনকার সেই খ্যাতির কোনো স্থায়ী মূল্য নেই কারণ সম্পূর্ণ জানার মধ্যে তার মূল ছিল না। এখনি তা অনুজ্জল এবং লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে কিছুদিন পরে তা সুদূর স্মৃতিরূপে হয়তো অস্পষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু যত্ন ও ভালোবাসা সত্যকার জিনিস অন্তরের ভিতর থেকে জীবনকে তা পূর্ণতা দান করে, কোনো কালে তার ক্ষয় নেই। সেদিন য়ুরোপও আমার বাহিরের সংস্রব থেকে জানি না কী কারণে আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছিল সেই অহৈতুক মানবপ্রেম আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বাহিরের কোনো বিস্মৃতি আর তাকে অপহরণ করতে পারবে না। আমার সৌভাগ্য এবং আমার গৌরব এই প্রীতিতেই, খ্যাতিতে কদাচিৎ নয়। সেই জন্য আমার সেই ভ্রমণ ব্যাপারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই দৈনন্দিন সেবার ধারাসূত্র সকলের চেয়ে সত্য হয়ে আমার মনের মধ্যে আজো রয়ে গেছে আর বাকি বাহিরের সমস্ত দান প্রতিদান আমার মন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেজন্য আক্ষেপ না করাই আমি শ্রেয় মনে করি। ঈশোপনিষৎ মানুষকে তার জীবনান্তকালের এই মন্ত্র দিয়েছেন "ওম্ কৃতং স্মর", নিজে যা করেছ তাই স্মরণ কর, আর সমস্ত কথা নিয়ে যেন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে, লোকের মুখের কথা লোকের মুখেই রইল। কিন্তু অন্তরের সম্পদ জীবনের কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার শেষ পুরস্কার অর্পণ করবে সেই পুরস্কারকেই আমি বলি শান্তি।

আমাদের দেশে সামান্য কারণেই লোকে আধ্যাত্মিক শক্তির অতিমানবিক প্রভাব কল্পনা করে থাকেন, আপনি জানেন এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে কোনো ঘোষণা কোনো দিন প্রকাশ পায়নি কারণ আমি তা বিশ্বাস করি না। এ জীবনে যে মূলধনটুকু নিয়ে জনতার হাটে প্রতিপত্তির কারবার করে এসেছি সে আমার কবিত্বশক্তি মাত্র। সেই দান যে আমি ভাগ্যের হাত থেকে গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছিলেম একথা অস্বীকার করলে কিংবা কম করে বললে যে কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করা হবে সেটা মিথ্যে অহংকারের চেয়েও ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু আমার এই কবিত্বের পরিমাণ বা গুণ যতই হোক এবং যাই হোক তা যথার্থভাবে জানবার কোনো সুযোগ য়ুরোপীয়ের ঘটে নি, তাঁরা সেটা হয়তো আন্দাজে ধরে নিয়ে থাকবেন। এই আন্দাজের মধ্যে সহজেই অতিকৃতি এসে পড়ে সুতরাং যে আদর্শে তাঁরা সেদিন আমাকে বিচার করে-ছিলেন সে ছিল তাঁদের নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি তাতে তাঁরা আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন এজন্য নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আপনারা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন এমন কি বিরক্ত হতেও পারেন যে সেদিন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ আমাকে যে সমাদরের আসন দিয়েছিলেন তা তৎপূর্বে আমার দেশে আমার জন্য তেমন প্রশস্তভাবে কখনো পেতে দেওয়া হয় নি।

আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে। খ্যাতি সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রীতির সঙ্গে সেদিন য়ুরোপ আমাকে যে সম্মান দান করেছিলেন তা আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি আজ পর্যন্ত সাদরে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই খ্যাতির স্থায়িত্বের মূল্য সম্বন্ধে আমার কোনো অত্যাশা নেই, অথচ এই প্রীতির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ মাত্র করি নে।

আর বেশি বলবার শক্তি আমার নেই, লোকালয়ের রাস্তা থেকে কিছু খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম কি না যার মূল্য আছে, বলতে পারি নে। কিন্তু মানুষের প্রীতিলাভ করেছি অজস্র এবং যে হেতুক সে প্রীতি অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি এই জন্যে তাকে আমি সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি।

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ

রামানন্দবাবুকে লেখা—

প্রীতিভাজনেষু, Santiniketan

সেদিন আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সে আমার অপটুতাবশত বোধ হয় স্পষ্ট হয় নি এবং সমস্ত চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তার মর্মকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।···সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই ছিল যে একদিন সমস্ত ইয়োরোপের কাছ থেকে আমি যে সম্মান পেয়েছিলুম তা অভাবনীয়, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, সেই জন্য কোনো দিন আমি নিজের মুখে এর কোনো বর্ণনা করি নি। এই ভ্রমণ ব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হতো। আজ পর্যন্ত দেন নি। কিন্তু আমি অনুশোচনা করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি কারণ আমার বয়সে এ অভিজ্ঞতাটুকু পেয়েছি লোকখ্যাতির কোনো স্থায়ী মর্যাদা নাই। অদৃষ্টের একমাত্র মূল্যবান দান ভালবাসা। তা যেহেতুক অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে এই জন্যে বাহির থেকে কাল তাকে অপহরণ করতে পারে না। এই যথার্থ ভালবাসা আমি সমস্ত ইয়োরোপ থেকে এবং আমার ভ্রমণ-সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। এই কৃতজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমার মনে রয়ে গেল। সাধারণভাবে এই কথাটুকু আপনাকে জানাতে চেয়েছিলুম এবং একথা আজ আমি সকলকেই জানাতে পারি।

নিজের অঙ্গুলী চালনা করতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এই জন্য আজ দৈবক্রমে কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীকে নিকটে পেয়ে তাব হাত দিয়ে আমার যা জানাবার কথা আপনাকে জানালুম। নিশ্চয় জানবেন এর মধ্যে আমার কোনোখানে কোনো ক্ষোভ মাত্র নেই। আমি যা পেয়েছি তা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করলুম এবং যা পাইনি তার জন্যে কারু কাছে কোনো নালিশ জানাব না। ইতি ১০ই এপ্রিল ১৯৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীদা বলেছিলেন, গরমের ছুটিতে মংপু যাবেন। কবিও বলতে লাগলেন, তোমরা ওকে নিয়ে যাও, একটু বিশ্রাম হবে। আমার তো আর মংপু যাওয়া হবে না।

৪ঠা জুন প্রতিমাদির চিঠি পেলাম—'ক'দিন বাবামশায়ের অসুখ আবার বেড়েছিল বলে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নি······বাবামশায় এখন দীননাথবাবুর ও মিস্ হার্টল্যাণ্ডের কাজ নিচ্ছেন।'

এপ্রিল মাসে আমি রথীদাকে বলেছিলুম, 'রথীদা কবিরাজি চিকিৎসা করে দেখলে একবার হয়।' শ্যামাদাসবাবু তখন বেশ অসুস্থ নয়তো আমার বাবাকে দিয়ে তাঁকে বলাতুম। রথীদাকে আরো বলেছিলাম, নলিনীরঞ্জন সেনকেও একবার consultation-এ ডাকুন। রথীদা বললেন, বিধান রায় কারো সঙ্গে consultation-এ বসেন না। কবিরাজি চিকিৎসার কথা বলাতেও রথীদা বললেন যে, বিধান রায় সহ্য করবেন না। আমি বললুম, এরকম অসহিষ্ণু হলে কি করে হবে। উনিও তো মাঝে মাঝে শিলং চলে যান—আমরা তো সব রকম করে দেখব। অপারেশনই একমাত্র উপায়, একথা বলে লাভ কি—উনি যখন চান না! কথাটা আধাআধি হয়ে রইল, হ্যাঁ বা না কোনো দিকে গেল না।

প্রতিমাদির চিঠির পরই রথীদার চিঠি এল—"······ইতিমধ্যে শুনলুম, বাবাকে জানিয়েছ যে, তুমি এখানে আসতে পার। বাবা তো সেই থেকে আশার (আসার) পথ চেয়ে আছেন। আমার না যাবার একটা valid কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে কি বল? তাছাড়া শুনতে পাচ্ছি তোমার ওখানে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি আসছেন······কাগজে পড়লুম ex honourable ex minister etc etc will be visiting his friends etc······"

এই সঙ্গেই কবির চিঠি পেলাম। ঠিকানাটা টাইপ করা, চিঠিটা স্বহস্তে লেখা।

ওঁ

মিত্রা

কিছুকাল থেকে নিরতিশয় ক্লান্ত। অনেকদিন তোমাদের কোনো সাড়া না পেয়ে নিজেকে পরিত্যক্ত বোধ করছিলুম এখন তোমরা কাছে এলে আরাম পাব।

রবীন্দ্রনাথ

এই চিঠি পেয়ে ও রথীদা আসছেন না জেনে আমি আবার শান্তিনিকেতন ফিরে এলুম—আমার মন বলছে কবিরাজি চিকিৎসায় নিশ্চয় কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে।

এবারে এসে দেখি কবিকে দোতলার বড় ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। ওখান থেকে জাপানী বাগান দেখা যায়, আকাশ দেখা যায়—পরিবর্তনও দরকার। শুধু চাতালে বসা আর হবে না। সন্ধ্যাবেলা ওকে নিয়ে চাতালে বসতে চিরকালই ভালো লাগে। এইখানে বসে একদিন সন্ধ্যাবেলা বলেছিলেন, "বল এবারকার বইটার নাম কি রাখব? সেঁজুতির পর কী হবে?" "সেঁজুতি

মানে কি সন্ধ্যাপ্রদীপ? আমার বাবা বলেন, আপনি পূরবী থেকে শেষের গান গাইতে শুরু করেছেন।" "শেষের গান তো গাইছি তবে শেষ হচ্ছে কৈ?" আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না সেঁজুতির পরে সঙ্গত কি নাম হবে, তখন উনিই বললেন, আকাশ প্রদীপ। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো যখন শেষ হয়ে গেল, তখন মহাশূন্যে মহাকাশে জাগিয়ে তোলো অনন্ত জ্যোতি—ঘরের থেকে বাইরে যাওয়া।

দুপুরবেলা পৌঁছে অনেকক্ষণ গল্প করলাম, কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে, কতকাল পরে এসেছি। এই তো গত মাসেও এসেছিলাম। আমি কবির ঘরেই ছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় আমাকে কেউ এসে বললে, প্রতিমাদি ডাকছেন। এসেই শুনেছিলাম তাঁর জ্বর। গিয়ে দেখি পুষুর ঘরের বারান্দায় একটা তক্তপোষে শুয়ে আছেন অত্যন্ত দীনভাবে। কথোপকথন কতকটা এইভাবে—"কী হয়েছে প্রতিমাদি?" "গুরুদেব তোমাকে চিনতে পারলেন?" "সে কি কথা প্রতিমাদি, আমাকে চিনতে পারবেন না?" "আমাকে তো পারেন না।" "কী বলছেন আপনি?" দেখি তাঁর চোখে জল। তখন আমার মনে হল সত্যিই কবির কথাগুলি ছিল কিছুটা খাপ্‌ছাড়া। প্রতিমাদি বললেন, সেবার ঘরে এখন আর ওঁর কোনো পাত্তা নেই। উনি তো নিজে হাতে সেবা করতে পারেন না, সে শরীর ওঁর নেই। কিন্তু চিরদিন ধরে কবির আত্মজনের মধ্যে কেউ যদি তাঁকে বুঝে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে থাকে, সে উনি, একমাত্র উনি। সেইজন্য কবি যাদের স্নেহ করেন তাদের প্রতি প্রতিমাদির বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নেই। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমাকে কবি বলছিলেন, পাহাড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কতখানি অসুখ করেছিল ইত্যাদি। সেইদিন প্রতিমাদি সাহস পেলেন, খাবার সময় কবির কাছে সামনে এসে বসলেন এবং কালিমপং থেকে শুরু করে আনুপূর্বিক ঘটনা বলতে লাগলেন সুধাকান্তর সাহায্যে। কে কি বলবে এ দুশ্চিন্তা তখন আর প্রতিমাদির ছিল না, কারণ তিনি নিজের কথা বলছিলেন না, আমার কথা বলছিলেন। কবি খুব লজ্জিত। হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন, বলছেন, 'তাই বল, আমি যে সেই কি বলে না মায়ের কাছে মামাবাড়ির গপ্পো···'

তারপর থেকে প্রতিমাদি প্রতিদিনই আসতেন এবং তখন কবির খুব ছোট গল্প মাথায় আসছিল। শুধু প্লট, কারণ তখন তো গল্প তৈরী করার শক্তি ছিল না, তারই মধ্যে একটা গল্প কল্পিতা দেবীর গল্প।

ওঁকে কেউ বলেছিল, কিছুদিন পূর্বে ঢাকার দাঙ্গায় কোনো হিন্দু মেয়ে অপহৃতা হলে হিন্দু উদ্ধার সমিতি যখন তাকে ফিরিয়ে আনতে চায় সে আসেনি।

আমার যতদূর মনে হয় এ কাহিনী তিনি সংজ্ঞা দেবীর কাছে শুনেছিলেন। এমনি আরো নানা গল্পের প্লট মাথায় আসত—প্রতিমা দেবী যে কখনো গল্প লেখেন তা জানতাম না। তবে একটা ঘটনা নিয়ে গদ্য কবিতার মত করে গল্প লিখেছিলেন মংপুতে থাকাকালে। তারপর সেটা কবির হাতে পড়ে সম্পূর্ণ সংশোধিত হয়ে যায়। ওটা আর প্রতিমাদির লেখা বলা চলে না।

এই সময়ে আমি রথীন্দ্রনাথকে জোর করে বললাম যে কবিরাজি চিকিৎসা করাতেই হবে। কিন্তু বিধান রায়কে রাজী করাবে কে? কবির খুব মনঃপুত হয়েছে কবিরাজি চিকিৎসার কথা। শ্রুতকীর্তি শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র বিমলানন্দ তর্কতীর্থর সঙ্গে বাবার কথা হয়েছে, তিনি আসবেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রতিমাদি আমাকে ডেকে পাঠালেন, সেদিনও অন্ধকারে খুব মন খারাপ করে শুয়েছিলেন। বললেন, "মৈত্রেয়ী, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। বাবামশায়কে অপারেশনে মত করাতে হবে। উনি বলছেন, ডাক্তাররা বলছেন, এছাড়া আর উপায় নেই। আর মৈত্রেয়ী উনি (রথীন্দ্রনাথ) আরো বলছেন, তোমরা কোথায় বাবাকে মত করাবে তা নয়, তোমরাও ওঁর কথায় সায় দিচ্ছ!" আমি বললাম, 'আপনার কী মত?' প্রতিমাদি বললেন, আমি কি বলব বল?' আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম, তাহলে রথীদা এই অভিযোগ করেছেন। তা আমি কি করব? যখনই কবির কাছে বসি, উনি জিজ্ঞাসা করেন, "অপারেশনের কথা কি শুনছ? দেখ, এ আমি একেবারে চাই না। এসেছিলাম গোটা মানুষ যাবার সময় কি ছেঁড়া খোঁড়া হয়ে যাব!" আবার কখনো বলেন, "যে নিয়মে ঝরে পড়ে শুকনো পাতা, পরিপক্ক ফল, সেই নিয়মেই আমি জীবনের বৃন্ত থেকে খসে যেতে চাই। টানা হেঁচড়া করে লাভ কি?" কথাগুলো এত সত্য তাই আমি সায় দিই, কখনই উস্কানী দেবার জন্য নয়। এবং আমারও মন বলে, অপারেশন করে কোনো লাভ নেই। কী হবে? উনি কি স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন? এই অস্তোন্মুখ রবি তার আবর্তন পথে চলে যাবেই। তবে কেন এত কষ্ট দেওয়া। আমি প্রতিমাদিকে বললাম, আমার কথায় উনি রাজী হবেন তা তো হতে পারে না, তবে যদি কবিরাজি চিকিৎসা পরীক্ষা করতে রাজী থাকেন রথীদা তাহলে তিনি যা বলেছেন আমি বলব। এই শর্ত করলাম।

যে কারণেই হোক, রথীদা রাজী হলেন।

কবিরাজি চিকিৎসার কথা স্থির করে আমি আবার কলকাতায় গেলাম

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, আমি তোমাকে যে স্নেহ দিয়েছি সেইটেই মনে রেখো। মানুষ মানুষকে যেটুকু দিতে পারে সে দেশকালপাত্রে সীমাবদ্ধ, যা দিতে পারেনা তার সীমা নেই, সেই অতলস্পর্শ শূন্য-এর দিকে সন্ধান করতে গেলে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই হাতে ঠেকেনা। কিন্তু তুমি কি এতটুকু নই? তার মূল্যই কি সামান্য? সংসারে আমরা অনেক কিছু পাই কিন্তু পেয়েছি বলে অনুভব করিনে — সেই পাওয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাই বলে পাওয়াকে দেখিনে — এই পেয়ে না পাওয়াই তো আমার "পরশ পাথর" কবিতার বিষয়। তুমি যে বঞ্চিত হচ্ছ এ কথা সত্য নয়, তোমার কল্পনা তোমাকে বঞ্চনা করচে। সামনে নববর্ষের উৎসব — সেই দিকে চেয়ে আছি।

১১ এপ্রিল ১৯৩৩

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্দোবস্ত করতে। তখন পারিবারিক ও সাংসারিক এবং স্বামীর কর্মস্থানের নানা গণ্ডগোলের জন্য অবিরত দৌড়াদৌড়ি করে আমি হয়রান। আমার মন পড়ে আছে শান্তিনিকেতনের গণ্ডীতে। কবি চলে আসব শুনলেই এত দুঃখ পান যে, প্রত্যেকবার আমার বড় অপরাধী মনে হয়। এই সময় নানা কবিতায় পরিচিত প্রিয়জন চলে গেলে তাঁর মনের অবস্থার বর্ণনা আছে। নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।

কলকাতায় এসেই বাবার ঠিকানায় তাঁর স্বহস্তে লেখা সম্পূর্ণ একটি চিঠি পেলাম। আমার মনে হয় এই তাঁর নিজের হাতের লেখা শেষ চিঠি। এর পরে প্রতিমা দেবীর কাছে একটি চিঠি আছে, সেটি অন্যের হাতের লেখা।

ওঁ

মিত্রা,

কিছু কল বিগড়ে গেছে কিন্তু ব্যস্ত হবার দরকার করে না। এটা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে যাত্রাপথের শেষ অংশে রথ ঝড় ঝড় চাকা ঘড় ঘড় করে। ক্ষণে ক্ষণে এই ঝাঁকানি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ইতি

রবীন্দ্রনাথ
রবী
রবীন্দ্রনাথ

এই সঙ্গে রানীর চিঠি—

শান্তিনিকেতন
৩০।৬।৪১

প্রীতিভাজনীয়াসু

মৈত্রেয়ী তোমার চিঠি গুরুদেব পেয়েছেন। আমাকে বললেন তোমায় খবর দেবার জন্য যে ওঁর শরীর আজ কয়দিন ধরে বিশেষ খারাপ। রোজই জ্বর হচ্ছে। ১০০ ডিগ্রির উপরেও জ্বর উঠছে মাঝে মাঝে। আজ রামবাবুর সঙ্গে কবিরাজ আসবার কথা। গুরুদেব নিজে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আশাকরি তোমরা ভালো আছ······ ইতি তোমাদের রানী

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে ফিরে এলাম। তিনি সঙ্গে একজন অল্পবয়সী কবিরাজ নিয়ে এলেন, যে থাকবে ওষুধ পথ্য তৈরী করতে। আমার মনে একটা নিশ্চিত বিশ্বাস এল যে এবার উনি ভালো থাকবেন।

এই সময়ে ইন্দিরা দেবী ও প্রমথবাবু শান্তিনিকেতন এলেন। এঁদের আর

কখনো শান্তিনিকেতনে দেখি নি। ইন্দিরা দেবী আমাকে খুব আদর করছিলেন। সম্ভবত আগে যে মন্দ কথা বলেছিলেন, তাতে একটু দুঃখিত। অমন ভালো মানুষ, অমন মধুরস্বভাবা গুণবতী নারী তো কমই দেখা যায়। যে ক'দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন, আমার চুল বেঁধে দিতেন। কবির সামনে বসে চুল বাঁধতে আমার ভারি অপ্রস্তুত লাগত। কিন্তু উপায় নেই, আমিও তো অন্য ঘরে যাব না। কবির এক 'ফুলেল' তেলের বাতিক ছিল। অল্প বয়সের স্মৃতি, আমাকে মংপুতে আনিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের তত পছন্দ নয়, তবে তা বলিনি। এখানেও দেখি সেই তেল এসেছে কবির জন্য। সেই সুগন্ধী তেল দিয়ে ইন্দিরা দেবী রোজ আমার চুল বাঁধবেনই। বলতেন, মনের মতো চুল পেলে বাঁধব না কেন!

এই সময় রানী মহলানবীশ ওখানে ছিলেন।

প্রতিদিন দুপুরে, সবাই এসে জড়ো হবার আগে আমি কবিতা শোনাতাম। তখন গলাও ছিল। মুখস্থও ছিল। উনি খুশি হতেন। অমিয়বাবু একবার শান্তিনিকেতনে 'অভিসার' কবিতাটা শুনে বলেছিলেন, ওটা কবিতাই নয়। তাঁর মতে গদ্য কবিতা লেখার আগে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নাকি কবিতাই নয়। অমিয়বাবুর এ কথাটি আমি কবিকে বলেছিলাম। তারপর কবিতা শোনাতে গেলেই বলতেন, 'এ কবিতাটি সম্বন্ধে অমিয়র কি মত!'

সেদিন আমি মৃত্যু সম্বন্ধে ওঁর লেখা অনেকগুলো কবিতা শোনালাম, তার মধ্যে সানাই-এর 'ক্ষণিক'।

এ চিকণ তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি একি
ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশির রাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহা শিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি

কেমন করিয়া সয়
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান
ক্ষণ ভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলী তারে
পারে না চিহ্ন দিতে।

কবি তাঁর ক্লান্ত চোখ বুজে আমার হাতখানি ধরে বললেন, 'এই তো সত্য। এ সব সত্য তো জীবন দিয়ে বুঝেছি। তবে এসব কথা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় না কেন?' 'এই তো মনে করাচ্ছি' বলে আমো দু একটি কবিতা বললুম। উনি চোখ খুলে তাকালেন—'আমি চলে গেলে বেশি শোক কোরো না মিত্রা! তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।'

'না আপনি যেমন শিখিয়েছেন তেমনি হবে। যা শোচনীয় নয়, যা স্বাভাবিক তার জন্য শোক করব না।' আমি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে আছি। 'আপনি আমাকে একটা কবিতা লিখেছিলেন—'শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে··' আপনার মনে আছে?' 'না, তুমি বল'। আমি কবিতাটি বললাম—তার শেষ লাইনটা—

বিশ্বলক্ষ্মী পাদপীঠতলে আপনারে কর দান।
তোমার জীবনে ব্যর্থ না হোক কবির এ আহ্বান

'অনেক কাজ করব আমি। আপনি যেমন বলেছেন, কর্মক্ষেত্র খুঁজে নাও—আমি খুঁজব।' অনেকক্ষণ নীরবতা। আমি ওঁর পায়ে হাত বুলাচ্ছি—পা সেই টুলের উপর রাখা—ফোলা, জ্বরতপ্ত, ঈষৎ রক্তাভ। আমি আবার বললাম, 'আপনি তো মৃত্যুকে ভয় করতে শেখান নি—মরণকে তুই পর করেছিস ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।' উনি লাইনটা সুরে আনবার চেষ্টা করলেন। আমরা চুপ করে বসে আছি দুজনেই। একটু পরে বললেন—'মিত্রা, ওরা কি বলে অপারেশন করতেই হবে?' 'ওরা মনে করেন তাহলে আপনি খানিকটা সুস্থ হবেন।' 'তুমি কি মনে কর?' আমি চুপ করে রইলাম। আমি বলতে পারলাম না যে যদিও খানিকটা ভালো থাকেন সুপ্রাপিউবিকের থলি বয়ে উনি একদণ্ড শান্তি পাবেন না। সেটা হবে ওঁর চরম শাস্তি। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না। রথীদার কথাগুলো আমার মুখ চেপে ধরল। কিছুক্ষণ বাদে বললেন—'তাহলে তাই হোক!'

কিছুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, এ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন একজন রুগ্ন অসহিষ্ণু বৃদ্ধ মাত্র, বিশ্ববন্দিত মহাপুরুষ নন। এ আমার মনের ভুল হতে পারে, ক্ষোভও হতে পারে কিন্তু প্রশান্তবাবুর কাছে লেখা রথীদার চিঠিটা একটা প্রমাণ। যদি উনি কাউকে ডাকেন, তার যে তক্ষুনি আসা দরকার এটুকুও কেউ মনে করে না। হয়তো চারবার পাঁচবার কাউকে পাঠাচ্ছেন ডাকতে—নীচে গিয়ে দেখি খাবার ঘরে তুমুল আড্ডা চলেছে। যার ডাকতে এসেছিল কারোরই আর সেটা খেয়াল নেই যে উনি ব্যস্ত হচ্ছেন তারাও হো-হো করছে। 'বৃদ্ধ রুগ্ন ব্যক্তি অতিব্যস্ত তো হবেনই, তাই বলে কি নৃত্য করতে হবে'—এই হচ্ছে বুড়ির বক্তব্য।

ব্যাপারটা কিছুই না। আত্মীয়স্বজনের কাছে কোনো মহামানবই পুরো সম্মান পেতে পারেন না। এবং আত্মীয়স্বজনের, তারা যেমনই হোক, তাদের অখণ্ড অধিকার আছে—তাদের চেয়ে অনেক যে বড় তাকে ছোট করার, নিগ্রহ করবার। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি তো বৃদ্ধ দাদামশায় নন, তিনি সর্বদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা—আমাদের প্রভাতের সূর্য আমাদের সন্ধ্যারাগ। অবশ্যই এ ভাবটা নানা জনে নানা চোখে দেখবে। কি আমার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হয়ে উঠছিল। আমার মনে পড়ে একদিন কবি সুধাকান্তকে বলছিলেন, "আমাকে যারা ভালোবাসে তারা যদি সেই কারণে এখানে অপমানিত হয় তাহলে আমি তাদের বলে দেব এখানে না আসতে।"

কবিরাজি চিকিৎসা শুরু হতে আমার যেন কেমন বিশ্বাস জন্মাল যে খানিকটা ভালো হবেন। আমি আশা করেছিলাম, অন্তত ৩।৪ মাস সময় দেওয়া হবে। এমন কি আমি এও ভেবেছিলাম গণনাথ সেনকেও একবার আনব। তাই রথীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম এখন কী করব। থাকব না যাব। রথীদা বললেন, 'এখন তো অনির্দিষ্টকাল এরকম চলবে. তুমি এখন চলে যাও। অপারেশনের দিন ঠিক হলে আমি অবশ্য খবর দেব।' আমি বললাম, 'আমি যেন ঠিক খবর পাই রথীদা।' উনি বললেন, 'আমাকে কি বিশ্বাস কর না?'

আমি চলে গেলাম ৮ই জুলাই। মংপু পৌছলাম ১০ই আর ১৮ই জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে প্রতিমাদি লিখছেন—

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু এ ক'দিন ব্যস্ত ছিলুম অনেক ডাক্তার যাতায়াত নিয়ে। সেইজন্য কিছু লিখে উঠতে পারি নি। ললিতবাবু বিধানবাবু সকলেই এসেছিলেন এবং দেখে শুনে ওঁরা অপারেশন করাই কর্তব্য বলে মনে করেন। কবিরাজী চিকিৎসাতে যতদিন অপারেশন হচ্ছে না রাখতে আপত্তি নেই বলছেন—কেন না কবিরাজী ডায়েট ওঁরা পছন্দ করেছেন। বিধানবাবু নিজেই বলে গেছেন আহারের যা বন্দোবস্ত হয়েছে সে বেশ ভাল এবং এই সব খাওয়ার দরুণ ওঁর পেটের ইরিটেসান অনেক কম। রানী এখনো আছেন। জ্যোতিবাবুরা কলকাতা থেকে খবর দিয়েছেন অপারেশন যত শীঘ্র হয় ডাক্তারদের মতে ততই ভালো। খুব সম্ভব আমরা আসছে শুক্রবার নাগাদ কলকাতায় যাব। বাবামশায়কেও নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে··

ইতি
প্রতিমাদি

ঐ তারিখেই অমিতা ঠাকুর আমায় লিখছেন: ···'হ্যাঁ আমি গত সোমবার শান্তিনিকেতন গিয়ে মঙ্গলবার শেষ রাত্রে ফিরে এসেছি। গিয়ে ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। তার চেয়ে না দেখাই বুঝি ছিল ভালো। আমি এখান থেকে উনি যাবার পর এই প্রথম দেখলুম তাই খুবই খারাপ লাগল। শুনলুম আরোই খারাপ হয়েছিল, কবিরাজী পথ্য খেয়ে অপেক্ষাকৃত বল পেয়েছেন। তোমার মন যে কতো ব্যস্ত হচ্ছে তা কি আর বুঝি না—কতো ভালোবাস তাঁকে তুমি। দূরে থেকে মনে মনে প্রার্থনা করো যেন আনন্দ ও সুগভীর শান্তির মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনের এই অদ্বিতীয় আশ্চর্য অধ্যায় শেষ হয়······

আমি ভাবছি কবিরাজিতে যদি উপকার হচ্ছে তাহলে আর একটু দেখতে ক্ষতি কি। আমি আবার রথীদাকে অনুনয় করে লিখলুম কবিরাজকে আর একটু সময় দিন।

রথীদার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম কয়েকদিন পর।

শুক্রবার

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন থেকে কবিরাজীতে আর কোনো উপকার হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে বিধান রায় ললিত বাড়ুয্যে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাবাকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করেন। ডাক্তারেরা একবাক্যে operation-এর কথা বলছেন। বাবা নিজেও এখন বুঝেছেন এবং সম্পূর্ণ মত দিয়েছেন। কলকাতাতে operation করতে হবে তাই এখানে আনা হচ্ছে। আজ বিকালে এসে পৌছবেন। আমি তাই কাল রাত্রে এসেছি সব ব্যবস্থা করবার জন্য। এখানে পৌছলে তারপর কাল ললিতবাবু দেখে operation-এর দিন স্থির করবেন। দেরি সম্ভবত করবেন না। ২।৩ দিনের মধ্যেই হবে তাই তোমাদের জানিয়ে রাখছি। টেলিফোন নেই টেলিগ্রামও দেরিতে পৌছায় বলে চিঠি লিখছি। কাল সকালেই পাবে। আগে থেকে খবর পাবার উপায় ছিল না—Saloon কবে পাব ঠিক ছিল না। যেমন পাওয়া অমনি আনবার সব ঠিক করতে হোলো। ব্যস্ত আছি তাই সংক্ষেপে খবরটুকু দিয়েই শেষ করছি। ইতি

রথীদা

'কবিরাজীতে···উপকার হচ্ছিল না'—কিন্তু কতটুকু সময় দেওয়া হল? আমি বুঝতে পারছি না ডাক্তাররা এরকমভাবে অপারেশন করবার জন্য কেন বদ্ধপরিকর। যা হোক আমার আপত্তির কারণ ছিল, প্রধানত, কবি নিজে ইচ্ছুক নন বলে। আমি জানি বিধান রায় এবং ললিত বাড়ুয্যের চেয়ে তিনি নিজেকে অনেক ভালো বোঝেন ও জানেন কোনটা ঠিক কোনটাতে মঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, সুপ্রাপিউবিকের থলির বোঝা। কিন্তু অপারেশনের ফলে যে কয়েক-দিনের মধ্যে ওঁর প্রাণনাশ হবে এ আমার একবারও মনে হয়নি। হয়তো অভিজ্ঞতার অভাবই এর কারণ। এত ডাক্তার মিলে এমনি ভালোর চেষ্টা করলেন যে কয়েকদিনের মধ্যে ওঁর প্রাণ চলে গেল?

এ চিঠি পেয়ে আমি চলে গেলাম মংপু থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে 'গেলখেলো' বলে একটি স্টেশনে। সেখান থেকে রথীদাকে ট্রাঙ্ককল করে

জিজ্ঞাসা করলাম, কবে অপারেশন হবে? রথীদা বললেন, 'ঠিক নেই কিছুই এবং ভালো আছেন।' আমাকে কলকাতায় যেতে ডাকলেন না। আমি ভাবছি অপারেশনের সময় ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই, অপারেশন হলেই যাব।

ইতিমধ্যে মংপুতে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। যেদিন ওঁর অপারেশন, তার কয়েক দিন আগে শিলিগুড়ির রাস্তায় প্রচণ্ড একটি ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা একেবারে বিযুক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চিঠি আসছে দার্জিলিং-এ, সেখান থেকে হাঁটা পথে ১৮ মাইল হেঁটে রুটিওয়ালা চিঠি নিয়ে আসছে। আমার ছোট বোন ও মাসীর চিঠি পেলাম। চিত্রিতা লিখছে—

ভাই দিদি,

গুরুদেব কাল এসে পৌঁছেচেন। আমি আর লিলুমাসী আজ সকালে গিয়েছিলাম—তখন খুবই tired ছিলেন। রথীদার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি কোথায় বেরিয়েছিলেন—আর প্রতিমাদি আসেন নি—তাঁর জ্বর হয়েছে। বুড়ি ও মীরাদির সঙ্গে দেখা হোল। বুড়ি বললে operation হবেই তবে দিন এখনও স্থির হয় নি মাসখানেক পরেও হতে পারে। কবির কী চেহারাই যে হয়ে গেছে।·· ···কাল আবার টেলিফোন করব, যেমন থাকেন সব জানাব। আমি বললাম যে তুই শিগ্‌গির আসবি। তা বললেন সেই বাসন্তী একটি মেমসাহেব জানে সে খুব ভালো সে (মংপু) যেতে চেয়েছে। এই সব ঠাট্টা টাট্টা করে বললেন। মাঝে মাঝে যেতে বলেছেন। আমার কথা বিশেষ শুনতে পেলেন না। মাসীর বেশি অভ্যাস আছে কিনা বুঝতে পারলেন।

এই দুটি চিঠি পেয়ে আমি বুঝলাম operation এখুনি হয়তো হবে না। বুড়ি বলেছে মাসখানেকও দেরি হতে পারে। রেডিওতেও কোনো খবর দেয় না। আমি ভাবছি, রাস্তা খুললেই রওনা হব। এরপরে ২।৮।৪১ তারিখে রথীদার একটি চিঠি এল মনোমোহনের কাছে।

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলুম 'স্বামী' হবার কী বিপদ! ডাকঘর টেলিগ্রাফ টেলিফোন এসব তুচ্ছ বাধা অতিক্রম যদি না করতে পারবে তবে 'স্বামী' হলে কেন? খুব serious বিষয় হলেও চিঠিটা পড়ে একটু কৌতুক বোধ করছি। এক লাইনে লেখা রিয়াঙে টেলিগ্রাম ৮।১০ দিন বন্ধ—তারপরেই লেখা 'আপনি নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম করবেন।' মেয়েরাই এরকম facts অতিক্রম করে চলে!

এখন খবর দেওয়া যাক। বাবার operation বুধবার ১১টার সময় হলো। ললিতবাবুর কড়ার ছিল যে (১) তাঁর নাম প্রকাশ হবে না। (২) কি এবং কবে operation হবে কাউকে জানান হবে না। তাই কালিমপং (গেলখেলো) থেকে যেদিন মৈত্রেয়ী ফোনে জিজ্ঞেস করলে আমি পড়লুম মহা বিপদে। কি করে সাফ জবাব এড়িয়েছিলুম তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই শুনেছ। বৃহস্পতিবারে আবার ফোন করতে বলেছিলুম এই উদ্দেশেই যে তখন অপারেশনের পর কেমন আছেন খবর দিতে পারব। অপারেশন ভালই হয়েছিল, অজ্ঞান করা হয় নি। জ্যোতিবাবু বাবার কাছে সারাক্ষণ কথা বলবার জন্য ছিলেন। বিশেষ কিছু টের পান নি—তবে অনুমান করে ব্যথা বোধ করেছিলেন। খানিকটা পরে প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়েছিলেন—তারপর একটা কবিতা dictate করেছেন। সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, জ্বর ছিল না, ৯৮·২। রাত্রে সেদিন ভালো ঘুম হয় নি। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে একটু খারাপ বোধ করেন। একটু ঝিমোনো ভাব ছিল—কথা বলছিলেন না। তখন থেকে urine-ও কমে যায়। তাই দুবার করে Glucose injection-ও M & B খাওয়ান চলে। কালকের (শুক্রবার) দিনটাও ভাল চলে নি। তবে আশঙ্কিত হবার মত কিছু নয়। আজ সকাল থেকে definite improvement দেখা যাচ্ছে। সব দিক থেকেই ভালো।

ডাক্তারদের জটলা সব সময়ই আছে। দুজন ২৪ ঘণ্টাই থাকেন; দীননাথ ছাড়া। ললিতবাবু দিনে ২।৩ বার করে আসেন। আজ আবার বিধানবাবু সন্ধ্যেবেলা আসবেন। কাজেই বুঝতে পাববে চিকিৎসার ক্রটি হবার উপায় নেই। আজকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখন দিন দিন improvement-এর দিকে যাবে।

টেলিগ্রামের আগেই হয়তো চিঠি পৌঁছে যাবে মনে করে টেলিগ্রাম আর করলুম না। ইতি

তোমাদের

এই মজা করে লেখা চিঠি পড়ে কারো কি মনে হবে কি আসন্ন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে সেখানে। এ চিঠি পড়ে দুটি কারণে আমার মন ভেঙে গেল—এক, ললিতবাবু বারণ করেছে বলে মাংপবীকে তিনি ঠিক খবরটা দিলেন না। ললিত-বাবু কে? পরে শুনেছি, তিনি নাকি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনিলবাবুকে

বলেছেন, 'অনিল, কাল যেন কাগজে নাম না দেখি আমার, ললিত বাড়ুয্যে নামের কাঙাল নয়।' এই সব দাম্ভিক ডাক্তারদের কথা ভাবলে আজও আমার বুকটা জ্বলতে থাকে। দ্বিতীয় একটি কারণে আমার মন খারাপ হল যে কবি "বিশেষ কিছু টের পান নি, অনুমান করে ব্যথা বোধ করেছিলেন।"...এতে যে অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে, কিছুদিন থেকে সেটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

এদিকে অপারেশনের খবর কলকাতাতে আমাদের বাড়ির লোকেরাও পাচ্ছে না। রবিবার মাসী লিখছে, 'অপারেশনের দিন ঠিক হয়নি—কবি জিজ্ঞাসা করলেন, পাহাড় অঞ্চলে যাবে নাকি?' আমি বললুম না এখন যাব না মৈত্রেয়ীই আসবে আপনার কাছে। তারপর বললেন, মিস এলেন তো এলেন আর গেলেন। আমি বললুম হ্যাঁ—উনি বললেন, আর একজনের কথা লিখেছিলেন বাসন্তী দেবী মৈত্রেয়ী তো সে বিষয় কিছু লিখল না— এইসব...'

তারপর বার বার চিত্রিতা ও মাসীর চিঠি আসছে, ওদেরকে সবাই বলছে ভালো আছেন, কবে অপারেশন ঠিক নেই। ৪ঠা আগস্ট জ্বর হচ্ছে খবর পেয়ে চিত্রিতা ব্যস্ত হয়ে ফোন করল। রথীদা নিজে তাকে বললেন, এতবড় operation-এ ওরকম একটু হবেই...

বুধবার মাসী লিখল, operation হয়ে গেছে। কবি ভালো আছেন। মীরাদি রথীদার সঙ্গে কথা বললাম, কবি না কি বলেছেন যে উনি সবই টের পাচ্ছিলেন ব্যথাও লেগেছিল। টিউব লাগিয়ে দিয়েছে।...

৪ঠা আগস্ট সোমবার মাসী লিখছে—"জোড়াসাঁকোতে রোজই ফোন করি কিন্তু ওরা সর্বদা বলে ভালো আছেন...কিন্তু আমি জানতে পেরেছি কবির জ্বর আছে অস্থিরতা বেড়েছে।...প্রতিমাদিও আসেন নি। যতই শরীর খারাপ হোক আসা উচিত ছিল—এখন তুই কি করবি—আমার মতে দার্জিলিং ঘুরে আয়—তুই মিঠু মণি—আর যদি সে রাস্তাও বন্ধ থাকে তবে আর কি করবি। ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে থাক...যিনি এই পরম স্নেহ আমাদের মনে দিয়েছেন তিনিই এই চরম নিষ্ঠুরতা করেন। যা কিছু প্রিয় তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবেই।

শুধু শেষ সময় যদি সত্যিই এসে থাকে সে সময়ে কাছে না থাকলে তোর তো কষ্ট হবেই আর ভালো হয়ে উঠলেও উনি কিন্তু মনে মনে খুব দুঃখ পাবেন।..."

আমার মনে পড়ছে তাঁর চিঠি "তোমাদের নির্বাসিত" রবীন্দ্রনাথ। ভাগ্যিস

রানীদি ওখানে আছেন, সেই আমার সান্ত্বনা। রানীদি এক নাগাড়ে রয়ে গেলেন কত বুদ্ধিমতী। তাই তাঁকে বলেছেন 'শেষের বন্ধু'।

জুলাই মাসেই অপারেশনের জন্য আনা হবে এ জানলে আমি কখনই আসতুম না। আমার প্রচণ্ড ভুল হয়েছে চলে আসা। হায় হায় এখন আর সংশোধনের উপায় নেই। রথীদার খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ছে। বুঝতে পারছি, উনি আমাকে প্রতিবন্ধক মনে করে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলেন। কবিরাজি চিকিৎসা একটা ভাঁওতা। কবিরাজকে তো একমাসও সময় দেওয়া হল না। আমি কবিরাজ এনেছি, কবিকে উস্কানী দিচ্ছি, তাঁর পক্ষে কেউ থাকলে তিনি জোর পান—অতএব আমি কাছে না থাকলেই ভালো। কারণ অপারেশন করতেই হবে। আমার আশ্চর্য লাগছে ভাবতে যে, জুন মাসে রথীদা মংপুতে ছুটি কাটাতে যাবেন স্থির ছিল। পরেই মাসেই operation করতেই হবে ঠিক হয়ে গেল, যে-অপারেশন করে সাতদিনও টিঁকলেন না। রবীন্দ্রনাথের শরীরের উপর সেই পরীক্ষা চালাবার জন্য দুজন এত বড় ডাক্তারই বা মেতে উঠলেন কেন! আর একজন হচ্ছেন এঁদের বন্ধু নীলরতনবাবুর ভাইপো জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, রথীদার পরামর্শদাতা। ইনি হেসে হেসে এইসব কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন ক্রমাগত। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত তাঁর হাসি ও আড্ডা চলেছে—এই রকমই আমি শুনেছি।

মাসী লিখেছে সম্ভব হলে দার্জিলিং ঘুরে এস। আমিও তাই ভাবছি, তাই করতে হবে। এটা হাঁটাপথ, ঘন বনের ভিতর দিয়ে ১৮ মাইল গিয়ে ঘুমের রাস্তায় উঠে ছোট ট্রেন ধরে শিলিগুড়ি যাওয়া। এই পথের কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি—ভাবতে ভাবতে সময় গেল। আমি অন্যকে কি বলব, আমার মূঢ়তার কি হিসাব দেব? আমি বুঝতে পারি নি, অপারেশন মানেই মৃত্যু।

অপারেশন হবার তিন দিন পরে লেখা চিঠি অপারেশনের পাঁচ দিনের দিন পেলাম। তাতেও দেখছি ভালো আছেন। আর তার দুদিন পরই সব শেষ!

অদৃষ্ট এবং প্রকৃতি এক হয়েছে, আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আমার বোঝা উচিত ছিল বর্ষাকালে বিযুক্ত হয়ে যেতে পারে মংপু। কিন্তু এর আগে এতবড় ধসের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমার রেডিওটাও পর্যন্ত বিকল হয়ে রয়েছে। রিচার্ডস লিখে লিখে খবর পাঠাচ্ছে। রেডিওতেও ভালো করে খবর দেওয়া হয় নি। কোনও দিনই হয় না। পাবলিক উদ্বিগ্ন হবে—তাতে পাবলিকের কি ক্ষতি হবে কে জানে!

রিচার্ডস একজন প্ল্যাণ্টার ইংরেজ। আকাট মূর্খ, মদ্যপায়ী এবং কুলী-মজুরদের অশ্লীল গাল দেয় বলে ওর সঙ্গে কখনো মিশি না। ওকে মানুষের

মধ্যে গণ্য করি না। আজ আমার অহংকার ভাঙল। আমি দেখলাম বাহ্যিক ব্যবহার, বিদ্যা, শিক্ষা এসব কিছুই নয়। সত্য জিনিস মানুষের হৃদয়, স্নেহ ভালোবাসার শক্তি এবং অন্যের দুঃখকে বোঝবার, মর্যাদা দেবার ক্ষমতা—এসবই আসল মনুষ্যত্ব। রিচার্ডস বলছে—You must go now. আমার ঘোড়াটা নাও, শান্ত ঘোড়া অনায়াসে আঠার মাইল চলে যাবে। সেন যাবে একটা ঘোড়ায়, যদি বল আমিও সঙ্গে যাই। দুটো মশাল নিয়ে দুজন যাবে—তাহলে ভাল্লুক আসবে না। কিন্তু যে কথা সবচেয়ে বেশি ভাবছি—যে জন্য এই পথে যাওয়া স্থির করতে দু তিন দিন সময় কেটে গেল, সে আমার পাঁচ বছরের কন্যা মিষ্টু। গত দশ মাস তাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি চলেছে। এখন এই বনের ভিতর এতদূর কি করে ঘোড়ায় যাবে, খাওয়াবই বা কি করে? রিচার্ডস বললে, মিষ্টু কোন প্রব্লেম নয়, সহিসের কোলে বসে চলে যাবে। তবে খাওয়ানোর জন্য নামতে পারবে না, ভীষণ জোঁক—হর্সলিচ্, সাপের বাড়া। এক কাজ কর, আমার কাছে সুইস চীস আছে—খুব Sustaining. মিষ্ঠু তাই খেতে খেতে চলে যাবে! আমার হাসি পাচ্ছে, যে মেয়েকে আধখানা বিস্কুট খাওয়াতে হিমসিম খেতে হয় সে খাবে সুইস চিস্। যাহোক এ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই। এইমাত্র চিঠি পেলাম, মা লিখেছেন, "এ চিঠি পেয়ে রওনা হলেও হয়তো শেষ দেখা হবে কিংবা নাও হতে পারে—আমি কাল বিছানার পাশে গিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তা খুললেই চলে এস।" রাস্তা খুলতে একমাসের কম নয়। আমরা ঘোড়া ও লোকজনের ব্যবস্থা করছি এমন সময় মনোমোহন দৌড়াতে দৌড়াতে এলেন। উনি ধসের কাছে গিয়েছিলেন, কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। বললেন, কতগুলো সিঁড়ির ধাপ কেটেছে পাহাড়ের গায়ে, তিনশ' ফুট মতো উঠে আবার ও পাশে নামা। মিষ্টুর জন্য অসুবিধা নেই, ওকে পিঠে বেঁধে নেবে, আর তোমাকেও দুজন সাহায্য করলে পার হয়ে যাব আমরা। উনি তিন দিন থেকে গিয়ে P.W.D. লোকের সঙ্গে লেগে থেকে এটা করিয়েছেন। এইভাবে যখন শিলিগুড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি প্ল্যাটফর্মে বহু লোক দৌড়াদৌড়ি করছে, উনি আমাদের একটা ঘরে বসিয়ে Reservation করতে গেলেন। আমাদের চাপরাশি একটা টেলিগ্রাফ নিয়ে এলো। টেলিগ্রামটা ৭ তারিখে ঘন্টা তেরটা পনের মিনিটে করা—

Gurudev expired after twelve

—Nabin Sarker

নবীন সরকার কে আমি জানি না, অন্তত আজ মনে পড়ছে না, শুধু জানি

তিনি চলে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যে তার আমার কথা মনে পড়েছিল। তাকে ধন্যবাদ।

ট্রেন চলছে, আমার কোলের উপর অভুক্ত ক্লান্ত শিশু ঘুমাচ্ছে। আমি বসে বসে আমার আবাল্য সুহৃদ মাসীর কথা ভাবছি। সে লিখেছে "উনি যদি জেগে ওঠেন, কষ্ট পাবেন।" ভাবছি, পেয়েছিলেন কি? কোনো মুহূর্তে চোখ খুলে ওঁর মনে হয়েছিল কি, যে পাশে বসে পশম বোনে, সে তো এখানে নেই। সারা জীবন ধরে মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন আমার চৈতন্যে অচৈতন্যে ফিরে আসে—কখনো মধ্যরাত্রে উঠে বসে প্রশ্ন করি, কেউ কি বলতে পারে? কোনো দিন কি জানতে পারব মেলে না উত্তর।

পরিশিষ্ট

15.8.41

কল্যাণীয়াসু

বাবার বিশেষ অনুজ্ঞা অমান্য করে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কাওকেই নিমন্ত্রণ করতে পারলুম না।

কিন্তু তাই বলে তুমি তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত না থাকলে আমাদের খুব খারাপ লাগবে। আসতে পারো তো আমাদের ভালো লাগবে। আর কি লিখব? ইতি

রথীদা

সঙ্গের নিমন্ত্রণ পত্রখানি খুব সাদাসিধে, ব্রাউন কাগজে এই রকম—

ওঁ

সময়োচিত নিবেদন

আগামী রবিবার ৩২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ প্রাতে সাড়ে ছয় ঘটিকায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিব। তাঁহার অনুজ্ঞা অনুসারে অনাড়ম্বরভাবে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিন আপনারা নিজ নিজ অন্তরে তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন, ইহাই আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা। নিবেদন ইতি ২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৮

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

ভাগ্যহীন
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠি পেয়ে মনোমোহন রথীন্দ্রনাথকে ও আমি প্রতিমাদিকে লিখলাম। উত্তরে দুজনের কাছ থেকে দুটি চিঠি পেয়েছিলাম তা এখানে তুলে দিচ্ছি।

শান্তিনিকেতন
৫ই ভাদ্র

কল্যাণীয়েষু

মৈত্রেয়ী ও মনোমোহন, তোমাদের চিঠি পেয়ে মনে গভীর শান্তি অনুভব করছি। বাবামশায় যে তোমাদের কত আপনার জন ছিলেন তা তো আমরা

জানি। আমাদের শোক তোমরা আপন করে নিও। ভগবান যেন তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন এই প্রার্থনা করি। তোমরা আমাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জেন।

শুভার্থী

রথীদা ও প্রতিমাদি

এ চিঠিটা প্রতিমাদির হাতের লেখায়।

ঐ ১৫.৮.৪১ তারিখে মনোমোহন সেনের কাছে রথীদা একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউই শেষ মুহূর্তে থাকতে পারলে না মনে করে এতো খারাপ লাগছে। রোজই মনে করি চিঠি লিখব কিন্তু কলম সরে না। কি লিখব কথা খুঁজে পাই না।......

আমি যখন চিঠি লিখেছিলুম কলকাতা থেকে তখন কল্পনাও করতে পারি নি এই রকম হোতে পারে। সে চিঠি পেয়েছ কি না তাও জানি না। অপারেশনের পরেও দুদিন বেশ ছিলেন—তারপর থেকেই কোমা আরম্ভ হোলো—শেষ পর্যন্ত আর জ্ঞান হয় নি। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুই করা গেল না। অপারেশন সম্বন্ধে আমার নিজের মনে সন্দেহ বা ক্ষোভ নেই—নিতান্তই দরকার ছিল। শেষে আর কোনো উপায় ছিল না। Infection খুব বেশি রকম হয়ে পড়েছিল।......

মৈত্রেয়ীর জন্য অত্যন্ত দুঃখবোধ হচ্ছে। তার অনুতাপ বোধহয় কখনো ঘুচবে না। আমাদেরও হয়ত ক্ষমা করতে পারবে না। যখন serious হয়ে দাঁড়ালো তখন আমাদের মনের ঠিক ছিল না। তাই আমি প্রত্যহ চিত্রিতাকে টেলিফোনে খবর দিয়ে বলেছিলুম যে তোমাদের কাছে যে কোনো উপায়ে সে যেন খবর পৌঁছে দেয়। সে তার ভার নিয়েছিল। পথ বন্ধ, রেডিও ছাড়া তোমরা হয়তো আর কোনো খবর পাও নি।

শূন্য আশ্রমে ফিরে এসেছি। মন এখনো সংযত করতে পারি নি। ইতি

রথীদা

চিত্রিতা যা জানত তা জানিয়েছিল। আগেই লিখেছি তাদেরই তো ঠিক খবর দেওয়া হয় নি। জনসাধারণ ঠিকমত খবরই পায় নি। খবরের সম্বন্ধে

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN.

PHONE:
SANTINIKETAN 22

মৈত্রেয়ীর জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ হচ্চে। ওর অনুতাপ বোধ হয় কখনো ঘুচবে না। আমাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারবে না। যখন Invasion হল, দুর্ভাবনা যেমন আমাদের মনকে পীড়াচ্ছিল — চিঠি লেখবার অবসরও ছিল না। তবু আমি প্রত্যহ মৈত্রেয়ীকে টেলিফোনে খবর দিতে বলেছিলুম যে তোমাদের কাছে যে কোনো উপায়ে যে যেন খবর পৌঁছিয়ে দেয়। সে ওর ভার নিয়েছিল। পথ বন্ধ হলে রেডিও-দ্বারা হয় তো তোমরা আর কোনো খবর পাও নি।

শূন্য আশ্রমে ফিরে এসেছি। মন এখনো সংহত করতে পারি নি। ইতি

রবীন্দ্র

মনোমোহন সেনের কাছে লেখা চিঠি

মাসীর চিঠির অংশ

অতি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। জনসাধারণ খবর যখন পেল তখন উন্মত্তবৎ ব্যবহার করল। সমস্ত ব্যাপারটার উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিলই না।

কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতন গেলাম, বড় ঘরে সেই চাতালে বসে আছি শূন্যমনে। সুধাকান্তবাবু এসে বসলেন। আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু আপনাকে আর কেউ বলডুইন সুধোড়িয়া সুধাসমুদ্র বলবে না।'

'হ্যাঁ আপনাকেই বা কে সুনয়নী শুনায়নী মিত্রা মাংপবী বলবে।'

আমি বললুম, 'সুধাকান্তবাবু উদীচীটা খোলান, আমি একটা জিনিস খুঁজছি।'

'উদীচীতে আর কিছু নেই, সব খালি করা হয়েছে, তাঁর জিনিসপত্র সরানো হয়েছে, ওখানে গেস্টরুম হবে।'

'সুধাকান্তবাবু, যে খাটটাতে ওঁর অন্তিম শয্যা, আপনি তো জানেন সেটা পরশুরাম ওঁকে করিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ মাপের।'

'জানি বৈ কি।'

'সেটা কোথায় ?'

'জানি না।' 'আমি জানি। আমাকে জ্যোতিপ্রকাশ সরকার বলেছেন, সেটা ও ঘরে রাখা হবে না। কারণ তাহলে আমার মতন মূর্খরা নাকি খাটকে ঢিব ঢিব করে প্রণাম করবে, ওখানে মঠ উঠবে।'

'অসম্ভব নয় আমাদের দেশে। জ্যোতিবাবু ব্রাহ্ম সমাজের লোক তাই···

' আমি বললাম, সুধাকান্তবাবু আমি হিন্দু এবং পৌত্তলিক। আমি তাই একটা জিনিস খুঁজছি, আমায় খুঁজে দিতেই হবে। আপনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করবে না।' আমি কাঁদছি।

'কি জিনিস বলুন ?'

'একটা টুল যেটা কেরোসিন কাঠের কমলালেবুর বাক্স থেকে বানানো হয়েছিল। সেটা আমার চাই, আমি যে পশমের জামা বুনে দিয়েছিলাম, আমার সিল্কের সাড়ি দিয়ে যে কাঁথাটা করে দিয়েছিলাম, এগুলো আমার চাই, চলুন খুঁজি।' সুধাকান্ত চুপ করে বসে আছেন।

'ও সব আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আর আপনি খুঁজবেনই বা কেন ?

আপনি তো সত্যিই সেই কাঠের টুকরো চাইছেন না, যা চাইছেন তা আপনার কাছেই আছে, ভেবে দেখুন।'

এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র আরো বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভাইবোনের মতই ছিল। অনেক পরে তাঁর ব্যক্তিগত কারণে দূরে গেলেও স্নেহ ভালোবাসা কমে নি। কবির মৃত্যুর পরও বহুবার তাঁরা মংপুতে এসেছেন। তাঁদের বাড়িতেও আমার চিরদিন ছিল অবারিত দ্বার।

তাঁর সম্বন্ধে কোনো ক্ষোভ আমি মনে পুষে রাখি নি। অত বড় ব্যাপারের মুখে দাঁড়িয়ে ক'জন ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে। এমন কি রথীদা যে মুখাগ্নি করেন নি, সেজন্যও আমি পরিতাপ বোধ করি না। অনেকে করে। ওতে কি এসে যায়—যা ভস্মীভূত হয়ে গেল তা তো গেলই। তবু যে এখানে কতগুলি দুঃখজনক কথা লিখলাম তার কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য কথা জানবার অধিকার বাঙালীর আছে। অনেক রিসার্চ হবে। রিসার্চে কল্পনা মিশবেই, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি লিখে না গেলে প্রত্যবায় হবে। তাই আজ জীবন সায়াহ্নে এসে অকপটে সব লিখে গেলুম। যদি সেই অনির্বচনীয় মানব-সত্তার রূপ এতটুকুও আমার অযোগ্য কলমে ধরা পড়ে থাকে, যদি তা অন্যের মনে আনন্দ বেদনাব স্পন্দন জাগায়, তাহলে আমার আশা পূর্ণ হবে।